বুদ্ধের কথা ও গল্প

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
লিলুয়া, হাওড়া
১৩৬০

প্রকাশক—
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার বি.এ., বি.টি.
শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
২৪, জেনিন্স রোড, পোঃ লিলুয়া
জেলা—হাওড়া; (পশ্চিম বঙ্গ)

প্রথম সংস্করণ—১৩৬০—১১০০

পুস্তক প্রাপ্তির স্থান—

১। মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

২। প্রবর্তক পাবলিশার্স
৬১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৩। শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রিণ্টার—শ্রীবামাচরণ মণ্ডল
রাণীশ্রী প্রেস
৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

(৪)

বুদ্ধদেবের করুণা সন্তান-বাৎসল্য নহে, দেশানুরাগও নহে। বৎস যেমন গাভীমাতার পূর্ণ স্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, সেরূপ ক্ষুদ্র অথবা মহৎ কোন শ্রেণীর স্বার্থপ্রবৃত্তি সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না। তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র, ইহাই ঐশ্বর্য।....বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, "মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন সেইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্ধদিকে অধোদিকে, চতুর্দিকে, সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে। ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।" এই যে ব্রহ্মবিহারের কথা বুদ্ধ বলিয়াছেন ইহা মুখের কথা নহে, ইহা অভ্যস্ত নীতিকথা নহে। আমরা জানি, ইহা তাঁহার জীবনের মধ্য হইতে সত্য হইয়া উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা লইয়া অদ্য আমরা গৌরব করিব।

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৫)

গৌতম বুদ্ধ প্রাচ্যের এমন এক পুরুষোত্তম, ও মানবজাতির জীবন-যাত্রা ও ভাবধারায় প্রভাব বিস্তারে অদ্বিতীয়, যিনি ধর্মগুরু রূপে জগৎপূজ্য এবং যাঁর প্রভাব অন্য কোন ধর্মগুরু অপেক্ষা কম বিস্তৃত বা কম গভীর নহে। তিনি বিশ্বেতিহাসের এক অমর পুরুষ। সকল সংস্কৃত ও শিক্ষিত নরনারী তাঁর কাছে ঋণী। মস্তিষ্কের উর্বরতা, নৈতিক আগ্রহ ও আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির দিক দিয়া বিচার করিলে তিনি নিঃসন্দেহে ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।....তাঁর মধ্যে যে পারমার্থিক গভীরতা, নৈতিক শক্তি ও ভাবধারার মৌলিকতা দেখা

যায় তাহা অতুলনীয়।....তাঁর মত নবযুগ প্রবর্তক নরবীর জগতে বিরল। তাঁর বাণীর মূল্য সেই যুগে যেমন ছিল এই যুগেও তেমনি আছে।

—শ্রীসর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

কালঃ প্রয়াতে কলিবিপ্লবেন রাগগ্রহোগ্রে ভগবান্ ভবাব্ধৌ।
মজ্জৎসু সম্মোহজলে জনেষু জগন্নিবাস করুণান্বিতোঽভূৎ॥
স সর্বসত্ত্বোপকৃতিপ্রযত্নঃ কৃপাকুলঃ শাক্যকুলে বিশালে।
শুদ্ধোদনাখ্যস্য নরাধিপেন্দোর্বধ্বস্য গর্ভেঽবততার পত্ন্যাঃ॥

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র

কালক্রমে কলিযুগের প্রভাবে রাগ-গ্রহ পরাক্রমশালী হওয়ায় মানব জাতি ভব-সাগরের মোহ-জলে নিমজ্জিত হল। তখন জগৎপতি ঈশ্বর করুণার্দ্র হলেন। তিনি সর্বপ্রাণীর কল্যাণ-কামনায় কৃপালু হয়ে বিশাল শাক্যবংশের রাজা শুদ্ধোদনের ধন্যা পত্নী মায়া দেবীর গর্ভে সিদ্ধার্থরূপে অবতীর্ণ হন।

নিবেদন

প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে কলম্বো ও রেঙ্গুন নগরীস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে অবস্থান-কালে সিংহলে ও ব্রহ্মদেশে কয়েক বৎসর থাকবার ও বেড়াবার সুযোগ পাই। কলম্বোতে শ্রীমৎ স্বামী শর্বানন্দের পরামর্শে পালি ভাষা ও সিংহলী লিপি শিখে মূল বৌদ্ধ শাস্ত্র ত্রিপিটক পড়তে আরম্ভ করি ভিক্ষুদের নিকট। বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বহু ইংরাজি গ্রন্থ সেই সময় পড়ে ফেলি। বৌদ্ধ দেশে না গেলে বোঝা যায় না, ভগবান্ বুদ্ধদেব কি অমিত প্রভাব বিস্তার করেছেন মানব জাতির উপর। তখন থেকে ভগবান্ বুদ্ধের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে একটী বাংলা বই লেখার ইচ্ছা জাগে। তথাগতের অনুগ্রহে প্রায় দুই দশক পরে সেই শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ায় পরম আনন্দ অনুভব করছি।

এই গ্রন্থ প্রধানতঃ মার্কিন মনীষী পল কেরাসের 'গস্‌পেল অব বুদ্ধ' নামক ইংরাজি পুস্তক অবলম্বনে লিখিত হলেও অন্যান্য যে সকল বাংলা, ইংরাজি ও পালি পুস্তকের সাহায্য নিয়েছি তাহা গ্রন্থ-পঞ্জীতে এবং পাদটীকায় উল্লিখিত হয়েছে। পল কেরাস বুদ্ধদেবকে অনাত্মবাদী ও নিরীশ্বরবাদী বলে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু আমি সেই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করি নি। আমি হিন্দু সন্ন্যাসী। আমি হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মকে দেখেছি। বাংলার ভক্ত-কবি জয়দেব এবং কাশ্মীরের মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র বুদ্ধদেবকে হিন্দুধর্মের দশাবতারের অন্যতম অবতাররূপে বর্ণনা করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ সত্যই বলেছেন, "বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মের বিদ্রোহী সন্তান।" স্বামীজী স্বশিষ্যা নিবেদিতাকে বলেছিলেন, "তোমার ভাবা উচিত নয় যে, ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম নামে এমন কোন ধর্ম ছিল, যার স্বতন্ত্র বিহার ও পুরোহিতাদি ছিল। সেরূপ কিছুই না। কেবল এক সময় বুদ্ধের প্রভাব সর্বগ্রাসী হয়ে হিন্দু জাতিকে সন্ন্যাস-ধর্মে পাগল করেছিল।" ইংরাজ বিদুষী বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞা শ্রীমতী রাইজ ডেভিড্‌স বলেন,

"বুদ্ধ হিন্দুরূপে জন্মেছিলেন এবং হিন্দুরূপেই জীবন যাপন ও মৃত্যুবরণ করে ছিলেন।" এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই বইখানি লেখা হয়েছে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ-তরুণীদের জন্য।

এই পুস্তকে বুদ্ধের সমগ্র জীবনী সংক্ষেপে প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত। তাঁর অমৃত উপদেশ এবং অনেকগুলি গল্পও এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত। বুদ্ধ-বাণী শীর্ষক অধ্যায়ে ধর্ম্মপদ থেকে উপদেশ সংগৃহীত হয়েছে। হিন্দুদের কাছে গীতা যেমন সমাদৃত, বৌদ্ধদের কাছে 'ধম্মপদ' তেমনি নিত্য পাঠ্য। পরিশিষ্ট ষট্‌কে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয় সংযোজিত হয়েছে। বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিগুলি তৃতীয় পরিশিষ্টে প্রদত্ত। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি পত্রিকায় আমি পূর্বে প্রকাশ করেছিলাম সেগুলিও পরিশিষ্টে সংগৃহীত হল। স্বামিজী বলেছিলেন, বুদ্ধের হৃদয় এবং শঙ্করের মস্তিষ্ক মিলিত হলে মানবতার সর্বোচ্চ সম্ভাবনা প্রকটিত হয়। সেই জন্য এই দুই মহাপুরুষের জীবনী ও বাণী স্বাধীন ভারতে বিশেষভাবে প্রচারিত হওয়া দরকার।

এই পুস্তকের প্রথমাংশ 'কিশোর বাংলা' পত্রিকায় ১৩৫৯ সালের বৈশাখ থেকে আশ্বিন পর্যান্ত ছয় সংখ্যায় বেরিয়েছিল। উক্ত পুস্তকের প্রণয়ন ও প্রকাশন কার্যে আমার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিল পুত্রাধিক স্নেহভাজন শ্রীবীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার বি. এ., বি. টি. এবং শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই তরুণ বন্ধু-দ্বয়ের অক্লান্ত ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা ব্যতীত আমার পক্ষে বর্তমান ভগ্ন স্বাস্থ্য ও ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে এই পুস্তক প্রণয়ন বা প্রকাশন আদৌ সম্ভব হত না। এই পুস্তক পাঠে ভগবান্ বুদ্ধের দিব্য জীবন ও অমৃত বাণী সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাদের অন্তরে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা ও জিজ্ঞাসা জাগলেই আমার সকল শ্রম সার্থক হবে। অলমিতি।

বুদ্ধপূর্ণিমা, বৈশাখ, ১৩৬০
বেলুড়, হাওড়া

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

উৎসর্গ-পত্র

মহাতাপস মহাপণ্ডিত ব্রহ্মচারী ৺নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে—

পূজ্য দাদা,

ভুবনেশ্বর তীর্থে সারদাধামে আপনি দুই দশকেরও অধিক কাল নির্জনবাস, ধর্মালোচনা ও সাধনভজন করে এখন আপনার চিরবাঞ্ছিত রামকৃষ্ণ-লোকে চলে গেছেন। সম্ভবতঃ ১৯৩০ খ্রীঃ আপনার পূত সঙ্গে প্রায় এক বৎসর ওখানে থাকবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তখন আপনার মুখে ভগবান্ বুদ্ধের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা যা শুনেছি তা চিরকাল আমার স্মৃতি-পটে সমুজ্জ্বল থাকবে। তাই আমার 'বুদ্ধের কথা ও গল্প' বই খানি আপনার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করলাম। আপনি ঊর্দ্ধলোক থেকে আমার এই সামান্য শ্রদ্ধাঞ্জলির প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করুন।

এই সঙ্গে আমার আরও তিন খানি বই বেরিয়েছে। আমার নূতন বই দেখলে আপনি কত আনন্দ প্রকাশ করতেন। আপনার প্রসন্নতায় আমার সব শ্রম ও অভিলাষ সার্থক হত। আজ ত আপনি ইহলোকে নাই। গঙ্গাতীরে আমার নির্জন কুটীরে বসে আজ চোখের জল ফেলে ফেলে ভাবছি, আর কাকেই বা আমার নূতন বইগুলি দেখাই। আমাকে ফেলে আপনি কেন এত শীঘ্র চলে গেলেন, দাদা? আমি ত বুড়ো অন্ধ হয়ে পড়েছি। দুঃখে, দৈন্যে, বিপদে আপদে আপনার মত কে আর এখন আমাকে সান্ত্বনা ও অভয় দেবেন? তাই আপনার পত্রাংশগুলি পড়ে তাপিত অন্তর জুড়াই। আপনার এই সব পত্র আমাকে ভুবনেশ্বর সারদাধাম থেকেই লেখা। ১৬-৮-৫১ তারিখে আপনি লিখেছিলেন, "স্নেহাস্পদেষু, এই মাত্র তোমার প্রেরিত "কিশোর চণ্ডী" পাইলাম। পরিশিষ্ট পড়ে ফেলেছি। বেশ আনন্দ হল পড়ে। তোমার "স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ"

এবার আমরা ১৫ দিন ধরে পাঠ করেছি এবং শশী মহারাজের উৎসবের দিন শেষ করি। বড় সুন্দর লাগল। পূর্বেও পড়েছি, এবার পড়ে আরও ভাল লাগল। কেবলই মনে হইতেছে, কবে তোমার 'স্বামী তুরীয়ানন্দ' পাইব? তোমার (১) 'মহামায়া' (২) 'স্বামিজীর দুই সন্ন্যাসী শিষ্য' (৩) 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ-প্রসঙ্গ' এবং (৪) 'নবযুগের মহাপুরুষ' ২য় ভাগ দেখি নাই। এমন সময় আসবে, যখন তোমার বই বাংলার ঘরে ঘরে পড়া ও আলোচনা হবে। আমরা সে সময় হয়ত বেঁচে থাকবো না। তবে এটা হবে ঠিকই। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদের এবং তাঁহাদের শিষ্যদের চিন্তা নিয়ে আছ; এর চেয়ে আর কি বড় কাজ হতে পারে সন্ন্যাসীর পক্ষে? কে আর এসব নিয়ে আছে বল? তোমাকে যন্ত্র করে ঠাকুর অনেক কিছু প্রচার করিয়ে নিচ্ছেন। অন্যের কথা তো ফাঁকা আওয়াজ। তোমার লেখা, কাজেই হাওয়ায় বিলীন হয়ে যাবে না, স্থায়ী রেকর্ড থাকিবে। আর যখন ঠাকুর ও স্বামিজীর বিরাট জীবনী লেখা হইবে তখন তোমার বইয়ের reference থাকিবে তাতে। তোমার কৃপায় আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানগণ এবং অন্যান্য মহাপুরুষদের জীবনী স্মরণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।"

দাদা, আপনি আমাকে ৩০।৮।৫১ তারিখে লিখেছিলেন, "স্নেহাস্পদেষু, অদ্য তোমার প্রেরিত 'কিশোর গীতা' পেয়ে পড়তে আরম্ভ করিলাম। তোমার 'কিশোর চণ্ডী'ও পড়েছি। তুমি ঠিক সাধুর কাজই করছ। এখন তো ব্রাহ্মণ নাই, ব্রাহ্মণ দাসত্ব করে. কেবল ব্রাহ্মণ অভিমানটাই আছে। সন্ন্যাসীই এখন ব্রাহ্মণ। বিদ্যার প্রচার, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা প্রভৃতি কাজ এখন সন্ন্যাসীই চালাইতেছে। সেই কাজ নিয়ে তুমি ডুবে আছ, তোমার জীবন সার্থক। যেমন দেশের আবহাওয়া চলেছে তার প্রতিক্রিয়া সুরু হবে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের মনে তোমার বই পড়ে। খুবই আনন্দ হয়েছে তোমার বই দেখে। দেশের ভবিষ্যৎ যারা, তাদের মধ্যে কেহ না কেহ এই বই পড়িবে, তাদের চোখ খুলিবে। তাহারাই ভবিষ্যৎ বাংলার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার উত্তরাধিকারী, তাহারাই মানুষ হইবে। তাহারা তোমাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে

স্মরণ করিবে। ছেলেমেয়েদের কল্যাণকর এইরূপ আরও পুস্তক লিখ, এই আশা পোষণ করি। সন্ন্যাস জীবনের যাহা আদর্শ তাহা তুমি পালন করিতেছ; আর দেশের কল্যাণও তুমি করিতেছ।" দাদা, আপনি ১৮।৫।৫১ তারিখে লিখিয়াছিলেন, "তোমার প্রেরিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ পত্রিকা' পাইয়া সুখী হইলাম। আরও বেশী সুখী হইলাম উহাতে তোমার পুস্তকের তালিকা দেখিয়া।....যাঁরা ঠাকুরের চিন্তা করেন তাঁদের সকলের আশীর্বাদ বর্ষিত হচ্ছে তোমার উপর। আর ঠাকুরের সন্তানগণের এবং মহাপুরুষদের কৃপাও তুমি নিশ্চিত পাবে ও পাইতেছ। তাঁদের কৃপা না থাকিলে এই সব মহাপুরুষদের জীবনী লেখা কখনো সম্ভব হইত না। ভালবাসা নিও।"

দাদা, আপনি ২৪।৮।৫১ তারিখে লিখেছিলেন, "স্নেহাস্পদেষু, তোমার প্রেরিত বই পেয়েছি। 'স্বামিজীর দুই শিষ্য' বইখানা আমাদের পাঠের সময় পড়িয়াছি। 'প্রকাশানন্দ স্বামী' পড়া হইয়াছে, পরে 'শুদ্ধানন্দ স্বামী' পড়া হইবে। পড়ে খুবই আনন্দ হইল; আর দুঃখ হইল অতি অল্প সময়ে এই বই শেষ হইয়া গেল সেইজন্য। 'চৈতন্যচরিতামৃত'এ যেমন চৈতন্যদেবকে ফুটিয়ে তোলা হইয়াছে তাঁর শিষ্যদের মধ্য দিয়ে তেমনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যখন বড় জীবনী হবে তখন তোমার লেখা এই মহাপুরুষদের জীবনী সেই বইয়ের উপাদান হইবে ও স্বামিজীকে তাঁর শিষ্যদের মধ্য দিয়েই ফুটিয়ে তুলবে। তবে আমরা তা দেখতে পাব না। তোমার লেখা পড়িলাম, যা জানিবার তা জানিলাম। তাই আর দুঃখ নাই। তুমি সমস্ত সংগ্রহ করে রেখে যাও, পরবর্তী কালের (তোমার শরীর থাকতে থাকতে হতে পারে) লেখকরা এই সব উপাদান ব্যবহার করিবে। যাহারা ঠাকুর-স্বামিজীর অনুরক্ত তাহারা তোমার বই পড়ে খুসী হবে, আনন্দ পাবে। যারা হিংসা করবে এমন লোকেরও অভাব হবে না। তবুও তোমার কথাই লোকে গ্রহণ করবে। বহু লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি তুমি পাবেই।'"

দাদা, আপনি ৯।১১।৫১ তারিখে লিখেছিলেন, "স্নেহাস্পদেষু, তোমার প্রেরিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ-প্রসঙ্গ' পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আজ

খোকা মহারাজের জন্মতিথি। আজ বইখানা পেয়ে আরও আনন্দ হয়েছে। নিত্য পাঠের সময় তোমার বই পড়িব। তুমি যে সব সংগ্রহ করিয়া বই প্রকাশ করিলে তাহাতে লোকের অশেষ কল্যাণ হইবে। যাহারা শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমার চিন্তা করে তাদের অন্তরের খোরাক হইবে চির জীবনের। একবারে তোমার বই পড়িয়া শেষ করি না, অল্প অল্প করে পড়ি, ভয় হয়, পাছে শেষ হয়ে যায়। তোমার বইয়ের পিছনে বিজ্ঞাপনে দেখিলাম যে, স্বামী অখণ্ডানন্দ সম্বন্ধে লিখেছ। সে বই কি ছাপা হয়েছে? খোকা মহারাজের কথা আজ রাতে আরতির পর পাঠ হইবে।"

দাদা, আপনি ২৮।১১।৫১ তারিখে লিখেছিলেন, "স্নেহাস্পদেষু, অদ্য তোমার 'নবযুগের মহাপুরুষ' ২য় ভাগ পাইলাম। তোমার selection খুবই সুন্দর হয়েছে, সকলের জন্যই লেখা হয়েছে।....মানুষের হিংসা বেশী, তাই বইযের মর্য্যাদা দিতে পারে না। ধ্যান-ধারণা অত সহজ কি? ধ্যান করিতে বেশী লোকেরই 'জল' কম পড়ে। আমরা চোখ বুজে অন্ধকারই দেখি। তুমি সন্ন্যাসীর কাজই করিতেছ, তোমাব অপূর্ব সংগ্রহ। 'পার্ষদ-প্রসঙ্গ' বইতে স্বামী প্রেমানন্দের কথা যা আছে তাঁর জীবনীতে তা নাই।...মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করিলে মনটার যে অবস্থা হয় ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব, মায়া, জগৎ এই সব আলোচনা করিলে সেরূপ অবস্থা হয় না। প্রাণ খুলে লিখে যাও। মানুষের দিকে মন দিলে আর বই লেখা হইত না। এই বই লেখাতে তোমার চিত্তশুদ্ধি হবে, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ কৃপাও পাবে। তুমি যা সংগ্রহ করে ছাপার অক্ষরে রেখে গেলে এর মূল্য হবে পরে। আমার মনে হয়, যাহারা সত্যি ঠাকুর-স্বামিজী ও শ্রীশ্রীমার চিন্তা করে তারা তোমার কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকিবে। এই সব না হইলে কি করে ঠাকুর, স্বামিজী ও শ্রীশ্রীমার কথা লোকে জানতে পারত? তোমার জীবন ধন্য। একদিন লোকে তোমার লেখার মূল্য দিবেই। অবশ্য তখন আমরা থাকব না। কিন্তু এর মর্য্যাদা দিতেই হবে। আর লোকে যা ইচ্ছা ভাবুক বা বলুক, তুমি মহাপুরুষদের চিন্তা নিয়েই আছ এবং তাঁদের কথাই লিখেছ। এগুলি তো আর অন্যায়

কাজ নয়, এ সাধুরই কাজ। তাতে যে লোকে বিরক্ত হয় কেন তা ধারণা করতে পারি না। তুমি তোমার কাজ করে যাও। জীবনের শেষ সময় এর মূল্য বুঝতে পারবে। আর অধিক কিছু লিখিবার নাই।"

দাদা, আপনি ১৩-১২-৫১ তারিখে আমাকে লিখিয়াছিলেন, "স্নেহাস্পদেষু, আজ তোমার বই ও পত্র পেলাম। আমরা সকলেই তোমার বই পড়ে অত্যন্ত. আনন্দিত হইয়াছি। আমরা সান্ধ্য আরতির পর তোমার বই ২।২॥০ ঘণ্টা ধরে পাঠ করি। সকলেই খুব আগ্রহ করে শুনে ও খুব আনন্দ পায়। তোমার লেখা "অরবিন্দ" অতি চমৎকার হয়েছে। "অরবিন্দ" লিখছ বটে, কিন্তু তাতে ঠাকুর-স্বামিজীর কথা খুবই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কাহাকেও আঘাত না করে, বরং খুব প্রশংসা করেই ঠাকুর-স্বামিজীর মহত্ত্ব বেশ ফুটাইয়া তুলা হইয়াছে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রামতীর্থ, মহর্ষি রমণ, অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির জীবনী লিখে উদারতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যে দিক থেকে যাঁরা বড় তাঁদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাপূর্ণ আলোচনা করাই ঠাকুর ও স্বামিজীর শিক্ষা। তোমার বই পড়ে কেবল মনে হইতেছে যে, এই বই শেষ হইলে আর কি পড়িব। তোমার বই পড়ার পর দীর্ঘ দিন আর অন্য বই পড়িবার ইচ্ছাই হইবে না। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার অশেষ কৃপা তোমার প্রতি। তাই এই সব মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করিতেছ। যাহারা তোমার বই পড়িবে তাহারা তোমাকে তাহাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিবে। এক সঙ্গে এত মহাপুরুষের কথা আর কে লিখিবে? তোমার লেখা স্বামী তুরীয়ানন্দের জীবনীর জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছি। তোমার জীবন ধন্য এবং তোমার লেখাও সার্থক।"

দাদা, আপনি ১১-১-৫২ তারিখে লিখিয়াছিলেন, "তোমার 'স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ', 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দ', 'নবযুগের মহাপুরুষ' প্রভৃতি কয়খানি ই আমার পারের কড়ি।. আমি প্রত্যহই তার কিছু না কিছু পড়ি। ার অন্য বই পড়িতে ইচ্ছা করে না, কেবলই এই বইগুলি পড়িতে চ্ছা করে, পড়েও থাকি। হরি মহারাজ ও তুলসী মহারাজের জন্মোৎসবে

তোমার 'নবযুগের মহাপুরুষ'ই পাঠ করি। তোমার 'হরি মহারাজ' কবে বাহির হইবে? আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছি। যখনই তোমার বই পড়ি তখনই মনে হয়, কত বড় কাজ যে তুমি করিলে তা এখন না জানলেও পরে লোক জানবে। যারা ঠাকুর-স্বামিজীর ও তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গের চিন্তা করে তারা সকলেই তোমার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকিবে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত। লিখে তুমি ধন্য হয়েছ, আর আমরা পড়েই ধন্য হয়েছি।"

দাদা, আপনি ১১।২।৫২ তারিখে লিখেছিলেন, "অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে শুয়ে তোমার 'নবযুগের মহাপুরুষ' পড়ে কাটাচ্ছিলাম। আর মনে হচ্ছিল, ভাল হয়ে তোমাকে লিখবো যে, গুডউইন, আলেকজাণ্ডার ফ্রাঙ্ক প্রভৃতির জীবনী লেখ। কারণ তুমি ছাড়া কেহ এসব লিখবে না। আমরা সকলে তোমার বই পড়ে বিশেষ উপকৃত। কে আর এত কষ্ট করে সংগ্রহ করে, এত মর্য্যাদা দিয়ে স্বামিজীর শিষ্যদের জীবনী লিখবে! অত বড় বড় লোক নীরবেই চলে গেছেন। কালের গ্রাস হইতে তুমিই তাঁদের ফিরিয়ে এনেছ। একদিন লোকে এর মর্য্যাদা দিবে। স্বামিজীর কথা মনে করিও, "Pay or no pay, let it see the blaze of day light. You will have many blessings on you and many more curses." আমার শরীরটা খুবই অসুস্থ। তবুও কয়দিন তোমার চিন্তা চলিতেছে, আর তোমার লেখা বই পড়ে মনটাকে শান্ত করিতেছি। জগদানন্দ স্বামী যে বলিতেন, জগৎটা জঘন্য সেটা খুব সত্য মনে হয়। এই সব বইয়ের মূল্য যে কতটা হবে তা হয়ত দেখে যেতে পারবো না। তবে জানি যে, তুমি অমর হয়ে থাকবে। রামকৃষ্ণ-রাজ্যে যারাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে জানতে চাইবেন তারাই তোমাকে স্মরণ করিবেন। বেলুড মঠ হইতে তুমি দূরে আছ। কিন্তু ঠাকুর-স্বামিজীর শিষ্যদের নিকটেই তুমি থাকিবে চিরদিন। শরীরটা অসুস্থ আর লিখতে পারছি না। ঠাকুর কি ভাবে মানুষকে তাঁর দিকে টেনে নেন তা জানি না। তবে তুমি যে পুষ্প দিয়ে ঠাকুরকে পূজা করে গেলে এই পুষ্প ঠাকুর অঞ্জলি পেতে নিবেন, এতে কোন সন্দেহ নাই।"

দাদা, আপনি ২২।৭।৫২ তারিখে পুরী থেকে আমাকে লিখেছিলেন, "স্নেহাস্পদেষু, তোমার প্রেরিত পুস্তক পাইলাম।···তোমার বই আমার নিত্য সঙ্গী। অসুস্থ শরীরে যখন নিজে পড়িতে পারি না তখন অন্যকে পড়িতে বলি, আর আমি শুনি। এই অসুখেও তাই চলিতেছে। কাজেই তোমার বই না পড়ে ফেলে রাখি না। এখন ঠাকুর, স্বামিজী ও মা এবং তাঁদের শিষ্যদের কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাল লাগে না। তাই তোমার বইয়ের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে থাকি। তোমার লেখা হরি মহারাজের জীবনী উদ্বোধন অফিস থেকে ছাপাবে জেনে খুবই সুখী হইলাম। তাহলে বইটি দীর্ঘ দিন চলিবে। স্রোতে গা ভাসিয়ে চল। নিজের কোন্ প্ল্যান রেখো না। বিশ্বাস জীবনের ভিত্তি। বিশ্বাস না থাকলে কি মানুষ দাঁড়াতে পারে?····তুমি তোমার কাজ করে যাও। তোমার সঙ্গীরা বা সহকর্মীরা স্বীকার করুক না করুক তুমি যে কাজ করে গেলে একদিন লোকে তার মূল্য ও মর্য্যাদা দেবে।"

আপনার এই চিঠিগুলি পড়ে এখন পরম সান্ত্বনা ও অসীম প্রেরণা পাই এ জগতে আর থাক্‌তে মন চাইছে না। আপনার দিব্য সঙ্গ লাভের জন্য মন আকুল। আপনি আমার চির প্রণতি গ্রহণ করুন। ইতি—

আপনার স্নেহধন্য

জগদীশ্বরানন্দ

বুদ্ধ-প্রশস্তি

(১)

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স। অরহন্তং সং ,বুদ্ধং বিজ্জাচরণসম্পন্নং সুগতং লোকবিদুং অনুত্তমং পুরীসধম্মসারথীং সথারং দেব-মনুস্‌সানাং শিরসা নমামি।

—পালি গ্রন্থ

(২)

বুদ্ধ আর্য্য জাতির মধ্যে মহত্তম পুরুষ, এরূপ সম্যক্ স্বস্থ পুরুষ পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত আর আবির্ভূত হন নি। কেমন তিনি তৎপ্রতি জনসাধারণের পূজা অস্বীকার করলেন। তথাপি লোকে যখন তাঁকে পূজা করত তিনি তাতে দৃষ্টিপাত করতেন না। বুদ্ধ মানুষ মাত্র নন, তিনি একটী আধ্যাত্মিক অনুভূতি, একটী তুরীয় অবস্থা। সকলে ইহা লাভে যত্নশীল হউন। মৃত্যুকালে তিনি প্রশান্ত, কি নির্বিকার ছিলেন॥ তিনি মানব জাতির মধ্যে চন্দ্রতুল্য।

—স্বামী বিবেকানন্দ

(৩)

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয় হৃদয দর্শিত-পশুঘাতম্।
কেশব, ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে॥

—জয়দেব

হে দয়াময়, অহহ। আপনি যজ্ঞবিধির পশুবধ-বিধায়ক শ্রুতিবাক্যসমূহ নিন্দা করেন। হে বুদ্ধরূপী কেশব! হে জগদীশ, হে হরি, আপনার জয় হউক।

বুদ্ধের কথা ও গল্প

সিদ্ধার্থের বোধিলাভ

সিদ্ধার্থের জন্ম

ইংল্যাণ্ডের মনীষী এডুইন আরনল্ড বুদ্ধদেব সম্বন্ধে ইংরাজিতে যে বিখ্যাত বই লিখেছেন তার নাম 'এশিয়ার আলো'। তিনি যখন এই বইখানি লেখেন খন প্রথমে তার নাম দিয়েছিলেন 'জগতের আলো'। কিন্তু গোঁড়া খ্রীস্টান মিশনারীরা আপত্তি করলেন, জীশু খ্রীস্টই জগতের আলো, বুদ্ধ নন। তাই তিনি অনিচ্ছা সত্বেও বইখানির উক্ত নাম রাখেন। বস্তুতঃ বুদ্ধ শুধু এশিয়ার আলো নন, তিনি জগতেরও আলো। রাম, চৈতন্য, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, খ্রীস্ট, মহম্মদ, জোরোয়াস্তার, লাউৎজে প্রভৃতির মত বুদ্ধদেব জগৎগুরু, জগজ্জ্যোতি।

হিমালয়ের পাদদেশে উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত অযোধ্যার পঁচিশ মাইল রোহিনা নদীর তীরে কপিলবাস্তু নগর ছিল। অশ্বঘোষ সংস্কৃতে বুদ্ধের বনী লিখেছেন তাতে আছে, কপিল মুনির নামানুসারে উক্ত নগরের কপিলবাস্তু হয়েছিল। শাক্য রাজ্যের রাজধানী ছিল কপিলবাস্তু। ায় খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা শুদ্ধোদন রাজত্ব করতেন। তিনি ছিলেন াতিতে ক্ষত্রিয় এবং সূর্য্যবংশীয় রাজা ইক্ষাকুর বংশধর। তাঁর আদি পুরুষেরা াক-বনে ঘেরা ঋষির আশ্রমে বাস করতেন বলে 'শাক্য' নামে পরিচিত হন। দ্ধোদনের রাণী মায়াদেবী জল-পদ্মের মত সুন্দরী ও বিশুদ্ধা ছিলেন। স্বর্গের বীর মত তিনি মর্ত্যে থাকতেন, মর্ত্যের মলিনতা তাঁকে স্পর্শ করতো না। জন্য রাজা তাঁকে অন্তরে খুব শ্রদ্ধা করতেন। যখন রাণী সন্তান-সম্ভবা েন তখন এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখেন, চার জন দেবদূত এসে তাঁকে পর্বতের শিখরে নিয়ে গেলেন এবং তথায় একটী শ্বেত হস্তী বায়ুরূপে

তাঁর উদরে প্রবেশ করলো। গণকরা এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনে গণনা
বললেন, "মায়া দেবী নিশ্চয়ই কোন দেব-মানবের জননী হবেন।" স
জন্মকাল সমাসন্ন দেখে মায়া দেবী পিত্রালয়ে যেতে চাইলেন। তখনব
এই প্রথা ছিল যে, গর্ভবতী দুহিতা পিত্রালয়ে গিয়েই সন্তানের প্রসূতি হ
রাজা রাণীকে তথায় যেতে সানন্দে সম্মতি দিলেন। রাণী পিত্রালয়ে যাবার
পথে লুম্বিনী উদ্যানে উচ্চ সত্তিন গাছের ছায়ায় খাটে শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন।
তখন বুদ্ধদেব মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হলেন সমুজ্জ্বল প্রাতঃসূর্য্যের মত। দেব-
শিশুর প্রজ্ঞা-প্রভায় ধর্ম-জগৎ উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠলো।

বুদ্ধের জন্মস্থানে দুই তিন শতাব্দীর পর সম্রাট অশোক একটি স্মৃতি-স্তম্ভ
নির্মাণ করেছেন। উক্ত স্তম্ভে লেখা আছে, "এখানেই বুদ্ধদেব ভূমি
হয়েছিলেন।" খ্রীস্টপূর্ব ৫০৬ অব্দে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বুদ্ধের শুভ জন্ম হয়
তাই বৌদ্ধ জগতে বৈশাখী পূর্ণিমা সর্বাপেক্ষা পুণ্য দিন। উক্ত দিনেই বুদ্ধদে
বোধিলাভ এবং দেহত্যাগ করেন। সেজন্য বৌদ্ধরা উহাকে ত্রিপুণ্য দিব
বলে মানেন। রাজা নবজাত পুত্রের নাম দিলেন সিদ্ধার্থ। কারণ, পুত্রলাভে
শুদ্ধোদনের সর্বার্থ সুসিদ্ধ হয়েছিল। সিদ্ধার্থের কুল-নাম ছিল গোতম
নাগরাজগণ পূর্ব পূর্ব বুদ্ধকে যথোচিত শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছিলেন। তাঁরা এসে ভাবী
বুদ্ধ সিদ্ধার্থের সম্মুখে মন্দার কুসুম ছড়িয়ে দিয়ে আনন্দ প্রকাশ
বুদ্ধের জন্মে দেবতা ও মানুষ সকলেই উৎফুল্ল হলেন, কিন্তু দুঃখিত হলো
মার। হিন্দুরা যাকে পাপপুরুষ বলেন, এবং খ্রীস্টানরা যাকে শয়তান ব
বৌদ্ধরা তাকেই মার বলে থাকেন।

তখন লুম্বিনী বনে সুদর্শন ব্রহ্মর্ষি অসিত তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত ছিলে
শাস্ত্রীয় এবং অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের জন্য সারা শাক্য রাজ্যে তাঁর বেশ সুনাম ছি
তিনি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্‌ও ছিলেন। রাজা শুদ্ধোদনের আমন্ত্রণে তিনি
সিদ্ধার্থকে দেখতে গেলেন। শিশুকে দেখে তিনি চোখের জল ও
নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। ঋষি অসিতের চোখে জল দেখে রাজা শুদ্ধো
শঙ্কিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার শিশু-পুত্রকে দেখে আপনি

আত্মহারা ও অশ্রুসিক্ত হলেন কেন ?" ঋষি উত্তর দিলেন, "রাজন্, আপনি আমার অশ্রুপাত দেখে চিন্তিত হবেন না। আমি আপনার সুপুত্রকে দেখে পরমানন্দিত হয়েছি। তবে কাঁদছি এই জন্য যে, আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি, বেশী দিন বাঁচবো না। আপনার পুত্র হবেন রাজচক্রবর্তী, অথবা ধর্মরাজ। কিন্তু আমি তা দেখতে পাবো না। তখন আমি পরলোকে চলে যাবো।"

রাজা ও রাণী ঋষি অসিতের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হলেন। আনন্দাশ্রুতে তাঁদের বুক ভেসে গেল। পুত্রলাভের সাত দিন পরে মায়াদেবী সহোদরা প্রজাপতিকে সম্বোধন করে বল্লেন, "যে মা ভাবী বুদ্ধকে গর্ভে ধারণ করেছেন তিনি অন্য সন্তানের জননী হন না। আমি বৃদ্ধ পতি, শিশু পুত্র ও ইহলোক ছেড়ে চিরতরে অন্য লোকে চলে যাবো। আমার মৃত্যুর পরে তুমি সিদ্ধার্থের মাতৃতুল্যা হয়ো।" প্রজাপতি সজল নয়নে ভগিনীকে আন্তরিক সম্মতি জানালেন। মায়াদেবী পুত্রজন্মের সাত দিন পরে স্বর্গে গেলেন। সিদ্ধার্থ অতি শৈশবে মাতৃহীন হলেন এবং মাসীর কোলে দ্বিতীয়ার চাঁদের মত দিন দিন বাড়তে লাগলেন। রাজা শিশুকে চোখের আড়ালে যেতে দিতেন না। কোথাও বাহিরে গেলে তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। হল-কর্ষণ উৎসব উপলক্ষে রাজা একদিন মাঠে গেলেন শিশুকে সাথে নিয়ে। মাঠের মধ্যে একটী বড় জম্বু গাছের তলায় চাঁদোয়া-ঘেরা ছোট খাটে শিশুকে বসিয়ে রাজা কর্ষণোৎসবে পৌরোহিত্য করলেন। উৎসব শেষ হতে মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হলো। রাজা উৎসবান্তে জম্বু গাছের তলায় এসে দেখেন, তখনো নিবিড় শীতল ছায়া শিশুকে ফেলে দূরে সরে যায় নি। অথচ অন্যান্য গাছের ছায়া সূর্য্যের সাথে সাথে অনেক দূরে সরে গেছে। দেব-শিশুকে ছায়া দানের জন্য পাদপকে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করতে দেখে রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। শিশুর অলৌকিকত্বে তাঁর গভীর বিশ্বাস এলো। তখন তাঁর মনে পড়লো, শিশুর সম্বন্ধে ঋষি অসিতের ভবিষ্যদ্বাণী। কৃষ্ণ, চৈতন্য, শঙ্কর ও রামকৃষ্ণ প্রভৃতির ন্যায় সিদ্ধার্থের শৈশবও ছিল অলৌকিক ও বিস্ময়কর।

সিদ্ধার্থের বিবাহ *

বাল্যে সিদ্ধার্থ সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্রের কাছে বেদাদি শাস্ত্র, ধনুর্বিদ্যা ও রাজনীতি প্রভৃতি অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করেছিলেন। বৃদ্ধ পিতা একমাত্র মাতৃহারা পুত্রকে অসীম স্নেহ-যত্নে লালন পালন করেন। পুত্রের বয়স যখন ষোল বছরের অধিক হলো তখন রাজা তাঁর জন্য তিনটী প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে দেন। যাতে সিদ্ধার্থ আদৌ দুঃখের স্পর্শে না আসেন সেজন্য শুদ্ধোদন তাঁকে সব রকম ভোগবিলাসের মধ্যে রেখেছিলেন। পরবর্তী জীবনে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যগণকে কথাচ্ছলে বলেছিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমার বাল্য ও যৌবন রাজোচিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়। রাজোদ্যানে আমার জন্য কয়েকটী পদ্ম-পুকুর প্রস্তুত হয়েছিল। কোন পুকুরে লাল পদ্ম, কোনটীতে নীল পদ্ম, কোনটীতে বা শ্বেত পদ্ম শত শত ফুটে থাকতো। বারাণসীর চন্দন কাঠই আমি ব্যবহার করতাম। আমার সব রকম পোষাক বারাণসী কাপড়ে তৈরী হতো। দিবারাত্রি একটি শ্বেতবর্ণ রমণীয় ক্ষুদ্রছত্র আমার উপর একজন ভৃত্য ধরে রাখতো, পাছে ঠাণ্ডা বা গরম, ধুলো বা বৃষ্টি আমার গায়ে লাগে। শীত, গ্রীষ্ম, ও বর্ষা ঋতুত্রয়ের জন্য আমার তিনটী প্রাসাদ ছিল। বর্ষা ঋতুর চার মাস আমি যে প্রাসাদে থাকতাম তথায় সুন্দরী পরিচারিকাগণ আমার পরিচর্য্যা করতো। বর্ষাকালে আমি সেই প্রাসাদ থেকে নীচে নামতাম না।..."

সিদ্ধার্থের সময়ে নির্মম নির্দয় মনোভাব সমাজে ব্যাপক মহামারীর আকার ধারণ করেছিল। সাধারণতঃ তখন কারো দুঃখে কেউ দুঃখী হতো না, মানুষের দুঃখে মানুষ চোখের জল ফেলতো না, সমবেদনা প্রকাশ করতো না। মানুষের অন্তর পাষাণবৎ কঠোর হয়ে পড়েছিল। সরকারী দণ্ডবিধিও ছিল তেমনি কঠোর। চুরির অপরাধে চোরের হাত, পা বা নাক কেটে ফেলা হতো। দণ্ডদাতা কঠিন অপরাধে অপরাধীকে গরম তেলে ফেলে দিত, কারো বা চামড়া ছাড়িয়ে ফেলতো, কাউকে বা কুকুরের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলা

---

* A Manual of Buddhism by R. Spense Hardy দ্রষ্টব্য

হতো। মানুষের এই নিষ্ঠুরতা, পাশবিকতা সিদ্ধার্থকে ব্যথিত করলো। করুণা ও মৈত্রীর অমৃত ধারায় তাঁর হৃদয় সিক্ত হলো। দুনিয়ার দুঃখে তিনি দুঃখিত হলেন।

আনন্দ, দেবদত্ত প্রভৃতি জ্ঞাতিভাইদের সঙ্গে সিদ্ধার্থ খেলাধূলা ও লেখাপড়া করতেন। আনন্দের সঙ্গে তাঁর প্রীতি ছিল, কিন্তু দেবদত্ত তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। একদা তিনি রাজোদ্যানে চিন্তাকুল চিত্তে একাকী বসে আছেন। তখন এক ঝাঁক সাদা হাঁস তাঁর মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল কলকাকলিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে। হঠাৎ একটী হাঁস দেবদত্তের তীরে বিদ্ধ হয়ে সিদ্ধার্থের সাম্‌নে মাটীতে পড়ে ছট্ ফট্ করতে লাগলো। ব্যস্ত ভাবে ব্যথিত অন্তরে তিনি হাঁসটী সযত্নে হাতে তুলে নিয়ে বিদ্ধ তীরটী টেনে ফেলে দিলেন। হাঁসটির সাদা বুক লাল রক্তে রাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। ব্যথা অনুভবের জন্য তিনি তীরের অগ্রভাগ একবার নিজের হাতে বিঁধিয়ে দিলেন। তারপর সজল নয়নে হাঁসটীকে সেবা শুশ্রূষার দ্বারা বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এমন সময় দেবদত্ত ছুটে এসে হাঁসটীর দাবী করলেন। করুণার্দ্র হয়ে সিদ্ধার্থ বললেন, "এ পাখী তোমাকে কিছুতেই দিব না। পাখী যে বাঁচায় পাখী তারই হয়। পাখী যদি মরে যেতো তোমার হতো। এখন এটী আমার।" কিছুক্ষণ পরে কয়েকজন প্রবীণ পৌর সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁরাও সিদ্ধার্থের পক্ষ সমর্থন করলেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর যে দিব্য করুণায় তিনি জগৎ প্লাবিত করেছিলেন তার প্রকাশ তাঁর কৈশোরেই দেখা যায়।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ যখন যৌবনে পদার্পণ করলেন তখন রাজা শুদ্ধোদন তাঁর বিবাহের জন্য সচেষ্ট হলেন। তিনি স্বজাতীয় রাজন্যবর্গকে আদেশ দিলেন, স্ব স্ব রাজকুমারীকে আনতে, যাতে সিদ্ধার্থ তাদের মধ্যে একজনকে পত্নীরূপে মনোনীত করতে পারেন। রাজারা সবিনয়ে তাঁকে জানালেন, রাজকুমার এখনও নাবালক, যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ। যদি শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে তিনি আমাদের কন্যাকে রক্ষা করতে পারবেন না।" সিদ্ধার্থ চঞ্চল

প্রকৃতির তরুণ ছিলেন না। তিনি চিন্তাশীল ও শান্ত-স্বভাব ছিলেন এবং পিতার উদ্যানে জম্বু গাছের তলায় বসে জগতের গতি-বিধি নিরীক্ষণ করতেন এবং আপন মনে গভীর চিন্তায় ডুবে যেতেন। তিনি পিতার মুখে রাজাদের কথা শুনে পিতাকে বল্লেন, "আপনি তাঁদের বলুন, এখানে এসে আমার শক্তি বা বিদ্যা পরীক্ষা করতে।" প্রিয় পুত্রের অভিপ্রায় অনুসারে পিতা অবিলম্বে কাজ করলেন।

রাজন্যবর্গ যখন এলেন তখন কপিলবাস্তুর পৌরগণ সাগ্রহে শুদ্ধোদনের প্রাসাদে সমবেত হলেন, সিদ্ধার্থের শক্তি ও বিদ্যার পরিচয় পেতে। সর্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক পরীক্ষায় রাজকুমার অনায়াসে উত্তীর্ণ হলেন। পণ্ডিতরা তাঁকে যে যে প্রশ্ন করলেন তিনি তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকটীর সন্তোষজনক উত্তর দিলেন। কিন্তু তিনি পণ্ডিতগণকে যে যে প্রশ্ন করলেন তাতে পণ্ডিতরা নিরুত্তর রইলেন। রাজকুমারের অসাধারণ সামর্থ্য ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে রাজারা তাঁদের রাজকুমারীদের নিয়ে এলেন। সমবেত পাঁচ শত রাজ-কুমারীর মধ্যে যশোধরাকে সিদ্ধার্থ পত্নীরূপে বরণ করলেন। যথাসময়ে সিদ্ধার্থ ও যশোধরার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হলো। যশোধরা ছিলেন সিদ্ধার্থের জ্ঞাতি বোন। বিবাহের কিছু কাল পরে তাঁদের একটী পুত্ররত্ন লাভ হলো। শুদ্ধোদন নবজাত পৌত্রের নাম রাখলেন রাহুল। রাহুল মানে শৃঙ্খল। পুত্রলাভে সিদ্ধার্থ সংসারে শৃঙ্খলিত হলেন। পৌত্র মুখ দর্শনে শুদ্ধোদনের আনন্দের সীমা রইল না। শাক্য রাজবংশের ভাবী স্থায়ীত্বের আশায় তাঁর বুক ভরে গেল।

পুত্রকে সুখী ও সংসারী করবার জন্য রাজা যুবরাজের প্রাসাদে তদানীন্তন ভারতের উৎকৃষ্ট ভোগ্য দ্রব্যসম্ভার স্তূপীকৃত করেছিলেন। দুঃখদায়ক দৃশ্যসমূহ তিনি তাঁর কাছ থেকে বহু দূরে রেখেছিলেন, কোন মর্মান্তিক দুঃসংবাদ পুত্রের কানে আসতে দেন নি। সেজন্য সিদ্ধার্থ বাল্যে বা যৌবনের প্রারম্ভে জানতে পারেন নি, জগৎ দুঃখে কত জর্জরিত। কিন্তু কোন্ এক অব্যক্ত আহ্বানে তাঁর অন্তর আকুল হলো। বন্য হস্তী যেমন জঙ্গলে যাবার জন্য অস্থির হয়

তেমনি সিদ্ধার্থ জগতের চার দিক দেখবার জন্য উৎসুক হলেন। সেজন্য তিনি পিতার কাছে অনুমতি চাইলেন। শুদ্ধোদন অমাত্যগণকে চতুরশ্ব-বাহিত রত্নখচিত বৃহৎ রথ প্রস্তুত করতে এবং যে পথে সিদ্ধার্থ বেড়াবেন সে পথ সুশোভিত রাখতে আদেশ দিলেন। রাজার আজ্ঞায় নগরের গৃহাবলী পর্দা-পতাকায়, পত্র-পুষ্পে সজ্জিত হলো। রাস্তার দুই পাশে দর্শকরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে রইলেন যুবরাজ দর্শনের প্রতীক্ষায়। যুবরাজ রথে চড়ে জয়ধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে নগরের রাজপথে বেড়াতে লাগলেন। সারথি ছন্দক কৌশলে বিভিন্ন রাজপথে রথ চালাতে লাগলো। নগরের সীমা ছাড়িয়ে রথ ক্রমে গ্রামের পথে ঢুকে পড়লো। সে গ্রামটী নদী-মেখলায় ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে সুমণ্ডিত ছিল।

জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর দৃশ্য*

যে পল্লীপথে সিদ্ধার্থ রথে চড়ে যাচ্ছিলেন তার এক পাশে গাছের তলায় একটী জরাজীর্ণ বয়োবৃদ্ধ মানুষ দাঁড়িয়েছিল। তার বক্র দেহ, ক্লিষ্ট মুখ ও কুঞ্চিত ললাট দেখে রাজকুমার চমকিত হয়ে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে? এর মাথার চুল সাদা, চোখ দুটী কোটরগত এবং দেহ শীর্ণ! অতিকষ্টে এ লাঠিতে ভর দিয়ে চল্‌ছে!" সারথি যুবরাজের প্রশ্ন শুনে মুস্কিলে পড়লো। সত্য ঘটনা ব্যক্ত করতে তার সাহস হচ্ছিল না। উপায়ান্তর না দেখে সে বল্‌লে, "যুবরাজ, এ সব জরার লক্ষণ। এ লোকটী এককালে দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিল এবং যৌবনে ক্রীড়ারত জীবন যাপন করেছে। বার্ধক্যের অমোঘ প্রভাবে এখন সে দেহের সৌন্দর্য্য ও শক্তি হারিয়ে অক্ষম হয়েছে।" সারথির কথা শুনে সিদ্ধার্থ স্তম্ভিত হলেন। বৃদ্ধটির জরার যন্ত্রণা তাঁর কোমল হৃদয়ে কশাঘাত

* The Life of Buddha from Tibetan Works by W. W. Rockhill (লণ্ডন, ১৮৪৪) দ্রষ্টব্য।

করলো। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "মানুষ তখন কী সুখ উপভোগ করতে পারে, যখন সে বোঝে, হয়ত কালই সে শুক্‌নো ফুলের মত ঝরে পড়বে!"

রথ আরো কিছু দূর অগ্রসর হতেই ব্যাধির দারুণ দৃশ্য তাঁর চোখে পড়লো। তিনি দেখতে পেলেন, পথের পাশে একটী রোগী বসে শ্বাসকষ্টের জন্য হাঁপাচ্ছে। তার শরীর কঙ্কালসার হয়েছে, রোগের বিকারে সে ভুল বক্‌ছে এবং যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে। আবার সিদ্ধার্থ উদ্‌গ্রীব হয়ে সারথিকে প্রশ্ন করলেন, "এ লোকটী এমন করছে কেন?" সারথি পূর্ববৎ চিন্তিত হয়ে উত্তর দিলেন, "যুবরাজ এই লোকটী রুগ্ন। এর দেহের পঞ্চ ভূত বিকৃত ও বিশৃঙ্খল হয়েছে। আমাদের সকলেরই এ দশা হবে। ধনী ও দরিদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ সকল দেহবানেরই অন্তিমে এই দুর্দশা আসবে।" সারথীর কথা শুনে সিদ্ধার্থ আরও চিন্তাকুল হলেন। জীবনের ভোগসুখ তাঁর কাছে বিস্বাদ মনে হলো! দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে তিনি ঘৃণা করতে লাগলেন।

ছন্দক দ্রুতবেগে ঘোড়া চালিয়ে এসব মর্মদাহী দৃশ্য এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করলো! কিন্তু অচিরে রথের তীব্র গতি আবার রুদ্ধ হলো। চার জন লোক একটী মৃত দেহ কাঁধে করে শ্মশানের দিকে যাচ্ছিল এবং মুখে চীৎকার করে বলছিল, "বল হরি, হরি বোল।" নীয়মান শবটির দেখে সিদ্ধার্থের হৃদয় অপূর্ব ভয়ে কেঁপে উঠলো। তিনি ত্রস্ত চিত্তে ছন্দককে জিজ্ঞাসা করলেন, "এরা চারজন খাটে করে কি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে? খাটটি কাপড় দিয়ে ঢাকা ও ফুল দিয়ে সাজান। যারা তাদের সঙ্গে যাচ্ছে তারা শোক করছে ও কাঁদছে।" সারথি উদ্বিগ্ন হয়ে উত্তর দিল, "যুবরাজ, এটী মৃত দেহ। এর প্রাণ-পাখী দেহ-পিঞ্জর ছেড়ে চলে গেছে। এ দেহে এখন প্রাণের স্পন্দন বা মনের গতি নেই। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা এই শব শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে চিতায় দাহ করতে।" এই কথা শুনে সিদ্ধার্থের অন্তর ভয়ে বিস্ময়ে কেঁপে উঠলো। তিনি আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটী কি একমাত্র মৃত দেহ, না মৃত্যু প্রত্যেক দেহকেই এরূপে আক্রমণ করে?" ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সারথি উত্তর দিলেন,

"রাজকুমার! জগৎ জুড়ে চিরকাল মৃত্যুর এই তাণ্ডব লীলা চল্ছে। যার জন্ম আছে তার মৃত্যু হবেই। মৃত্যু থেকে মুক্তি কেউ কখনো পায় না।" সারথির অদ্ভুত উক্তি শুনে সিদ্ধার্থ রুদ্ধ খাসে ও ভীত স্বরে স্বগত ভাবে বল্লেন, "হে প্রাকৃত মানুষ! তোমার কি গাঢ় মোহ! তোমার এত প্রিয় দেহ ভস্মে পরিণত হবে জেনেও তুমি নিশ্চিন্ত ও উদাসীন হয়ে জীবন কাটাচ্ছ।"

জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর দুঃসহ দৃশ্য রাজকুমারের কোমল অন্তরে শেলবিদ্ধ করেছে জেনে সারথি শীঘ্র গ্রাম থেকে রথ ফিরিয়ে নগরের দিকে চললো। সম্ভ্রান্ত রাজবংশীয়দের প্রাসাদ-শ্রেণীর পাশ দিয়ে যখন রথ চলছিল রাজা শুদ্ধোদনের ভাগিনেয়ী রাজকুমারী কৃষ্ণা গৌতমী* তেজোদৃপ্ত শ্রী-মণ্ডিত সিদ্ধার্থকে দেখলেন এবং তাঁর মুখমণ্ডলে চিন্তাকুলতা লক্ষ্য করে বল্লেন, "যে পিতার পুত্র তুমি তিনি ধন্য। যে মাতার কোলে তুমি মানুষ হয়েছ তিনি কৃতার্থ। যে নারী তোমাকে পতি বলে সম্বোধন করে সে ভাগ্যবতী।" কৃষ্ণা গৌতমীর সানুরাগ সম্বর্ধনা শুনে সিদ্ধার্থ বলে উঠলেন, "যারা জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু থেকে অব্যাহতির উপায় জেনেছে তারাই সুখী। আমি সুখের সন্ধানে নির্বাণ লাভের চেষ্টা করবো।" অভিনন্দনের জন্য গৌতমীকে নিজের গলা থেকে মুক্তা-হারটী উপহার দিয়ে তিনি বিষণ্ণ বদনে প্রাসাদে ফিরলেন। এখন প্রাসাদের নৃত্যগীতাদি ভোগবিলাস তাঁর কাছে তৃণবৎ তুচ্ছ মনে হলো। যশোধরা তাঁকে সপ্রেম অভ্যর্থনা করে তাঁর বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি আহত অন্তরে উত্তর দিলেন, "যশোধরা, মানুষ বৃদ্ধ হয়, রোগে ভোগে এবং মরে যায়। একথা একটু ভাবলেই মুখের হাসি শুকিয়ে যায়, হৃদয় বেদনায় মথিত হয়।" সিদ্ধার্থ প্রাসাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি উদাসীন হয়েছেন জেনে শুদ্ধোদন মর্ম্মাহত হলেন।

জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর কবল থেকে মানুষ কি ভাবে রক্ষা পেতে পারে? এই

---

* The Legend of Kisagotami by Jakob H. Thiessen (Breslau, 1880) নামক জার্মান পুস্তকে এই উপাখ্যানটী অনূদিত।

চিন্তায় অভিভূত হয়ে সিদ্ধার্থ আহার ও নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করলেন। পার্থিব দুঃখে তিনি দুঃখী হলেন। মানব জাতির দুঃখ-দৈন্য পুঞ্জীভূত হয়ে তাঁর বুকে বজ্রবৎ আঘাত হানলো। তিনি দুঃখ-নিবৃত্তির অমোঘ উপায় উদ্‌ভাবনে মনোযোগ দিলেন, দুনিয়ার অন্য কোন বিষয়ে তাঁর আর আগ্রহ রইল না। তিনি এই চিন্তায় আকুল হয়ে রাজোদ্যানে একদিন বসে আছেন। এমন সময় এক শান্ত সৌম্য সন্ন্যাসী তাঁর দৃষ্টিগোচর হলেন। তিনি পরম আগ্রহে সন্ন্যাসীকে দুঃখহানি ও সুখলাভের পথ জিজ্ঞাসা করলেন। সন্ন্যাসী তদুত্তরে এই গানটী গাইলেন—

সুখ পেতে ধরণীতে কে বল ভাই চায় না।
সুখের আলেয়া ধরে, সকলেই ছুটে মরে
সুখ থাকে তবু দূরে কেউ ধরা পায় না॥
সুখ যদি পেতে চাও বাহিরেতে খোঁজ না।
সে নহে মুকুট-মণি, সে নহে গো জোছনা॥
বাসনা নিবৃত্ত করে, খোঁজনা হৃদয়-পুরে
ভিতরে তাহার মণি, বাহিরে বিকায় না॥

সন্ন্যাসীর বিবেকপ্রদ গান শুনে সিদ্ধার্থের মনে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য এলো। সন্ন্যাসীর শান্ত সৌম্য মূর্তিও তাঁকে মুগ্ধ করলো। তিনি সংসার ছেড়ে দুঃখের আত্যন্তিক উচ্ছেদ এবং শাশ্বত সুখের সন্ধানে জীবন উৎসর্গ করতে মহাসঙ্কল্প করলেন।

সিদ্ধার্থের সন্ন্যাস

সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসীকে বল্‌লেন, "বাবা আমাকে পরামর্শ দিচ্ছেন ঐহিক কর্তব্য পালন ও সংসার-সুখ উপভোগ করতে। তাঁর মতে তাতেই আমাদের রাজবংশ সম্মানিত হবে। তিনি আরো বলেন যে, আমি অত্যন্ত তরুণ এবং ধর্ম জীবন যাপনের সময় আমার এখনো আসেনি। সন্ন্যাসী মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন, "তোমার জানা উচিত যে, সত্য ধর্ম পালনের জন্য কোন মুহূর্তই অশুভ নয়।"

সন্ন্যাসীর কথা শুনে সিদ্ধার্থের অন্তরে সুখ-স্রোত প্রবাহিত হল। তিনি সংকল্প করলেন, "ধর্মসাধনের শুভক্ষণ উপস্থিত। মহাবোধি লাভের জন্য আমি সংসার ত্যাগ করব এবং সন্ন্যাসী হব। মুক্তি-পথে চল্‌বার জন্য আমার ডাক এসেছে। সন্ন্যাসী হয়ে আমি মুক্তি সাধন করব এবং মুক্তিলাভ করে জগৎকে মুক্তির পথ দেখাব। অজ্ঞানের আঁধারে জগৎ আবৃত রয়েছে। আমি জগতে জ্ঞানালোক বিস্তার করব।"

দেব-দূত সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থের সংকল্প শুনে সম্মতি জ্ঞাপন করে বল্‌লেন. "তোমার পক্ষে ধর্মলাভের এই সময়টি সম্যক্ প্রশস্ত। সিদ্ধার্থ! গৃহত্যাগ করে তুমি বোধি লাভার্থ জীবন উৎসর্গ কর। তুমি বোধিসত্ত্ব, তুবুও ভাবী বুদ্ধ। জগৎকে ধর্মালোক দানের জন্যই তোমার জন্ম। তুমি তথাগত। বুদ্ধত্ব লাভ করে তুমি ধর্মরাজ হবে। যদি প্রতিপদে তোমার মাথায় বজ্র পড়ে তবুও তুমি তোমার সংকল্প থেকে ভ্রষ্ট হয়ো না। ধর্মপথে যে সকল প্রলোভন আসে সেগুলি থেকে সর্বদা সাবধান থাকবে। সূর্যদেব যখন সর্বঋতুতে স্বমার্গে চলেন, অন্য পথে কখনও যান না তেমনি তুমি সরলভাবে ধর্মপথ দেখাবে।" এই কথা বলে সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হলেন। সিদ্ধার্থ ভাবলেন, এটি সত্য ঘটনা, না মায়িক দৃশ্য? কিন্তু সন্ন্যাসীর কথা শুনে তাঁর চিত্ত শান্ত হল। তিনি এই সুমহৎ সংকল্প করলেন, "যেমন উর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ডের পতন বা মর্ত্যের মৃত্যু বা প্রাতে সূর্যোদয় বা গুহাত্যাগের সময় সিংহ-গর্জন বা গর্ভবতী নারীর সন্তান প্রসব সুনিশ্চিত তেমনি আমার সংকল্প ও সুদৃঢ়।" রাজকুমার যশোধরার শয়নকক্ষে গিয়ে স্বীয় স্ত্রী ও পুত্রের প্রতি অন্তিম বিদায়-দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। পার্থিব সম্পদের মধ্যে যারা সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম তাদের মায়া কাটাবার জন্য তিনি তখন উদ্যত। শিশুপুত্রকে আর একবার কোলে নিয়ে বিদায় চুম্বন দিবার জন্য তাঁর অন্তর আকুল হলো। কিন্তু শিশুতো তখন মাতৃবক্ষে বাহুবদ্ধ হয়ে শায়িত! শিশুকে কোলে নিতে গেলেই মাতা তো সুপ্তোত্থিতা হবেন। তিনি সুন্দরী পত্নী ও প্রিয় পুত্রের প্রতি একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। বিদায়-বেদনা তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ করল। চোখের জলে তাঁর

বুক ভেসে গেল। জীবন-ব্রতের কথা ভেবে তিনি মনকে শক্ত করলেন এবং স্ত্রীপুত্রের প্রীতি-পাশ ছিন্ন করে তাঁর প্রিয় শ্বেতাশ্ব কণ্টকে আরোহণ করলেন। তখন প্রাসাদ-তোরণ উন্মুক্ত ছিল। বিশ্বস্ত সারথি ছন্দককে সঙ্গে নিয়ে তিনি মহাভিনিষ্ক্রমণ করলেন। নৈশ অন্ধকারে ধরিত্রী ছিল আচ্ছাদিত। কিন্তু আকাশে উজ্জ্বল তারাগুলি মিট্ মিট্ করে অব্যক্ত ভাষায় এক মহান্ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করল। তখন সিদ্ধার্থের বয়স উনত্রিশ বৎসর।

জাতক গ্রন্থে আছে, সিদ্ধার্থ আষাঢ় মাসে পূর্ণিমা তিথিতে পিতৃগৃহ হতে অভিনিষ্ক্রান্ত হন। সে রাত্রে তাঁর রাজ্যের সীমা, অতিক্রম করে তিনি অনেক যোজন দূরে অনোমা নদীতীরে এসে পৌঁছিলেন। সেখানে অশ্ব থেকে নেমে তিনি রাজমুকুট ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হতে মণিমুক্তার আভরণ গুলি খুলে ছন্দকের হাতে দিয়ে বল্লেন, "তুমি এইগুলি নাও এবং কণ্টককে সাথে করে বাড়ী ফিরে যাও।" ছন্দক তাঁর অনুগামী হবার জন্য প্রবল আগ্রহ দেখাল। কিন্তু সিদ্ধার্থ তার কথায় কান দিলেন না। তিনি অনিচ্ছুক ছন্দককে বাড়ী ফিরে যাবার জন্য পুনঃ পুনঃ আদেশ দিলেন এবং বল্লেন, "তুমি না ফিরে গেলে আমি নিরুদ্দেশ হয়েছি ভেবে পিতা চিন্তিত হবেন। তুমি ফিরে গিয়ে রাজবাটীর সকলকে বলো, "আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হলেই আমি ফিরব। তাঁরা যেন আমার জন্য চিন্তাকুল না হন।" রাজপুত্র রাজবেশ ছেড়ে ও মাথার কুঞ্চিত কেশপাশ অসি দিয়ে কেটে ফেলে কাষায় বস্ত্র পরলেন এবং ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে সন্ন্যাসীর বেশে রাজপথ দিয়ে চলতে লাগলেন।

সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসীর পোষাক পরলেও তাঁর সুবিমল অঙ্গকান্তি গুপ্ত রইল না। তাঁর উন্নত দেহ, প্রশস্ত ললাট ও উজ্জ্বল নয়ন দেখে তাঁকে রাজপুত্র বলেই মনে হতো। তাঁর তারুণ্যের সৌন্দর্য্য শুদ্ধতায় পরিবর্ধিত হয়ে মাথার চারদিকে শুভ্র জ্যোতিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল। তাঁর দিব্য মূর্তি দেখে পথচারী অবাক্ হয়ে থাকত, ব্যস্ত পথিকও থমকে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকাত। এমন কেউ ছিল না, যে তাঁকে দেখে শ্রদ্ধাযুক্ত বা বিস্ময়ান্বিত না হতো। রাজ

গৃহে এসে তিনি দ্বারে দ্বারে নীরবে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করলেন। তিনি যে গৃহদ্বারে দাঁড়াতেন তার গৃহস্বামী বা গৃহকর্ত্রী তাঁকে প্রণামান্তে উৎকৃষ্ট আহার্য্য দিতেন এবং তাঁকে দেখে ধন্য হতেন। বৃদ্ধ যুবা সকলেই তাঁকে দেখে প্রমোদিত হতেন এবং স্বগত উক্তি করতেন, "ইনি নিশ্চয়ই মহামুনি। এঁর দর্শন লাভ আমাদের পরম সৌভাগ্য।" তখন রাজগৃহের রাজা ছিলেন বিম্বিসার। নাগরিকগণের মধ্যে একটা আলোড়ন এসেছে শুনে তিনি এর কারণ জানতে চাইলেন এবং যাঁর শুভাগমনে এরূপ হচ্ছে তাঁকে দর্শন করতে ইচ্ছুক হলেন। অনুচর পাঠিয়ে তিনি জানলেন যে, উক্ত আগন্তুক সিদ্ধার্থ শাক্যবংশীয় রাজকুমার। তিনি অরণ্যের মধ্যে স্রোতস্বতীর তীরে ভিক্ষান্ন ভোজনার্থ প্রস্থান করেছেন। এই কথা শুনে তাঁর হৃদয় দ্রবীভূত হলো। তিনি রাজপোষাক ও সোনার মুকুট পরে নবাগত সন্ন্যাসীকে দর্শন করতে চল্‌লেন বয়স্ক ও বিজ্ঞ অনুচরবর্গ সঙ্গে নিয়ে।

রাজা শাক্যমুনিকে বৃক্ষতলে সমাসীন ও ধ্যানমগ্ন দেখতে পেলেন। বোধিসত্ত্বের দিব্য মুখশ্রী ও আর্য্য অঙ্গসৌষ্ঠব দেখে তিনি শ্রদ্ধা-ভরে তাঁকে বল্‌লেন, "হে শ্রমণ. আপনার হস্ত সাম্রাজ্য-শাসনে সমর্থ, ভিক্ষা-পাত্র উহাতে শোভা পায় না। আপনি রাজপুত্র। তাই আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি আমার রাজ্য শাসনে সহযোগী এবং রাজশক্তির কর্ণধার হউন। ধন-সম্পদ অবজ্ঞেয় নয়। অবশ্য কৃপণ ধনী হওয়া ও ধর্মত্যাগ করা অনুচিত। যিনি শক্তি, সম্পদ্ ও ধর্মের অধিকারী হন এবং সেগুলিকে বিচার ও প্রজ্ঞার আলোকে উপভোগ করেন তিনিই যথার্থ পুরুষ-প্রবর।" বিম্বিসারের কথা শুনে শাক্যমুনি মুখ তুলে উত্তর দিলেন, "হে রাজন্, আপনি যেমন উদার ও ধার্মিক, তেমনি আপনার বাক্যগুলি জ্ঞানগর্ভ। যে দয়ালু ধনের সদ্ব্যবহার করেন তিনিই প্রকৃত ধনী। কিন্তু যে ধনী সঞ্চিত সম্পদ ব্যয় বা দান করেন না তাঁর সম্পদ্ নিষ্ফল হয়। দান প্রতিদানে সম্পদ সমৃদ্ধ হয়। দানই শ্রেষ্ঠ সৎকর্ম। দাতা যদিও ধনসম্পদ্ বিতরণ করেন তথাপি কখনো তজ্জন্য তাঁর অনুতাপ আসে না।

"আমি মুমুক্ষু হয়ে সকল ঐহিক সম্বন্ধ ছিন্ন করেছি। আমার পক্ষে এখন সংসারে ফিরে যাওয়া কিরূপে সম্ভব? পারমার্থিক সত্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। যিনি সে সম্পদ্ কামনা করেন তাঁর পক্ষে সকল পার্থিব আকাঙ্খা ও মায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করে লক্ষ্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত। ধন, মান, পদ ও শক্তির প্রার্থী হওয়া তাঁর কর্তব্য নয়। কামনাকে একটু প্রশ্রয় দিলেই আদুরে শিশুর মত সে মাথায় উঠে। পার্থিব শক্তি-সম্পদের অধিকারী হলেই দুশ্চিন্তার গুরুভার বইতে হয়। মহীপতিত্ব, স্বর্গবাস ও ত্রিলোকের আধিপত্য অপেক্ষা বোধিলাভই শ্রেষ্ঠতর, শ্রেয়স্কর। বোধিসত্ত্ব ঐহিক সম্পদের অনিত্যত্ব উপলব্ধি করে. তা বিষবৎ বর্জন করেছেন। যে থুথু ফেলে দেওয়া হয়েছে, তা কি আবার মুখে তোলা উচিত? যে মাছ বঁড়শীতে একবার বিদ্ধ হয়েছিল সে কি আর বঁড়শীর দিকে তাকাবে? যে পাখী একবার জালে পড়েছিল সে কি আর জালের দিকে যাবে? যে ভেক সাপের মুখ থেকে একবার রক্ষা পেয়েছে সে কি আর কখনও সাপের মুখ দেখবে! যার হাত মশালের আগুনে একবার পুড়েছে সে কি আর কখনও মশাল হাতে নেবে? যে অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে সে কি আর চক্ষু খারাপ করতে চাইবে?

"আপনি আমার প্রতি দয়ার্দ্র হবেন না। রাজত্ব ও সম্পদের দুশ্চিন্তায় যাঁরা ভারগ্রস্ত বরং তাঁদের প্রতি আপনি দয়া করুন। মৃত্যুকালে তাঁরা ধনরত্ন বা রাজমুকুট সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন না, তবুও এই সকলের জন্য তাঁদের চিত্ত লোলুপ। ধনরত্নাদি কখন হস্তচ্যুত হয় এই ভয়ে তাঁরা সর্বদা ভাবিত থাকেন এবং কম্পিত চিত্তে সেগুলি ভোগ করেন। মৃত ভিক্ষুক অপেক্ষা মৃত সম্রাট কোন গুণে উৎকৃষ্টতর? আমি রাজ্যভার ত্যাগ করেছি, আমি দুর্বহ জীবনভার থেকে মুক্ত হতে চাই। সুতরাং আমাকে নূতন পার্থিব সম্পর্কে ও কর্তব্যে আবদ্ধ করবেন না, বা অভীপ্সিত বস্তুলাভে বাধা দিবেন না। আমি মুনি-ঋষিদের কাছে যাব এবং আর্য্য ধর্ম শিক্ষা করব। আপনার রাজ্যে শান্তি ও সম্পদ্ বর্ধিত হোক এবং মধ্যাহ্ন সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় সমুজ্জ্বল ধর্মালোকে আপনার রাজ্য উদ্ভাসিত হোক। ধর্ম ও শক্তি আপনার রাজদণ্ডে সংযুক্ত হোক।"

রাজা বিম্বিসার পরম শ্রদ্ধাভরে শাক্যমুনির হাত দুটি জড়িয়ে ধরলেন এবং প্রণামান্তে বললেন, "আপনি অভীষ্ট বোধিলাভ করে এই রাজ্যে ফিরে আসবেন এবং আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করবেন।" সিদ্ধার্থ শুভেচ্ছা ও সম্প্রীতি জ্ঞাপনপূর্বক রাজার কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করতে সম্মত হলেন। তৎপরে তিনি যোগ্য গুরুর সন্ধানে বাহির হলেন।

সিদ্ধার্থের তপস্যা ও বোধিলাভ

রাজগৃহে তৎকালে আলাড় ও রুদ্রক নামে দুইজন ব্রাহ্মণ উপাধ্যায় ছিলেন। শাস্ত্রবিদ্যায় ও দার্শনিক জ্ঞানে তাঁদের সমকক্ষ তখন তথায় কেউ ছিলেন না। সিদ্ধার্থ তাঁদের কাছে গেলেন এবং তাঁদের পদপ্রান্তে বসে ধর্মতত্ত্ব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন! কর্ম, জন্মান্তর, আত্মস্বরূপ, ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তিনি অবগত হলেন। স্বর্গ, নরক, যজ্ঞ, মন্ত্রাদি বিষয়ে তিনি বহু তথ্য শিক্ষা করলেন। আলাড় তাঁকে বললেন, "অহংকার বন্ধনের কারণ। অহং-নাশ না হলে মুক্তি লাভ হয় না। নির্জন বাস, কঠোর তপস্যা ও ভিক্ষান্ন ভোজন করলে মুক্তিলাভ হয়। যেমন মুঞ্জ ঘাস শক্ত খোল থেকে বা বন্যপক্ষী পিঞ্জর থেকে মুক্ত হয় তেমনই অহং-উপাধিহীন হলে পরাশান্তি লাভ হয়। ইহাই চরম মুক্তির রহস্য।" আলাড়ের তিন শত শিষ্য ছিল। সিদ্ধার্থ আলাড়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করে কঠোর সাধনে নিযুক্ত হলেন, কিন্তু তাতে পরাতৃপ্তি পেলেন না। পরে তিনি রুদ্রকের উপদেশ অনুসারে কিছু দিন সাধন করেন। কিন্তু রুদ্রকের শিক্ষা তাঁর মনঃপূত হলো না। তখন তিনি বর্তমান বুদ্ধগয়ার নিকটবর্তী উরুবিল্ব অরণ্যে নৈরঞ্জনা নদীতীরে পাঁচজন অনুরক্ত শিষ্যের সাহচর্যে কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হলেন। শূন্যে আলম্বিত বৃহৎ ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় তাঁর তপস্যার খ্যাতি চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল। দূর দূর স্থান থেকে ধর্মপিপাসু নরনারীগণ তাঁকে দর্শন করতে এবং তাঁর কথা শুনতে দলে দলে এলেন। উপবাসে এবং অল্পাহারে তাঁর শরীর শুষ্ক শাখার মত শীর্ণ হলো। তিনি এত অধিক আহারসংযম আরম্ভ করলেন যে,

শেষে একটী মাত্র তণ্ডুল-কণা ভক্ষণ করেই দিন কাটাতেন। নিদ্রাহারাদির অভাবে তিনি ভালভাবে কথা বলতে, বা কানে শুনতে, বা চোখে দেখতে পেতেন না। অত্যধিক কঠোরতার ফলে তাঁর শরীর অস্থিচর্মসার হলো। অবশেষে একদিন চিন্তামগ্ন চিত্তে ধীরে ধীরে পায়চারি করতে করতে তিনি হঠাৎ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। এই দেখে শিষ্যগণ ভ্রমবশতঃ ভাবলেন, সিদ্ধার্থের নিশ্চয়ই মৃত্যু হলো। ক্রমে সিদ্ধার্থ চেতনা ফিরে পেলেন! এমন সময় একটী রাখাল বালক একবাটী দুধ এনে তাঁকে খেতে দিল। সেই দুধ খেয়ে তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হলেন এবং কৃচ্ছ্র সাধনের সঙ্কল্প ছেড়ে দিলেন। তিনি যোগভ্রষ্ট হয়েছেন ভেবে শিষ্যবৃন্দ অবজ্ঞাভরে তাঁকে ছেড়ে কাশীধামে চলে গেলেন।

প্রবাসী বণিকদের মুখে সিদ্ধার্থের কঠোর তপশ্চর্য্যার কথা শুনে রাজা শুদ্ধোদন চিন্তিত হলেন এবং স্বীয় মন্ত্রীপুত্র উদয়ীকে নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সংবাদ আনতে পাঠালেন। উদয়ী ছিলেন সিদ্ধার্থের সমবয়সী ও সহপাঠী। তিনি উরুবিম্বে গিয়ে বোধিসত্ত্বকে বললেন, "আমি তোমার বাল্যসখা উদয়ী। পিতা শুদ্ধোদন তোমার অদর্শনে মৃতপ্রায়। তুমি তাঁকে একবার দেখতে যাবে না?" সুগভীর ব্যোধিধ্যানে সিদ্ধার্থের পূর্ব স্মৃতি লোপ পেয়েছিল, নিজ নামটী পর্য্যন্ত তাঁর স্মরণ হলো না। তিনি চমৎকৃত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে সিদ্ধার্থ? কে শুদ্ধোদন? কে-ই বা উদয়ী?" ঋষি পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে বলেছেন যে, সমাধি লাভের পূর্বে সাধকের অতীত জীবনের সর্বস্মৃতির বিলোপ ঘটে। শোনা যায়, চৈতন্যদেব কাটোয়াতে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস নেবার পর তিন দিন ভগবদ্ ভাবে বিভোর ছিলেন এবং স্থানীয় রাখালকে ব্রজ-বালক, গঙ্গাকে যমুনা ও নিত্যানন্দকে বলরাম ভেবেছিলেন।

দুর্বল দেহে সিদ্ধার্থ একাকী নৈরঞ্জনা নদীতীরে বেড়াতে ছিলেন। পার্শ্ববর্তী পল্লীর সাধ্বী রমণী সুজাতা বনদেবতার সন্ধানে তথায় এলো এবং কৃচ্ছ্র সাধনে ম্রিয়মান অথচ জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসীকে দেখে বনদেবতা মনে করল। সে সঙ্কল্প করেছিল তার একটী পুত্র হলে বনদেবতাকে পূজা দেবে। সে পায়সান্ন নিয়ে সিদ্ধার্থের সম্মুখে উপস্থিত হল। সিদ্ধার্থ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি

এনেছ মা ?" সুজাতা করযোড়ে বললে, "ভগবন্, আমি আপনার জন্য এই পরমান্ন এনেছি। আমি শত গাভীদুগ্ধে পঞ্চাশটি গাভী পোষণ করেছিলাম। সেই পঞ্চাশটি গাভীর দুগ্ধে পঁচিশটি গাভী পুনরায় পোষণ করেছি। আবার সেই পঁচিশটি গাভীর দুগ্ধে বারটি গাভী পুষ্ট করেছি। সেই বারটি গাভীর দুধ খাইয়ে আরও ছয়টি ভাল ভাল গাভী পালন করেছি। তারপর তাদের দুগ্ধ দোহন করে উৎকৃষ্ট তণ্ডুলে সুগন্ধি মশলা দিয়ে এই পায়সান্ন পাক করেছি। আমার সংকল্প ছিল যে, একটি পুত্র হলে এই পায়সান্ন বনদেতাকে উৎসর্গ করবো। এখন এই পায়সান্ন আপনি গ্রহণ ও আহার করুন।" সিদ্ধার্থ সুজাতাকে শুভাশীষ দিয়ে বললেন, "তুমি যেমন তোমার ব্রত পালন করে সুখী হয়েছ, তেমনি আমিও যেন আমার জীবন-ব্রত সাধন করে বুদ্ধ হতে পারি।" সুজাতার পায়স খেয়ে সিদ্ধার্থ শরীরে একটু বল পেলেন এবং পুনবায় বোধিলাভের জন্য অটল ংকল্প করলেন।

তিনি নিরঞ্জনা নদীর তীরে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ-তলে বসে ধ্যান-মগ্ন লেন এবং বোধিলাভার্থ এই প্রতিজ্ঞা করলেন। অশ্ব ঘোষের 'ললিত বিস্তর' ন্থে তাঁর প্রতিজ্ঞাসূচক এই সংস্কৃত শ্লোকটি পাওয়া যায়।—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প-দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥

ানুবাদ— এ আসনে দেহ মম যাক্ শুকাইয়া।
চর্ম অস্থি মাংস যাক্ প্রলয়ে ডুবিয়া ॥
না লভিয়া বোধি-জ্ঞান দুর্লভ জগতে।
টলিবে না দেহ মোর এ আসন হতে ॥

এরূপ অটল সংকল্প করে বোধিলাভের জন্য সিদ্ধার্থ গভীর ধ্যানে মগ্ন লন। তখন পাপাত্মা মার সদল বলে এসে তাঁকে প্রলোভন দেখাল এবং নচ্যুত করবার জন্য সচেষ্ট হল। জীশু-খ্রীষ্ট শয়তানের দ্বারা এবং মহাদেব

কামদেব দ্বারা এইরূপে প্রলোভিত হয়েছিলেন। মার, শয়তান বা কামদেব কী সেই, যাঁকে আমাদের শাস্ত্রে পাপপুরুষ বলা হয়েছে? সে যাই হক্, সিদ্ধার্থ মারের প্রলোভন অনায়াসে অগ্রাহ্য করে ধ্যানমগ্ন হলেন। তাঁর গভীর ধ্যান ক্রমে সমাধিতে পরিণত হল। সমাধিতে তিনি মহাবোধি প্রত্যক্ষ করলেন এবং সম্যক্ সম্বুদ্ধ হলেন। তাঁর সর্ববাসনার নির্বাণ হল। বুদ্ধত্ব লাভের পর সিদ্ধার্থ বুদ্ধ নামে পরিচিত হন।* বুদ্ধত্ব লাভ করে তিনি নিম্নোক্ত উদানটি গাইলেন।—

অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সম্ অনিব্বিসম্
গহকারকং গবেসন্তো দুঃখা জাতি পুনপ্পুনং।
গহকারক দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং
বিসংখার গতং চিত্তং তনহানং খয় মজ্‌ঝগা॥

এই উদানটি বৌদ্ধ পালিগ্রন্থ ধম্মপদে পাওয়া যায়। স্বর্গগত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত এর পদ্যানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হল।—

জন্মজন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান।
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্মাণ।
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার।
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর॥
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহভিত্তিচয়।
সংস্কার বিগত-চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়॥

বুদ্ধ বোধিলাভের পর মহানন্দে সাত দিন দেহজ্ঞানহীন ছিলেন। এই সাত দিন তিনি কারো সঙ্গে কথা বলেন নি এবং অশ্বত্থ-তলে আনন্দ-বিহ্বল হয়ে পাদচারণ করেছিলেন। বুদ্ধদেব যে অশ্বত্থ-তলে বোধিলাভ করেন তার নাম

* History of Bauddha Sakyamuni by Foucaux (প্যারিস, ১৮৬৮) নামক ফরাসী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

হয়েছে বোধিদ্রুম বা বোধিবৃক্ষ। ইহা অদ্যাপি বিদ্যমান। ১৮৮৬ খ্রীঃ স্বামী বিবেকানন্দ উক্ত বৃক্ষ-তলে ধ্যান-মগ্ন হন এবং ধ্যানান্তে আবেগভরে বলেন, "এখানে বুদ্ধ যে বায়ু সেবন করেছিলেন আমি কি সেই শুদ্ধ বায়ুই গ্রহণ করেছি! তিনি যে ভূমিতে বিচরণ করেছিলেন আমি কি সেই পুণ্য ভূমি স্পর্শ করেছি!" স্বামীজী বাল্যে একবার ধ্যানান্তে বুদ্ধের দর্শন পান এবং জীবনের শেষ বর্ষে বুদ্ধগয়া তীর্থে পদার্পণ করেন। বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের প্রায় দুই তিন বর্ষ পরে সম্রাট অশোকের পুত্র ভিক্ষু মহেন্দ্র এই বোধিদ্রুমের একটী শাখা সিংহলের অনুরাধাপুর সহরে নিয়ে যান এবং তথায় প্রোথিত করেন। সেই শাখা এখন বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। উহা সিংহলী বৌদ্ধদের মহাতীর্থ।

ধর্মচক্র প্রবর্তন

আদি শিষ্যবৃন্দ

বোধিলাভের পর বুদ্ধ নির্বাণলব্ধ মহানন্দে সাত সপ্তাহ নির্বাক্ রইলেন। তিনি নীরবে বোধিমদ্রুতলে পাদচারণ করতে করতে ভাবতে লাগলেন, "আমি যে মহাসত্য উপলব্ধি করেছি তা বিষয়ীরা বুঝতে পারবে না। তারা ইন্দ্রিয়-সুখে এত উন্মত্ত যে, নির্বাণের পরম সুখের জন্য চেষ্টা করবে না। আত্মজয়ে যে মহামুক্তি, যে মহানন্দ লাভ হয় তা ইন্দ্রিয়দাসের বোধগম্য নয়। হিংসা-দ্বেষাদি দ্বন্দ্বে যারা জড়িত তারা নির্বাণ-সুখ থেকে বঞ্চিত হয়, তারা অমৃতত্বের অধিকারী হয় না। আমি যদি ধর্মপ্রচার করি সংসারীরা তা অনুসরণ করবে না, আমার কষ্ট ও শ্রমই সার হবে।"

তখন দেবতা ব্রহ্মা স্বর্গ থেকে নেমে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হলেন এবং জগতে ধর্মপ্রচারের জন্য তাঁকে আন্তরিক আর্তি জানালেন। তিনি বুদ্ধকে সাধন করে বললেন, "আপনি কর্ণধার হয়ে প্রাকৃত মানুষকে ধর্মপথ না দেখালে তারা ভবার্ণবে ডুবে মরবে।" ব্রহ্মার অনুরোধে বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচারে

সম্মত হলেন। তাঁর মনে মৈত্রী ও করুণা সমুদিত হল। তিনি জগদ্ধিতায় অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গ করতে সঙ্কল্প করলেন এবং বললেন, "অমৃতত্বের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত হোক। যাদের কান আছে তারা বুদ্ধ-বাণী শুনুক। জগতের প্রত্যেক মানুষটি পর্যন্ত মুক্ত না হলে, ধর্মলাভ না করলে আমি মহাপ্রয়াণ করব না।" বুদ্ধের করুণ দৃষ্টি দেখে ও মৌন সম্মতি জেনে ব্রহ্মা সানন্দে অন্তর্হিত হলেন।

বোধিদ্রুমতলে সাত সপ্তাহ বুদ্ধ নির্বাণ-সুখ ভোগে অভিভূত ছিলেন। নির্বাণলাভের পর তপুসা ও ভল্লিকা নামক দুই বণিক তাঁর কাছে এলেন। বণিকদ্বয় বুদ্ধদেবের দিব্যমূর্তি ও প্রশান্ত মুখমণ্ডল দেখে আকৃষ্ট হলেন। তাঁরা শ্রদ্ধাভরে তাঁকে মধু ও পিঠে খেতে দিলেন। বুদ্ধত্বলাভের পর তথাগত এই প্রথম আহার করলেন। আহারান্তে তিনি ধর্মপ্রাণ বণিকদ্বয়কে অভিনব মুক্তিপথ দেখালেন। তারা তথাগতের কৃপা পেয়ে ধন্য হল এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে জানালেন, "আমরা বুদ্ধ ও ধর্মে শরণ নিলাম।" তপুসা ও ভল্লিকা বুদ্ধের দুই প্রথম শিষ্য।

ধর্মপ্রচারের ইচ্ছা মনে আসতে প্রথমে আলাড় কলম ও রুদ্রক নামক তাঁর ভূতপূর্ব গুরুদ্বয়ের নাম বুদ্ধের মনে পড়ল। তিনি অনুসন্ধানে জানলেন, তাঁদের উভয়েরই মৃত্যু হয়েছে। তৎপরে তাঁর স্মরণ হল পূর্বতন পঞ্চ শিষ্যের কথা। তিনি শুনতে পেলেন, তাঁরা বারাণসী সমীপে মৃগদাব নামক স্থানে ঋষিপত্তনে আছেন। তিনি ধর্মপ্রচারার্থ তথায় যাবার উদ্দেশ্যে বুদ্ধত্ব লাভের পর অষ্টম সপ্তাহে কাশীযাত্রা করেন। কাশী যাওয়ার পথে তরুণ ব্রাহ্মণ জৈন উপকের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। উপক তাঁর পূর্ব-পরিচিত ছিলেন। তিনি বুদ্ধের জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল দেখে বললেন, "আপনার প্রশান্ত মূর্তি ও উজ্জ্বল চক্ষু দেখে মনে হয়, আপনি অমৃতত্ব লাভ করেছেন।" বুদ্ধ বললেন, "আমার 'আমি' মুছে গেছে। আমার দেহ শুদ্ধ ও মন বাসনামুক্ত! সত্যালোকে আমার অন্তর উদ্ভাসিত। আমি নির্বাণ লাভ করেছি। এজন্য আমার মুখমণ্ডল এত সৌম্য ও শান্ত এবং আমার নয়নযুগল এত সমুজ্জ্বল। আমি মর্ত্যলোকে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে

চাই। যারা অজ্ঞানের আঁধারে আবৃত তাদের আমি অমৃতত্বের পথ দেখাতে ইচ্ছা করি।" উপক উত্তর দিলেন, 'তবে আপনি মহাজিন, বিশ্বজয়ী, জিতেন্দ্রিয়।' বুদ্ধ বললেন, 'উপক, আমি সত্যই জিন।' উপক মাথা নেড়ে বললেন, 'হে গৌতম! আপনার পথ ঐ দিকে।' এই বলে উপক অন্য পথে চলে গেলেন।

বুদ্ধদেব কাশীতে গিয়ে মৃগদাবে সেই পঞ্চ ভিক্ষুর কাছে উপনীত হলেন। তাঁরা তাঁদের পূর্ব গুরুকে দেখে স্থির করলেন, "তাঁকে অভিনন্দন করবেন না বা 'গুরু' বলে ডাকবেন না, তাঁকে কেবল নাম ধরেই সম্বোধন করবেন।" কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন, "বুদ্ধদেব ব্রতচ্যুত হয়েছেন এবং ঐহিক ভোগবিলাসে মত্ত আছেন। তিনি এখন ভিক্ষু নন, কেবল গৌতম।" আশ্চর্য্যের বিষয়, বুদ্ধ যখন তাঁদের কাছে গেলেন তাঁর তেজঃপূত দিব্যরূপ দেখে তাঁরা পূর্বসঙ্কল্প ভুলে গেলেন এবং আসন থেকে উঠে তাঁকে যথোচিত সম্বর্ধনা করলেন, কিন্তু পূর্ব পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে তাঁকে কেহ 'বন্ধু' বলে, কেহ বা নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। তা শুনে বুদ্ধ বিরক্ত হয়ে বললেন, "তোমরা কেহ আমার নাম ধরে ডেকো না, বা আমাকে 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করো না। সিদ্ধার্থ এখন সম্বুদ্ধ হয়েছেন এবং বোধিলাভ করেছেন। তোমরা সকলে তাঁর অপূর্ব উপদেশ গ্রহণ কর। বুদ্ধ সকল প্রাণীর উপর সমদৃষ্টি করে থাকেন। তাঁকে সকলে 'পিতা' বলে সম্বোধন করে। পিতাকে অশ্রদ্ধা করা পাপ। কঠোরতার দ্বারা তথাগত মুক্তিকামী নন। কিন্তু তা বলে তিনি ঐহিক সুখের প্রশ্রয় দেন না। তিনি মধ্যপন্থার অনুগামী। বিলাস ও কৃচ্ছ্রতার মধ্য পথে চললে ধর্মজীবন সুখকর ও ফলপ্রসূ হয়। মাছ-মাংস না খাওয়া বা নগ্ন ও মুণ্ডিত-মস্তক থাকা বা জটাধারণ করা প্রভৃতি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় না, যদি বিবেক-বৈরাগ্য না থাকে। ক্রোধ, সুরাপান, একগুঁয়েমি, ভণ্ডামী, হিংসা, আত্মশ্লাঘা, পরনিন্দা ও অসৎ চিন্তাদি দ্বারাই চিত্ত মলিন হয়। তাই আমি তোমাদিগকে মধ্য পন্থা শিক্ষা দেব।" বুদ্ধের কথা শুনে উল্লিখিত পাঁচ জন ব্রাহ্মণ তাঁর চরণে প্রণত হয়ে নিবেদন করলেন, 'ভগবন্! আমাদের দোষ ক্ষমা করুন।'

ভগবান্ বুদ্ধ যখন ধর্মচক্র প্রবর্তন করতে উদ্যত হলেন তখন রত্নময় শত আসন সেখানে অকস্মাৎ বিস্তৃত হল। বুদ্ধদেব তন্মধ্যে একটি আসনে বসে উপদেশ দিতে লাগলেন। উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ তাঁর পুরোভাগে সমাসীন হলেন। তখন গৌতমের দেহ থেকে দিব্য জ্যোতিঃ বেরিয়ে দশ দিক আলোকিত করল। বুদ্ধ-বাণী শোনবার জন্য দেবতারা দলে দলে স্বর্গ থেকে সেখানে নেমে এলেন। স্বর্গধাম শূন্য হয়ে গেল। সেই শুভ মুহূর্তে সুমন্দ পবন বইতে লাগল, মনোহর কুসুম-সৌরভে চারদিক আমোদিত হয়ে উঠল। আকাশ থেকে পুষ্প-বৃষ্টি হল। পৃথিবী নীরব প্রশান্ত হয়ে গেল। প্রাণিজগৎ উৎকর্ণ হয়ে বুদ্ধ-বাণী শুনতে লাগল। যদিও বুদ্ধ তৎকালের কথ্য ভাষা পালিতে উপদেশ দিলেন তথাপি প্রত্যেকে স্ব স্ব মাতৃভাষায় সেটি যেন শুনতে পেলেন। তাঁর মুখ থেকে মুক্তিবাণী শুনে নরলোক ও উর্ধ্ব ভুবনগুলি ধন্য হয়ে গেল। তিনি যে আর্য ধর্ম প্রচার করলেন তার সারমর্ম এই।—

আর্য সত্য চারটী। প্রথম—জীবন দুঃখময়। দ্বিতীয়—দুঃখের কারণ বিষয়-তৃষ্ণা। তৃতীয়—বিষয়-তৃষ্ণাত্যাগে দুঃখনাশ হয়। চতুর্থ—অষ্টাঙ্গিক আর্য্য মার্গে চললে চিরতরে দুঃখ-নিবৃত্তি হয়, নির্বাণ লাভ হয়। অষ্টাঙ্গ আর্য্যমার্গ এই—(১) সম্যক্ দৃষ্টি (২) সম্যক সংকল্প (৩) সম্যক্ বাক্য (৪) সম্যক্ কর্ম (৫) সম্যক্ জীবিকা (৬) সম্যক্ উদ্যোগ (৭) সম্যক্ স্মৃতি (৮) সম্যক্ ধ্যান। এই অষ্টাঙ্গ ধর্ম-পথে চললে নির্বাণ লাভ হয়। নির্বাণ শূন্যময় নয়, সুখময় নির্বাণে পরম সুখ, চির শান্তি অনুভব করা যায়। বিষয়-তৃষ্ণার নির্বাণে শাশ্বতী শান্তি বা আত্যন্তিক সুখ অনুভূত হয়।

পূর্বোক্ত পঞ্চ শিষ্যের নাম কৌণ্ডিণ্য, ভদ্রজিৎ, বাষ্প, মহানাম ও অশ্বজিৎ। কৌণ্ডিণ্য সর্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। তিনি প্রথমে বুদ্ধের শরণ নিলেন। ইনিই বুদ্ধের প্রথম শিষ্য। বুদ্ধ এঁর নাম রাখলেন আজ্ঞাত কৌণ্ডিণ্য। বাকী চারজন একটু পরে তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। এই আদি পঞ্চ শিষ্য বৌদ্ধ সংঘে অর্হৎ মণ্ডলীর মধ্যে পরিগণিত হয়েছেন। প্রথম পঞ্চ শিষ্য গ্রহণ থেকে মৃত্যু পর্যান্ত বুদ্ধ যত শিষ্য গ্রহণ করেন তার বিশদ বিবরণ 'মহাবগ্গ' নামক

পালি গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রথম পঞ্চ শিষ্য সমস্বরে উচ্চারণ করলেন, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি।" তখন থেকে আজ পর্য্যন্ত কোটী কোটী নরনারীর মুখে নিত্য এই মহামন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে। যখন তাঁরা বৌদ্ধ ত্রিরত্নের শরণ নিলেন এবং জগৎকে নূতন ধর্মপথ দেখালেন তখন চারদিকে শান্তিস্রোত প্রবাহিত হল। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ অভিন্ন। বুদ্ধ ধর্মের জীবন্ত বিগ্রহ এবং সংঘ ধর্মের সংরক্ষক। বুদ্ধ তাঁর পঞ্চ শিষ্যকে সংঘ সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা 'সংযুক্ত নিকায়' নামক পালি গ্রন্থে লেখা আছে। তিনি বলেছিলেন, "সত্যলাভে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে যে ব্যক্তি একক দাঁড়ায় সে যদি দুর্বল হয় তাহলে পূর্ব পথে আবার ফিরে যেতে পারে। সুতরাং তোমরা একত্রে বাস কর, পরস্পরকে সাহায্য কর এবং পরস্পরের প্রচেষ্টা পরিপুষ্ট কর। তোমরা সকলে সহোদরের মত সংঘবদ্ধ হবে এবং প্রেমে এক, পবিত্রতায় এক এবং সত্যনিষ্ঠায় এক থাকবে। ধর্মসাধনের পক্ষে সংঘবদ্ধ জীবনই শ্রেয়স্কর। পৃথিবীর চারদিকে এই মহাধর্ম প্রচার কর, যাতে পৃথিবীর সমস্ত নরনারী ধর্মরাজ্যের অধিবাসী হতে পারে। ইহাই ভিক্ষুসংঘ। যারা বুদ্ধের শরণ নিয়েছে তারা এই সংঘে আজীবন বাস করবে এবং ধর্মপ্রচারে রত থাকবে।"

বুদ্ধের প্রথম শিষ্য কৌণ্ডিন্যই বুদ্ধ-বাণী সর্বপ্রথমে হৃদ্গত করেছিলেন। তিনি তথাগতকে সম্বোধন করে বললেন, "ভগবন, আমাদিগকে উপসম্পদা দান করুন, সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করুন।" তথাগত বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, এস। তোমরা আমার ধর্ম উত্তমরূপে বুঝেছ। দুঃখনাশ ও নির্বাণলাভের জন্য বিশুদ্ধ সাধু-জীবন যাপন কর।" তখন কৌণ্ডিন্য প্রমুখ ভিক্ষুবৃন্দ সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত হলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু-সংঘে সন্ন্যাস উপসম্পদা নামে অভিহিত।

তখন কাশীতে যশ নামে কোন ধনী বণিকের পুত্র বাস করতেন। জাগতিক দুঃখকষ্টে আহত হয়ে তিনি বিনিদ্র রজনী যাপন করছিলেন। এক গভীর নিশীথে তিনি বাড়ীর কাউকে কিছু না বলে বুদ্ধের কাছে চলে গেলেন। দূর থেকে বুদ্ধকে দেখেই যশের দুঃখভার লাঘব হল। বুদ্ধ তাঁকে সস্নেহে বললেন, এখানে কোন দুঃখ নেই, কোন কষ্ট নেই। এস, তোমাকে ধর্মশিক্ষা দিই।

ধর্মই তোমার দুঃখ দূর করবে।" এই কথা শুনে যশ আশ্বস্ত হলেন এবং বুদ্ধের কাছে গিয়ে বসলেন এবং ধর্মশিক্ষা লাভ করলেন। যেমন উত্তপ্ত দেহ ঠাণ্ডা জল পান বা ঠাণ্ডা জলে স্নান দ্বারা শীতল হয় তেমনি বুদ্ধের কথামৃত পান এবং তাঁর সঙ্গসুখে স্নান করে যশের তপ্ত প্রাণ ঠাণ্ডা হল।

তিনি নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর দেহ হীরা-মুক্তাখচিত ও অমূল্য রত্নে শোভিত। তা দেখে তাঁর অন্তর লজ্জায় ভরে গেল। তথাগত তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন, "মন রত্নময় অলঙ্কার ভূষিত হলেও ইন্দ্রিয় জয় সম্ভব। বাহ্য রূপে ধর্ম নেই, বা মন বিচলিত হয় না। শ্রমণের দেহ তপস্বীর বেশ পরলেও তার মন বিষয়-তৃষ্ণায় আকুল হতে পারে। যে নির্জন অরণ্যে থেকেও পার্থিব ভোগবিলাস কামনা করে সেই সংসারী। আর যে সংসারীর পোষাক পরেও স্বর্গীয় ভাবে ভরপুর থাকে সে-ই সন্ন্যাসী। বিষয়-তৃষ্ণা না থাকলে সংসারী ও সন্ন্যাসীর মধ্যে পার্থক্য তিরোহিত হয়।" বুদ্ধের কথা শুনে যশের মন বিবেক-বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ হল। তাঁকে সন্ন্যাসের সুযোগ্য অধিকারী জেনে বুদ্ধ তাঁকে সংঘভুক্ত করলেন এবং উপসম্পদা দিলেন। বুদ্ধ ও যশের মধ্যে যখন ধর্মালোচনা চলছিল তখন যশের পিতা পুত্রের সন্ধানে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বুদ্ধের পার্শ্বে উপবিষ্ট গেরুয়াধারী পুত্রকে দেখে তিনি পুত্রকে চিনতে পারেন নি। তিনি পথে যেতে যেতে বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভগবন্ আপনি আমার পুত্র যশকে দেখেছেন কি?", বুদ্ধ যশের পিতাকে বললেন "এখানে এলে আপনার পুত্রকে পাবেন।" পিতা মহানন্দে বুদ্ধের কাছে গিয়ে বসলেন। পুত্রও তাঁর কাছেই বসেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধের পূত স্পর্শে পুত্রের দেহ-মন এত পরিবর্তিত হয়েছিল যে, পিতা পুত্রকে প্রথমে চিনতে পারেন না। তিনি বুদ্ধের কথা শুনে পরম শান্তি পেলেন এবং বললেন, "আপনার কথা শুনে বিশৃঙ্খল জীবন সুশৃঙ্খল হয়। সুগুপ্ত ধর্মতত্ত্বকে সুলভ করে আপনি সাধারণের সম্মুখে এনেছেন। আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিলাম। ভগবন্, আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন।" যশের পিতা প্রথম গৃহী শিষ্যরূপে সংঘে যোগদান করেন।

বুদ্ধের নিকট ধর্মালোক পেয়ে পিতার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল। তখন তিনি পুত্র যশকে অদূরে উপবিষ্ট দেখলেন এবং তাঁকে বললেন, "তোমার মা দুঃখশোকে অভিভূত। বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দাও।" তখন যশ বুদ্ধের দিকে তাকালেন এবং তাঁর মনোভাব বুঝতে চাইলেন। বুদ্ধ বললেন, "যশ কি বাড়ীতে ফিরে গিয়ে পূর্ববৎ গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করবে?" যশের পিতা উত্তর দিলেন, "আমার পুত্র যশ আপনার পূত সংগে যদি লাভবান্ হয় তবে সে সেখানেই থাকুক। সে তো সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে।" বুদ্ধ যখন উভয়কে ধর্মপ্রসঙ্গে আপ্যায়িত করলেন তখন পিতা করজোড়ে বুদ্ধকে নিবেদন জানালেন, "ভগবন্, কৃপা করে আমার বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করুন এবং যশকে সেবকরূপে সঙ্গে নিন।"

বুদ্ধ উক্ত প্রার্থনায় সম্মত হয়ে গৈরিক বসন পরে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে যশের সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে গেলেন। যখন তাঁরা উভয়ে তথায় উপনীত হলেন তখন যশের মাতা ও পত্নী বুদ্ধকে প্রণামান্তে তাঁর কাছে বসলেন। তখন বুদ্ধ তাঁদের কাছে ধর্মপ্রচার করলেন। তাঁর কথা শুনে সেই নারীরাও ধর্মালোক পেয়ে আনন্দে বলে উঠলেন, "আপনার বাক্য কি মধুর। আপনার উপদেশ বিপথ-গামীকে সুপথে চালিত করে। আপনি অন্ধকারে যে আলোক জ্বালিয়ে দেন তাতে চক্ষুহীন চক্ষুষ্মান্ হয়। আমরা বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিলাম।" এইরূপে যশের মাতা ও পত্নী শিষ্যারূপে বৌদ্ধ সংঘে প্রথমে যোগ দিলেন।

যশের চারটি ধনী বন্ধু কাশীতে ছিলেন। তাঁদের নাম বিমল, সুবাহু, পুণ্যজিৎ এবং গবাম্পতি। যখন তাঁরা শুনলেন যে, যশ স্বীয় সুন্দর কেশরাশি কেটে ফেলে গৈরিক বসন পরেছেন ও সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী সেজেছেন তখন তাঁরা যশের কাছে এলেন এবং যশ তাঁদিগকে দেখে বুদ্ধকে নিবেদন করলেন, "ভগবন! আমার এই চারটি বন্ধুকে আপনি ধর্মালোক দিন।" যশের অনুরোধে বুদ্ধ তাঁর বন্ধুচতুষ্টয়কে ধর্মশিক্ষা দিলেন। তাঁরা বুদ্ধের শিষ্যত্ব স্বীকার করে ধন্য হলেন। এইরূপে পাঁচ মাসের মধ্যে ষাটজন শিষ্য সংগৃহীত হল।

বুদ্ধ-বাণী যতই প্রচারিত হল ততই বুদ্ধের নিকট লোকসমাগম বাড়তে

লাগল। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হলেন। যখন বুদ্ধ দেখলেন যে, সকলের নিকট ধর্মপ্রচার করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভবপর নয় তখন তিনি সুযোগ্য শিষ্যবৃন্দকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচারার্থ পাঠালেন এবং বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় তোমরা জগতে বিচরণ কর করুণার বশে। অজ্ঞানের অন্ধকারে পৃথিবী ছেয়ে গেছে। ধর্মালোক দানে তোমরা সেই অন্ধকার দূরীভূত কর। কিন্তু অযোগ্য বন্ধুর নিকট এই আর্য্যধর্ম প্রচার করো না। তবে যখন যোগ্য অধিকারীকে দেখবে তাকে ধর্ম শিক্ষা দেবে। তোমাদিগকে ধর্মপ্রচারের অনুমতি দিলাম।" ক্রমশঃ এই প্রথা প্রচলিত হল যে, যখন আবহাওয়া ভাল থাকবে তখন ভিক্ষুগণ চারদিকে ঘুরে ঘুরে ধর্মপ্রচার করবেন এবং বর্ষাকালে তথাগতের কাছে এসে থাকবেন।

অগ্নিহোত্রী কাশ্যপ

একবার বর্ষাকালে বুদ্ধদেব উরুবিল্বে গিয়ে অবস্থান করেন। তথায় অগ্নির উপাসক জটিলগণ বাস করতেন। তাঁদের গুরু ছিলেন অগ্নিহোত্রী কাশ্যপ। সমগ্র ভারতে তখন কাশ্যপ সুপণ্ডিত ও ধর্মোপদেষ্টারূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বুদ্ধ কাশ্যপের কাছে গিয়ে বললেন, "যে ঘরে আপনি পবিত্র অগ্নি স্থাপন করেছেন তথায় আমাকে একটি রাত্রি থাকতে দিন।" কাশ্যপ বুদ্ধের দিব্য মুখশ্রী দেখে ভাবলেন, "তিনি একজন মহামুনি, ধর্মগুরু। যদি তিনি আমার হোমকক্ষে থাকেন অজগরের দংশনে তিনি নিশ্চয়ই মারা যাবেন।" তিনি বুদ্ধকে বললেন, "আপনি যদি আমার হোম-কক্ষে থাকেন আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তথায় বিষধর অজগর সাপ আছে, তার দংশনে তো আপনি মারা যাবেন।" বুদ্ধ এই কথা শুনে নিরস্ত হলেন না এবং কাশ্যপকে হোম-কক্ষে থাকতে দেবার জন্য পুনরায় অনুরোধ করলেন। কাশ্যপের সম্মতি পেয়ে তিনি হোমকক্ষে গিয়ে বসলেন, দেহ সমুন্নত রেখে এবং পরমার্থ চেতনায় পরিবৃত হয়ে। গভীর রাত্রে এক মস্ত বড় অজগর সাপ গর্ত থেকে বেরুল, ক্রোধভরে অগ্নিবৎ বিষ উদ্গীরণ করতে করতে। তাতে কক্ষস্থিত বায়ু বিষাক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু অজগর বুদ্ধের

কোন অনিষ্ট করতে পারল না। বুদ্ধ বোধি-ধ্যানে অচল ও অটল রইলেন। বিষাক্ত সর্প তাতে এত ক্রুদ্ধ হল যে, সে নিজেই বিষ বমি করতে করতে মরে গেল! বুদ্ধের অঙ্গ-জ্যোতিতে কাশ্যপের হোমাগ্নি নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

যখন অগ্নিহোত্রী কাশ্যপ দেখলেন কক্ষনির্গত আলোক সুবিমল ও সমুজ্জ্বল তখন তিনি ভাবলেন, "আহা! তথাগতের মুখমণ্ডল কি প্রশান্ত, কি সৌম্য! কিন্তু তাঁকে তো আজ অজগর মেরে ফেলবে! পরদিন প্রাতে বুদ্ধ কাশ্যপকে অজগরের মৃতদেহ দেখিয়ে বললেন, "দেখুন, আমার আভায় এর আগুন নিবে গেছে।" অহঙ্কারী কাশ্যপ তা দেখে মনে করলেন, শাক্যমুনি বড় শ্রমণ ও শক্তিশালী, কিন্তু আমার মত বিশুদ্ধ নন। তখন একটা বিরাট ধর্মোৎসব আসন্ন ছিল। কাশ্যপ ভাবলেন, "দেশের নানা স্থান থেকে অসংখ্য নরনারী এই উৎসবে আসবে এবং শাক্যমুনিকে দেখবে। শাক্যমুনি তাদের সঙ্গে কথা বললে তারা সকলে তার কথাই নেবে এবং আমাকে ছাড়বে।" এই ভেবে ভেবে ঈর্ষায় তিনি জ্বলে উঠলেন।

উৎসবের দিন শাক্যমুনি অন্যত্র গেলেন এবং কাশ্যপের কাছে এলেন না। "কাশ্যপ শাক্যমুনির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ আপনি আমার আশ্রমে এলেন না কেন?" তথাগত উত্তর দিলেন, "হে কাশ্যপ, আপনি কি ভাবেন নি যে, উৎসব-স্থল থেকে আমি আজ দূরে গেলেই ভাল হয়?" কাশ্যপ চমৎকৃত হয়ে ভাবলেন, "শাক্যমুনি মহাপুরুষ। তিনি আমার মনোভাব বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু তিনি আমার মত মহাপুরুষ নন।" তখন তথাগত কাশ্যপের মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, "আপনি সনাতন আর্য ধর্ম হাতের কাছে পেয়েও গ্রহণ করছেন না। কারণ, আপনার হৃদয়ে ঈর্ষানল জ্বলছে দাউ দাউ করে। ঈর্ষাভাব কি পবিত্র? স্বার্থপরতার অবশেষই ঈর্ষা। কাশ্যপ! আপনি এখনো বিশুদ্ধ হতে পারেন নি। আপনি এখনও ধর্মরাজ্যে প্রবেশ লাভে সমর্থ হন নি। বৈর ভাব কিছুমাত্র থাকলে ধর্মালোক হৃদয়ে প্রবিষ্ট হবে না।"

বুদ্ধের কথায় কাশ্যপের অন্তর থেকে বৈর ভাব নিঃশেষে বিদূরিত হল।

তিনি বুদ্ধের নিকট নত শিরে প্রার্থনা জানালেন, "ভগবন্! আমাকে কৃপাপূর্বক আর্য্যধর্মে দীক্ষিত করুন।" বুদ্ধ বললেন, "কাশ্যপ! আপনি জটিলদের গুরু। প্রথমে তাদের কাছে গিয়ে আপনার অভিপ্রায় জানান এবং আপনি যা সমুচিত বিবেচনা করেন তারা তা করুক।" কাশ্যপ জটিলদের কাছে গিয়ে বললেন, "আমি ভগবান্ বুদ্ধের শরণাগত হয়ে ধর্মজীবন যাপন করতে প্রস্তুত হয়েছি। এখন তোমরা যা ভাল মনে কর তাই কর।" জটিলগণ উত্তর দিল, "আমরাও শাক্যমুনির প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন। আপনি যদি তাঁর সংঘে যোগ দেন আমরাও তাই করবো।"

উরুবিল্বের জটিলগণ তখন তাদের অগ্নি-পূজার উপাদান নদীতে বিসর্জন দিয়ে দলে দলে বুদ্ধের কাছে গেল এবং তাঁর শরণ নিল। উরুবিল্বে কাশ্যপের দুই ভাই নাদি কাশ্যপ ও গয়া কাশ্যপ খুব শক্তিশালী ধর্মাধিনায়ক ছিলেন এবং নদীর তীরেই বাস করতেন। অগ্নি পূজার দ্রব্যাদি নদীর জলে ভাসতে দেখে তাঁরা ভাবলেন, "আমাদের ভ্রাতার নিশ্চয়ই কিছু অমঙ্গল ঘটেছে।" তাঁরা স্ব স্ব শিষ্যবৃন্দ সহ উরুবিল্বে এলেন এবং সব কথা শুনে বুদ্ধের কাছে গেলেন। নাদি ও গয়ার জটিলগণ কঠোর তপস্যা ও অগ্নি-উপাসনা করত। তাদিগকে আসতে দেখে বুদ্ধদেব অগ্নি সম্বন্ধে এই উপদেশ দিলেন।—

"হে জটিলগণ, জগতের প্রত্যেক জিনিষই জ্বলছে তৃষ্ণানলে। চক্ষু জ্বলছে, ভাবরাশি জ্বলছে, ইন্দ্রিয়-গ্রাম জ্বলছে। ক্রোধ, হিংসা ও অজ্ঞান মানব মনে বাসা বেঁধেছে। যতক্ষণ অগ্নি দাহ্য দ্রব্য পাবে ততক্ষণ সে জ্বলবে, ততক্ষণ সে নিভবে না। তৃষ্ণানল থাকলে জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি, দুঃখ-শোক, বিপদ-বিলাপ যন্ত্রণা-নৈরাশ্য আসবেই। এই সকল বিবেচনা করে প্রকৃত ধর্মপিপাসু চতুর্বি আর্য্য সত্য ও অষ্টাঙ্গ ধর্মমার্গে দীক্ষিত হবে। সে অচিরে চক্ষু, কর্ণ ও জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ের ভোগ-তৃষ্ণা ত্যাগ করবে। দুনিয়ার সব কিছু জরা-জীর্ণ হয় কেবলমা তৃষ্ণাই তরুণায়িত হয়। ভোগ-তৃষ্ণার নির্বাণ হলেই শোক-দুঃখের অবসান ঘটে এবং চির শান্তি লাভ হয়।"

ভগবান্ বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে জটিলগণ পরিতুষ্ট হল এবং বুদ্ধ, ধর্ম

সংঘের শরণ নিল। উরুবিল্বে বুদ্ধের শিষ্য-সংখ্যা সর্বসমেত এক হাজারে দাঁড়াল।

আগ্নেয় উপদেশ

নবদীক্ষিত শিষ্যদের সঙ্গে তথাগত একদিন গয়ার কাছে গয়াশীর্ষ পাহাড়ে বসে আছেন। রাজগৃহের অধিত্যকা তাঁর সম্মুখে বিস্তৃত। এমন সময় সম্মুখস্থ পাহাড়ে ঘোর দাবানল জ্বলে উঠল। অবিলম্বে বুদ্ধ প্রমুখ সকলের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হল। সেই দাবানলের প্রতি লক্ষ্য করে বুদ্ধ সমবেত শিষ্য-মণ্ডলীকে নিম্নলিখিত উপদেশ* দিয়েছিলেন।

"হে ভিক্ষুগণ, বিশ্বময় যে হুতাশন দাউ দাউ করে জ্বল্‌ছে তা লক্ষ্য কর। দেখ, আদিত্য আদীপ্ত, চক্ষু প্রজ্বলিত, সমস্ত দৃশ্যমান জগতে অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচ বিষয়রূপ ইন্ধন পেয়ে ইন্দ্রিয়ানল জ্বলে উঠছে। বাসনাগ্নি, রাগাগ্নি, লোভাগ্নি ও মোহাগ্নি জ্বল্‌ছে—জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক, নৈরাশ্য, দৌর্মনস্য সেই অনলে প্রসূত হচ্ছে। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, দেহ, মন, চিন্তা সবই এক বিরাট অগ্নিকুণ্ড। ইন্দ্রিয়সমূহ কাম্য বস্তুর উপভোগে উত্তেজিত, লালায়িত। বাসনানল নিরন্তর দেহ-মনকে প্রদাহযুক্ত করছে।"

"হে ভিক্ষুগণ, এই দুর্নিবার জ্বালা দেখে জ্ঞানী সংযত হন। দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির প্রতি তাঁর বৈরাগ্য জন্মে। এই বিষম জ্বালা কিসে প্রশমিত হয়, এই সকল দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে কি উপায়ে রক্ষা পাওয়া যায় তার উপায় তিনি চিন্তা করেন এবং অবশেষে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা নির্বাণ-রাজ্যে উপনীত হন। নির্বাণ-রাজ্যে বাসনার প্রবেশ নিষিদ্ধ। তথায় তিনি জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি, ভয়-দুঃখ এবং জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে চির-মুক্ত হয়ে পরম সুখ ভোগ করেন।"

'সংযুক্ত নিকায়ে' আছে, একদা তথাগত কৌশাম্বীতে শিংশপা বনে বাস করছিলেন। তিনি একটা শিশংপা গাছ থেকে কয়েকটা পাতা হাতে নিয়ে

* স্বর্গীত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার নাম 'আগ্নেয় উপদেশ' দিয়েছেন। সেই নামই এখানে ব্যবহৃত হল।

শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভিক্ষুবৃন্দ, আমার হাতে যে পাতাগুলি আমি সংগ্রহ করেছি এবং যে গুলি শিংশপা গাছে আছে, তন্মধ্যে কোনগুলি বেশী ?" শিষ্যবৃন্দ একবাক্যে উত্তর দিলেন, যে পাতাগুলি তথাগত হাতে নিয়েছেন সেগুলি অধিক নয়, কিন্তু শিংশপা গাছে যে পাতাগুলি আছে সেগুলি তার চেয়ে অনেক বেশী।" তখন তথাগত বললেন, "তেমনি হে শিষ্যবৃন্দ, আমি যে ধর্মতত্ত্ব তোমাদিগকে বলেছি তা অতি অল্প এবং যা লাভ করেছি অথচ ব্যক্ত করি নি, তা অনেক বেশী। তা তোমাদিগকে বলি নি কেন জান ? কারণ, তা জেনে তোমাদের কোন লাভ নেই, তা তোমাদের অধ্যাত্ম উন্নতির সহায়ক হবে না। তা তোমাদিগকে পার্থিব ভূমি থেকে অপার্থিব ভূমিতে নিয়ে যাবে না, তা বাসনা-বর্জনে, অনিত্য বস্তু ত্যাগে, জ্ঞানলাভে, বোধিলাভে ও নির্বাণ প্রাপ্তিতে সহায়ক হবে না বলে আমি তা তোমাদিগকে বলি নি। ধর্মতত্ত্ব অসীম, অনন্ত। তার ইতি করা যায় না।"

'মজ্‌ঝিম নিকায়ে' আছে, মালুক্যপুত্ত তথাগতকে কয়েকটি দার্শনিক প্রশ্ন করেন এবং সরল ভাবে বলেন, "আপনি আমার দার্শনিক প্রশ্নসকলের উত্তর দেন না বলে আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি। আপনি যদি সেগুলির উত্তর দেন তাহলে আমি আপনার সংঘে থেকে ভিক্ষু জীবন যাপন করব ; আর যদি আপনি উত্তর না দেন তাহলে সাধুজীবন ছেড়ে সংসারে ফিরে যাব। যদি আপনি এই সকল প্রশ্নের উত্তর না জানেন তাহলে আমাকে স্পষ্টই বলুন, 'আমি জানি না।'" সুশান্ত শিষ্টাচার অবলম্বন করে বুদ্ধ শিষ্যের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এই গল্পটি বললেন।—কোন ব্যক্তি একটি বিষাক্ত তীর দ্বারা বিদ্ধ হয়। তার বন্ধুরা চিকিৎসকের কাছে ছুটে গেল। চিকিৎসক এসে ক্ষত স্থান থেকে তীরটা তুলে ফেলতে উদ্যত হলেন। কিন্তু আহত ব্যক্তি চীৎকার করে বলে উঠল, "থাম। আমি তীরটি তুলে ফেলতে দেব না, যতক্ষণ না আমি জানি এই তীরটা কে ছুঁড়েছিল, সে লোকটি মহিলা না ব্রাহ্মণ, বৈশ্য না শূদ্র, সে কোন পরিবারের লোক, সে লম্বা কি বেঁটে এবং তীরটি কি জাতীয় ও কি প্রকারের ইত্যাদি।" কিন্তু এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাবার পূর্বেই লোকটির মৃত্যু নিশ্চিত। এইরূপে যে শিষ্য ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সকল

সংশয় মিটাতে চায় সে দুঃখের কারণ, দুঃখনাশ ও দুঃখমুক্তির পথ জানবার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে।"

তথাগত তৎপ্রচারিত ধর্মকে 'এহি পশ্যিক' বলতেন। উক্ত শব্দের অর্থ—এস, দেখ। ধর্মতত্ত্ব বুঝতে হলে সাধন দরকার। ধর্মতত্ত্ব সম্পূর্ণতঃ বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, অনুভবগম্য। উপনিষদে আছে, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার উত্তরে কোন ঋষি বলছেন, তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। ইহার অর্থ—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা কর, বাক্য দ্বারা নয়। সম্ভবতঃ বুদ্ধ বৈদিক ঋষিদের মতই ধর্মশিক্ষা দিতেন।

রাজগৃহে প্রচার

ভগবান্ বুদ্ধ কিছুদিন উরুবিল্বে থেকে রাজগৃহে গেলেন। তাঁর সঙ্গে যে ভিক্ষুরা ছিলেন তাঁদের অনেকেই পূর্বে জটিল ছিলেন। জটিলদের পূর্ব গুরু কাশ্যপ বুদ্ধের সাথে রাজগৃহে আসেন। মগধরাজ বিম্বিসার গৌতম বুদ্ধের আগমন সংবাদ পেলেন। লোকে বলতে লাগল, "বুদ্ধদেব এসেছেন। তিনি জগৎগুরু। যেমন গাড়ীচালক বলদকে চালায় তেমনি তিনি মানবজাতির ধর্মগুরু।" বিম্বিসার অমাত্যবৃন্দ ও সেনানীগণ পরিবৃত হয়ে বুদ্ধদেবের সমীপে গেলেন।

তথায় মগধরাজ জটিলদের ধর্মগুরু কাশ্যপকে বুদ্ধের সঙ্গে দেখে বিস্ময়ান্বিত হয়ে ভাবলেন, শাক্যমুনি কি কাশ্যপের শিষ্যত্ব স্বীকার করেছেন, না কাশ্যপ বুদ্ধ গৌতমের শিষ্য হয়েছেন? তথাগত বিম্বিসারের মনোগত ভাব বুঝতে পেরে কাশ্যপকে বললেন, "তুমি কি আলোক পেয়েছ? কি জন্য তুমি অগ্নিক্রিয়া ও কৃচ্ছ্র সাধনাদি ছাড়লে?" কাশ্যপ উত্তর দিলেন, "দুঃখকষ্টসঙ্কুল সংসৃতি-চক্র থেকে মুক্ত হতে পারি নি বৈদিক যজ্ঞাদি করে। তাই আমি কর্মমার্গ ছেড়ে জ্ঞানমার্গে প্রবর্তিত হয়েছি নির্বাণের আশায়।" কঠোপনিষৎ সত্যই বলেছেন, প্লবাহি হ্যেতে অদৃঢ়াঃ যজ্ঞরূপাঃ

বুদ্ধ অনুভব করলেন, "যেমন শূন্য পাত্র জলপূর্ণ হতে চায়, তেমনি সমবেত ভ্রাতৃমণ্ডলী ধর্মপিপাসু। তাই তিনি তাদের এই উপদেশ দিলেন, "যে

অভিমানের কুফল বুঝতে পারে এবং ইন্দ্রিয়গণের প্রলোভন থেকে সতর্ক থাকে সে-ই অনন্ত শান্তি লাভ করে। 'আমি' ভাব যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মানুষ নিরভিমান হতে পারে না। 'আমি'-শূন্য, স্বার্থশূন্য না হলে মানুষ পাপাচরণ থেকে নিবৃত্ত হয় না। সৌর কিরণ দর্পণে প্রতিফলিত হলে যেমন আগুন জ্বলে ওঠে তেমনি ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগে যে জ্ঞান হয় তা ভোগবাসনা সৃষ্টি করে। বীজ থেকে যেমন অঙ্কুর উৎপন্ন হয় তেমনি অভিমান থেকে ষড় রিপুর উদ্ভব। অভিমান নষ্ট হলে তন্‌হার (তৃষ্ণার) আগুন নিভে যায়। যারা অভিমানের দাসত্ব করে তারা দিবারাত্র স্বার্থের সেবায় খেটে মরে এবং তারাই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির ভয়ে সদা ভীত হয়। 'আমি' স্বপ্নবৎ মিথ্যা। চোখ খুলে দেখ, মোহনিদ্রা থেকে জেগে ওঠ। যারা জেগে থাকে তারা দুঃস্বপ্নের ভয়ে ভীত হয় না রজ্জুতে যাদের সর্পভ্রম হয়েছিল তারা রজ্জুকে চিনতে পারলে অভীঃলাভ করে। ভোগবাসনাই পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর কারণ। ভোগ-তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হলেই নিষ্কলুষ পরম শান্তি লাভ হয়। মাতা যেমন একমাত্র পুত্রকে বাঁচাতে চায় নিজের জীবনকে বিপন্ন করেও, তেমনি যারা ধর্মালোক পেয়েছে তারা নিরহঙ্কার নিরভিমান হয়ে সর্বভূতে মৈত্রী স্থাপন করুক। বর্ণ, ধর্ম ও বয়স নির্বিশেষে তারা সমগ্র জগতের প্রতি মৈত্রীসম্পন্ন হোক। তারা উচ্চে, নীচে ও চারিদিকে বিশুদ্ধ, অনন্ত মৈত্রভাব প্রসারিত করুক। জাগ্রতে, শয়নে, স্বপনে, ভ্রমণে ও গমনে, উপবেশনে ও আহারকালে সর্বদা তোমরা মৈত্রী-বর্মে আবৃত থাক। উক্ত অবস্থাই মানব জীবনের উৎকৃষ্ট অবস্থা। ইহা স্বভাবে পরিণত হলেই নির্বাণ লাভ হয়। অসৎ আচরণ পরিত্যাগ, নৈতিক জীবন যাপন ও চিত্ত-মল অপসারণই আসল বুদ্ধধর্ম।"

যখন তথাগত উপদেশ শেষ করলেন তখন মগধরাজ তাঁকে ভক্তিভরে বললেন, "ভগবন্, পূর্বে যখন আমি রাজকুমার ছিলাম তখন আমার পাঁচটি প্রিয় কামনা ছিল। আমার প্রথম কামনা ছিল, রাজপদে অভিষিক্ত হবো সেটি পরিপূর্ণ হয়েছে। আমার দ্বিতীয় কামনা ছিল, আমি যখন রাজা হয়ে রাজ্যশাসন করব তখন বুদ্ধ যেন ধরাধামে অবতীর্ণ হন এবং আমার রাজ্যে

আসেন। আমার সে ইচ্ছাও এখন পূর্ণ হল। আমার তৃতীয় কামনা ছিল তথাগতকে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করবো। তাও এখন পূর্ণ হল। আমার চতুর্থ কামনা ছিল, তথাগতের শ্রীমুখ থেকে ধর্মীয় উপদেশ লাভ করবো। সৌভাগ্যক্রমে সেটিও পূর্ণ হয়েছে। আমার পঞ্চম কামনাই সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। আমি কি বুদ্ধ-বাণী বুঝতে পারব? আমার সেই ইচ্ছাও আপনার কৃপায় আজ পূর্ণ হল। আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম। আমি ধর্মের শরণ নিলাম। আমি সংঘের শরণ নিলাম।"

অসীম ঐশী শক্তির বলে তথাগত সমবেত ব্যক্তিগণের মন ধর্মালোকে উদ্ভাসিত করলেন। বুদ্ধের কৃপায় রাজা বিম্বিসার প্রমুখ সকলে ধর্মলাভে ধন্য হলেন এবং অচিরে রাজ্যের সর্বত্র অভিনব ধর্ম-বীজ উপ্ত হল।

রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণান্তে তথাগতকে স্বীয় প্রাসাদে আমন্ত্রণ পূর্বক বল্লেন, "ভগবন্, আপনি কি ভিক্ষুবৃন্দ সহ আগামী কাল আমার প্রাসাদে ভিক্ষা নিতে সম্মত হবেন?" পরদিন প্রাতে সেনীয়রাজ বিম্বিসার বুদ্ধের নিকট সংবাদ পাঠালেন, "হে জগৎগুরো, আপনি আমার সর্বাপেক্ষা সমাদৃত অতিথি। আপনি কৃপা করে অবিলম্বে আসুন। ভিক্ষান্ন প্রস্তুত।"

তথাগত গৈরিক বসনে সমাবৃত হয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে বহু ভিক্ষু সমভিব্যাহারে রাজগৃহ নগরে প্রবেশ করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তরুণ ব্রাহ্মণের বেশে বুদ্ধের সম্মুখে চলতে লাগলেন তাঁর এই প্রশস্তি গাইতে গাইতে।—"যিনি আত্মজয় শিক্ষা দেন ও আত্মজয়ীর সঙ্গে থাকেন, যিনি স্বয়ং মুক্তিদাতা ও মুক্ত পুরুষদের সঙ্গে বিহার করেন, এবং যিনি শান্তিদাতা ও শান্তিপ্রাপ্ত শ্রমণদিগকে সঙ্গে রাখেন সেই বুদ্ধদেব রাজগৃহে প্রবেশ করলেন। স্বাগত, সুস্বাগত। হে বুদ্ধ, আপনার নাম জয়যুক্ত হোক। যাঁরা আপনার শরণাগত ও সহগামী তাঁরাও ধন্য।"

যখন বুদ্ধ আহারান্তে ভিক্ষাপাত্র ও হাতমুখ ধুয়ে উপবেশন করলেন তখন বিম্বিসার তাঁর কাছে বসে ভাবতে লাগলেন, "তথাগতের জন্য এমন একটি স্থান আমি কোথায় পাই যেটি সহরের বেশী দূরে বা বেশী নিকটে নয়, যেটি

যাতায়াতের পক্ষে সুবিধাজনক এবং সকল দর্শন-প্রার্থীর পক্ষে সহজগম্য, যেটি দিনে জনাকীর্ণ বা রাত্রে শব্দসঙ্কুল হয় না এবং যেটি স্বাস্থ্যকর ও ধর্ম-সাধনার উপযোগী। আমার প্রমোদ উদ্যান বেণুবনটি সর্ববিষয়ে অনুকুল। আমি সংঘকে এই বেণুবন দান করব।"

রাজা ভিক্ষুসংঘকে উক্ত উদ্যান দান করে বুদ্ধদেবকে বললেন, "তথাগত কৃপাবশে এই ক্ষুদ্র দান গ্রহণ করুন।" অনন্তর তথাগত তাঁর মৌন সম্মতি জানালেন এবং ধর্মপ্রসঙ্গ দ্বারা মগধরাজকে আহ্লাদিত করলেন এবং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্বস্থানে চলে গেলেন।

বৈশালীতে মহামারী

মহাবগ্‌গে * আছে, বোধিলাভের পর তৃতীয় বর্ষায় তথাগত যখন রাজগৃহে ছিলেন তখন বৈশালী থেকে লিচ্ছবি নাগরিকদের এক দৌত্য তাঁর কাছে আসেন। দূতগণ বিনীত ভাবে বুদ্ধকে নিবেদন করলেন, "ভগবান্! ভয়ঙ্কর মহামারীর উপদ্রবে আমাদের নগর ছারখার হয়ে যাচ্ছে। আমরা অনেক উপাধ্যায়ের নিকট গিয়ে বহু চেষ্টা করেও উপদ্রব উপশম করতে পারিনি আপনি আমাদের নগরে পদধুলি দিয়ে আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

তথাগত বললেন, "রাজা বিম্বিসারের অনুমতি হলে আমি যেতে পারি।" বৈশালীর দূতদের প্রস্তাবে বিম্বিসার কোন দ্বিরুক্তি করলেন না, কেবল বললেন, "আমি আমার রাজ্যের সীমানা পর্য্যন্ত তথাগতকে পৌছিয়ে দেব। পরে তোমরা তাঁর যথাযোগ্য আতিথ্য-সৎকার করবে।" এই বলে বিম্বিসার রাজধানী থেকে গঙ্গার দক্ষিণ পার পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত রাজপথ গেছে তা সুমার্জিত এবং পুষ্পমাল্য ও পতাকাদিতে সুসজ্জিত করে দিলেন এবং স্বয়ং মন্ত্রী, সভাসদ ও পরিজনবর্গ সহ গিয়ে তথাগতকে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত পৌছিয়ে দিলেন। গঙ্গা পার হওয়া মাত্র লিচ্ছবিরা দলে দলে এসে বুদ্ধকে মহাসমারোহে বৈশালীতে

* Kern's Manual of Buddhism দ্রষ্টব্য।

নিয়ে গেলেন। বুদ্ধদেব উক্ত রাজ্যে পদার্পণ করা মাত্রই মহামারী কমে গেল এবং অপদেবতাগণ দূরে পলায়ন করল। যে নাগরিকরা কঠিন পীড়ায় জর্জরিত হয়েছিল তারা অচিরে সুস্থ হয়ে বুদ্ধের জয়গান করতে লাগল।

বুদ্ধদেব নগরে প্রবেশ করেই 'রত্নসূত্র' থেকে পদাবলী আবৃত্তি করলেন। বৈশালীতে অনেক লোক তাঁর সংঘ-ভুক্ত হল। মহামারী দূরীভূত হওয়ায় লিচ্ছবিরা তাঁকে বহুবিধ মূল্যবান্ দ্রব্য উপহার দিলেন। সেগুলি গ্রহণ করে তথাগত রাজগৃহে ফিরে এলেন। লিচ্ছবিরা বৈশালীর কুটাগারশালা তাঁকে উৎসর্গ করে যথাযোগ্য সম্মান সহকারে তাঁকে বিদায় দিল।

ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজ

বোধিলাভের পর একাদশ বর্ষে তথাগত রাজগৃহে বর্ষাকাল যাপন করেছিলেন। একদা তিনি পার্শ্ববর্তী একনালা গ্রামে গিয়ে ধনশালী ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজকে দেখতে পান। তিনি দেখলেন যে, ব্রাহ্মণ তাঁর শস্যক্ষেত্রে কৃষি-কার্য্যের তত্ত্বাবধান করছেন। ব্রাহ্মণ তথাগতকে দেখে রুক্ষ স্বরে বললেন, "হে গৌতম, আমি কৃষক। লাঙ্গল ধরে বীজ বপন করে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করি। তুমিও লাঙ্গল ধর, বীজ বপন কর, অনায়াসে আহার্য্য সংগ্রহ করতে পারবে।" বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, আমিও কৃষিকার্য্য করি এবং বীজ বপনাদি দ্বারা আহার্য্য সংগ্রহ করি।" এই কথা শুনে ব্রাহ্মণ উত্তেজিত হয়ে বললেন, "কি আশ্চার্য! তুমি বলছ, তুমি শ্রমজীবী কৃষক! অথচ তোমার বৃষভ ও লাঙ্গল নেই, বন্ধন-রজ্জুও নেই। তোমার অঙ্কুশ, যূপকাষ্ঠ এসব কিছুই দেখছি না।" তথাগত শান্তভাবে উত্তর দিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, শ্রদ্ধাই আমার বীজ। সেই বীজ আমি সর্বত্র বপন করি। সাধনাই আমার সলিল। প্রজ্ঞাই আমার লাঙ্গল। আমি সেই লাঙ্গল চালিয়ে অজ্ঞান-কণ্টক উপড়ে ফেলি। মন আমার বন্ধন-রজ্জু, একাগ্রতাই আমার দণ্ড ও অঙ্কুশ। সত্যনিষ্ঠার দ্বারা আমি সকলকে বেঁধে ফেলি এবং মৈত্রী-করুণার দ্বারা আমি সকলকে বন্ধন-মুক্ত

করি। বীর্যই আমার সাধনার বৃষভ। আমি কৃষিকর্ম করে যে শস্য আহরণ করি তা দুঃখান্তকরী নির্বাণ।"

ব্রাহ্মণ এই উপদেশ শুনে মুগ্ধ হলেন এবং বুদ্ধের শিষ্যত্ব স্বীকার করে সংঘভুক্ত হলেন। চৈতন্যদেব যেমন রজকাদি নিম্নজাতীয় লোককে ভক্তিদান করেছিলেন তেমনি বুদ্ধদেব কৃষকদিগকেও ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ করেন।

গোপাল ধনিয়া

পালি ত্রিপিটকে 'সুত্ত নিপাত' নামে একটী গ্রন্থ আছে। উহার 'ধনিয়া সুত্তে' গোপাল ধনিয়া ও ভগবান্ বুদ্ধের একটী চমৎকার কথোপকথন লিপিবদ্ধ আছে। ফাউসবল 'ধর্ম্মপদে'র যে ইংরাজি অনুবাদ করেছেন তাতে এই সুত্তটী অনুদিত হয়েছে। মূল পালি থেকে এই কথোপকথনটী অনুবাদ করে এখানে দেওয়া হল। এই গল্প থেকে জানা যায়, বুদ্ধ সাধারণ কথাবার্তার মাধ্যমে কিরূপ সকলের মধ্যে ধর্মালোক বিতরণ করতেন।

রাত্রির আঁধারে দুনিয়াকে ঢেকে ফেলেছে। মুষল ধারে বৃষ্টি পড়ছে এবং ঝড়ও বইছে। মহীতীরের গ্রাম্য পথে হঠাৎ ঝড-বৃষ্টিতে পড়ে বুদ্ধদেব পার্শ্ববর্তী গোপাল ধনিয়ার পর্ণ কুটীরের দেওযালের কাছে এসে দাঁডালেন। জানালার মধ্যে দিয়ে ধনিয়া একটী সাধুকে কুটীরের বাহিরে দাঁড়াতে দেখে বল্‌লেন, "বা! বা! সাধু, এই খানেই থাক। বৃষ্টি না থামলে যেও না।" তার পরেই উভয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত কথোপকথন আরম্ভ হলো।

ধনিয়া—সুপক্ক ওদন ও গাভী-দুগ্ধাদি খেযে স্ত্রীপুত্রাদি নিযে আমি মহীতীর গ্রামে সুখে থাকি। আমার কুটীর ভালরূপে ছাওয়া হযেছে এবং ঘরে এখন আগুণ জ্বলছে। হে বরুণদেব, তুমি এখন যথেচ্ছ বর্ষা ঢালতে পার। আমি গৃহমধ্যে নিরাপদে আছি।

ভগবান্—আমি এখন ক্রোধহীন, বন্ধনমুক্ত হয়ে মহীতীরে একরাত্রি আছি। অনাবৃত আকাশই আমার গৃহছাদ। আমার ঘরের আগুণও নিভে গেছে। যত পার তুমি দেব বরিষ এখন।

ধনিয়া—আমার ধেনুগুলি গোয়ালে এসে পড়েছে। গোয়ালে মশা-মাছি ডাঁশাদির উপদ্রব না থাকায় তারা বেশ সুস্থ আছে। তৃণাছন্ন গোচারণে তারা সারাদিন চরে বেড়ায় ও পেটভরে খায়। এখন বৃষ্টি হলে আমার কোন চিন্তা নেই।

ভগবান্—আমার ধর্ম-ভেলাটী সুগঠিত এবং ভব-নদীর তীরে সুবদ্ধ আছে। তাতে চড়ে আমি ভব-সাগর পার হয়েছি। সেই ভেলা এখন আমার নিষ্প্রয়োজন। অতএব, হে বরুণদেব! তুমি যত পার এখন বারি বর্ষণ কর।

ধনিয়া—আমার গৃহিনী সতী সাধ্বী, সুচরিতা ও পতিব্রতা। তার নামে কখনো নিন্দা শুনি নি। সুতরাং বারিবর্ষণে আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই।

ভগবান্—আমার চিত্ত সংযত ও স্বাধীন। দীর্ঘ কাল কঠোর তপস্যা করে তাকে স্ববশে এনেছি। তাতে পাপলেশ প্রবেশ করতে পারে না। হে বরুণদেব, তুমি যথেচ্ছ বর্ষণ কব।

ধনিয়া—স্বোপার্জিত অর্থে আমি সংসার চালাই। আমার পুত্রগণ নীরোগ ও বলবান্। কেউ তাদের নিন্দা করে না। অতএব, যত চাও তুমি দেব বরিষ এখন।

ভগবান্—আমি কারুর বৃত্তিভোগী গোলাম নই। আমি নিজেই নিজের প্রভু। সর্ব্বলোকে আমি অবাধে বিচরণ করি। দাসত্বের প্রয়োজন আমার নেই। সুতরাং যত বৃষ্টি হোক না কেন তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

ধনিয়া—আমার অনেক দুগ্ধবতী গাভী ও সুশ্রী বৎস আছে। আমার গরুগুলির গাত্রবস্ত্রও আছে। আমার গোপতি বৃষভেরও অভাব নেই। অতএব, বৃষ্টি হলে আমার ক্ষতি কি? আমার নূতন মুঞ্জদাম এত কঠিন ও সুদৃঢ় যে, বাছুরও সেই মুঞ্জদাম ছিঁড়তে পারে না। অতএব আমি বৃষ্টি-ভয়ে ভীত নই। ঝড়েও টলে না।

ভগবান্—যেমন বৃষভ বাঁধন ছিড়ে পালায়, যেমন সাপ লতিকা বিদলিত করে ঘুরে বেড়ায় তেমনি আমি তৃষ্ণামুক্ত হয়েছি, আমার আর গর্ভবাস হবে

না, আমি নির্বাণ লাভ করেছি। বর্ষা এখন আমাকে আর অধীর করতে পারবে না।

এমন সময় আরও কাল মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতে নিম্ন ও উচ্চ সর্বস্থান প্লাবিত হল। তা দেখে ধনিয়ার চিত্ত শঙ্কিত হল। সে ভগবান্ বুদ্ধকে এই কাতর নিবেদন জানাল।

ধনিয়া—হে ভগবন্! আপনার দর্শন পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। হে সুগত, হে মহামুনি, আপনি কৃপা করে শরণাগতকে আপনার চরণে আজ আশ্রয় দিন। আমি ও আমার গৃহিনী ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালনের সঙ্কল্প করেছি। আপনার চরণ ধরে আমরা উভয়ে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন কাটাতে এবং দুঃখমুক্ত হতে ইচ্ছা করি। এমন সময় পাপাত্মা মার এসে গোপাল ধনিয়াকে প্রলোভনে ফেলতে চেষ্টা করল। বুদ্ধবাক্যে ধনিয়ার মনে যে বিবেক ও বৈরাগ্য এসেছে তা থেকে তাকে নিবৃত্ত করবার জন্য মার আবির্ভূত হল। সে অদৃশ্য থেকে ধনিয়াকে শুনিয়ে বলল, "পুত্রবান্ পুত্রলাভে পুলকিত হয়। গোপাল গোধনলাভে আনন্দিত হয়। মায়িক আসক্তিতে মানুষ পরমানন্দ পায়। যে অনাসক্ত থাকে সে নিরানন্দে জীবন কাটায়।"

বুদ্ধদেব মারের কথা শুনে উত্তর দিলেন, "পুত্রবান্ পুত্রশোকে সদা কাতর হয়। গোধনের জন্য গোপাল সদা চিন্তিত থাকে। আসক্তিই মানব দুঃখের মূলীভূত কারণ। যে অনাসক্ত সে-ই দুঃখমুক্ত।"

বুদ্ধ-বাক্য শুনে মার অন্তর্হিত হল। গোপাল ধনিয়া মারের কথায় বিচলিত না হয়ে ভগবান্ বুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করল। সেই দুর্যোগে ধনিয়া তথাগতের দর্শন ও আশ্রয়লাভে ধন্য হল।

শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন

রাজগৃহের সমীপে কোন গ্রামে দুইটী সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করতেন এই দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে গভীর আত্মীয়তা বিদ্যমান ছিল। উভ পরিবারে একই দিনে শুভ লগ্নে দুই পুত্র ভূমিষ্ঠ হন। নবজাত শিশুদ্বয়ে

যথাক্রমে নামকরণ করা হয় উপতিসস্ ও কলিত। কিন্তু নাম দুটি আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের মনোমত না হওয়ায় উপতিস্সের নাম তার মাতা শারির নাম অনুসারে শারিপুত্র এবং কলিতের নাম তার মাতা মৌদগলির নাম অনুসারে মৌদ্গল্যায়ন রাখা হয়। এইগুলি ছিল শিশুদ্বয়ের ডাক নাম। শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন বাল্যকাল থেকে সুদৃঢ় প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন এবং উভয়ে একই গুরু সঞ্জয়ের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন।

একদিন উভয়ে স্থানীয় রঙ্গালয়ে একটি অভিনয় দেখতে যান। এই অভিনয় দেখে তাঁদের মনে পৃথিবীর অনিত্যতা উপলব্ধ হল। তাঁরা সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হতে সঙ্কল্প করলেন। উভয়ে একদিন গৃহত্যাগ করে নানা স্থানে ভ্রমণ করতে লাগলেন। কিন্তু কোন যোগ্য গুরুর সন্ধান না পেয়ে তাঁরা স্বগ্রামে ফিরে এলেন। কিন্তু গৃহত্যাগের পরেই তাঁরা সঞ্জয়ের নিকট সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। স্বগ্রামে ফিরে এসে উভয়ে স্থির করলেন, যিনি প্রথমে সদ্গুরুর সন্ধান পাবেন তিনি এসে অপরকে জানাবেন। অতঃপর পুনরায় দুইজনে গুরুর সন্ধানে বাহির হলেন।

তখন ভগবান্ বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তনান্তে চারি দিকে ধর্মপ্রচারে ব্রতী হয়েছেন। তিনি প্রথমে তাঁর ষাট জন শিষ্যকে নানা স্থানে ধর্মপ্রচারে পাঠিয়েছেন। তন্মধ্যে অর্হৎ অশ্বজিৎ রাজগৃহে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি রাজগৃহে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে ছিলেন। শান্ত সৌম্য সন্ন্যাসী অশ্বজিৎকে দেখে শারিপুত্র অতিশয় প্রীত হলেন এবং ভাবলেন, ইনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হবার যোগ্য। তিনি পুলকিত চিত্তে অশ্বজিতের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মহাশয়, আপনি কি সন্ন্যাসী? আপনার গুরু কে? আপনি কি ধর্ম আচরণ করেন।" তখন অশ্বজিৎ ভগবান্ বুদ্ধের বাণী সংক্ষেপে এইভাবে ব্যক্ত করেন, "সমস্ত পদার্থ কারণ-জাত। তথাগত বুদ্ধ সর্ব কারণের মুল কারণ অবগত হয়েছেন এবং কি উপায়ে কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার বিনাশ হয় তাও আবিষ্কার করেছেন।" শারিপুত্র অসাধারণ প্রজ্ঞাশালী ছিলেন। তাঁর মত জ্ঞানী ব্যক্তি তৎকালীন সমাজে বিরল ছিল। সেজন্য তিনি তৎক্ষণাৎ অর্হৎ অশ্বজিতের

উপদেশের সারমর্ম্ম উপলব্ধি করলেন। এই অপূর্ব ধর্ম-বাণী শুনে তাঁর ধর্ম-জ্ঞান প্রবুদ্ধ হল, তিনি স্রোতাপন্ন হলেন। উত্তম ধর্মপথের সন্ধান্ পেয়ে শারিপুত্রের অন্তর আনন্দে উৎফুল্ল হল, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেল। তিনি অশ্বজিতের নিকট তথাগতের জীবন-কাহিনী ও বর্তমান ঠিকানা অবগত হলেন।

তিনি অশ্বজিতের নিকট বিদায় নিয়ে অভিন্ন-হৃদয় মৌদ্‌গল্যাযনের কাছে ছুটে গেলেন এবং তাঁকে সব কথা খুলে বললেন। বন্ধুর মুখে বুদ্ধ-বাণী শুনে মৌদ্‌গল্যাযনও বিমল বুদ্ধ-চক্ষু লাভ করলেন, স্রোতাপন্ন হলেন। তরুণ তাপসদ্বয় সত্যধর্মের সন্ধান পেযে অতিশয় প্রফুল্ল হলেন এবং উভয়ে গুরু সঞ্জযের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে বুদ্ধদর্শনে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু সঞ্জয় বার্ধক্যবশতঃ শিষ্যদ্বয়ের অনুরোধ রাখতে পারলেন না এবং স্বীয় পাঁচ শত শিষ্যকে তাঁদের সঙ্গে যেতে অনুমতি দিলেন।

তখন বুদ্ধ রাজগৃহে বেণুবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। তাঁরা তথায় গিয়ে বুদ্ধের নিকট ভিক্ষুব্রতে দীক্ষা গ্রহণের প্রার্থনা জানালেন। বুদ্ধ তাঁদের সকলকে ভিক্ষু-ধর্মে দীক্ষিত করলেন। বৌদ্ধ সংঘে যোগদানের এক সপ্তাহ পরে মৌদ্‌গল্যায়ন একদিন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। কিন্তু আলস্য ও তন্দ্রার প্রভাবে তিনি সমাধিস্থ হতে পারছিলেন না। তথাগত যোগ-দৃষ্টি সহাযে তা জানতে পেরে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন এবং প্রচুর প্রেরণা দানে তাঁকে তন্দ্রাদি থেকে মুক্ত করলেন। বুদ্ধের পূত স্পর্শে মৌদ্‌গল্যায়নের মন সমাধিরাজ্যে প্রবেশ করল এবং তিনি আর্হত্ব প্রাপ্ত হলেন। ইহার এক সপ্তাহ পরে শারিপুত্রও উক্ত উচ্চ অবস্থালাভ করেন। অল্পকালের মধ্যে শারিপুত্র তথাগতের শিষ্যদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বৌদ্ধ সংঘে তাঁর উপাধি হল ধর্ম-সেনাপতি। তিনি সর্বাপেক্ষা প্রজ্ঞাবান্ ছিলেন এবং বুদ্ধের ন্যায় ধর্ম-ব্যাখ্যা করতে পারতেন। প্রজ্ঞায় ও মেধায় বৌদ্ধ সংঘে তাঁর স্থান ছিল বুদ্ধের পরেই বুদ্ধ স্বয়ং তাঁকে প্রজ্ঞদের মধ্যে অগ্র স্থান দিয়েছেন।

শারিপুত্র যেমন ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রজ্ঞাশীল মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন তেমনি সর্বাপেক্ষা ঋদ্ধিমান্। ভগবান্ বুদ্ধ ব্যতীত আর কেহ ঋদ্ধিতে, অলৌকিক

ক্তিতে মৌদ্‌গল্যায়নের সমকক্ষ ছিলেন না। তিনি ঋদ্ধিসহায়ে অদ্ভুত ঘটনা টাতে পারতেন। তাই বুদ্ধ মৌদ্‌গল্যায়নকে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান ়েছেন এবং বলেছেন, "আমার শ্রাবক শিষ্যগণের মধ্যে মৌদ্‌গল্যায়নই র্বাপেক্ষা ঋদ্ধিমান্।" বৌদ্ধ সংঘের এই দুই দিক্‌পাল ভারতের সর্বত্র ধর্ম-প্রচারে প্রাণপাত করেন।

যেমন একই পুণ্য দিনে দুই শিষ্যের জন্ম হয় তেমনি মাত্র দুই সপ্তাহের ্যবধানে উভয়ের মৃত্যু হয়। ভগবান্ বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের পূর্বেই উভয়ে রিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন। সেই বৎসরই বুদ্ধদেব লোকান্তরিত হন। ্রয়াণকাল সমীপবর্তী জেনে শারিপুত্র তাঁর অন্তিম ও একটি মাত্র কর্তব্য ালনের ইচ্ছা করেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী বৃদ্ধা মাতাকে বুদ্ধধর্মে দীক্ষিত করবার ন্য তিনি তথাগতের নিকট বিদায় নিয়ে কতিপয় শিষ্য সহ স্বগৃহে উপস্থিত ন। কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সুশান্ত সন্ধ্যায় শারিপুত্র মাতৃভূমি ালকাতে উপনীত হন। অতঃপর তিনি সর্বপ্রথমে তথাগতের ধর্ম স্বমাতার িকট ব্যাখ্যা করেন। পুত্রের নিকট ধর্মালোক পেয়ে মাতার অন্তর্দৃষ্টি খুলে ায়। যেই দিন তিনি নালকাতে উপস্থিত হন সেই দিনই তিনি কঠিন ামাশয় রোগে আক্রান্ত হন। চীন দেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়েন এই ালকাকেই নালন্দা বলে অভিহিত করেছেন। নালন্দাতে এক একটি প্রহর রে রাত্রি অতিবাহিত হতে লাগল। ক্লান্ত দেহে অন্তিম শয্যায় শায়িত শারিপুত্র তিকষ্টে উঠে বসলেন এবং উপস্থিত শিষ্যগণকে নিষ্ঠা সহকারে গন্তব্য স্থলে গ্রসর হতে উপদেশ দিয়ে দেহত্যাগ করলেন। বৃদ্ধা শোকাতুরা মাতা মৃত ুত্রের পদদ্বয় চুম্বন করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "হা পুত্র! আমি বিলম্বে তোমার মহত্ত্ব ও ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় পেলাম।"

মৌদ্‌গল্যায়নের পরিনির্বাণ শোচনীয় ভাবেই হয়েছিল। মৌদ্‌গল্যায়ন হাশক্তিশালী ছিলেন। সে জন্য ব্রাহ্মণগণ তাঁর খুব শত্রু হয়ে উঠেন। তাঁরা ল বলে কৌশলে মৌদ্‌গল্যায়নের প্রাণনাশের চেষ্টায় ছিলেন। পরম প্রিয় ন্ধুভ্রাতা শারিপুত্রের পরিনির্বাণের পর একদিন মৌদ্‌গল্যায়ন নির্জনে গভীর

ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে পাপাচারী ব্রাহ্মণরা কয়েকজন গুণ্ডার সাহায্যে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। দুর্বৃত্তগণ ধ্যানমগ্ন ভিক্ষুকে হঠাৎ আক্রমণ করে লৌহবৎ কঠিন মুদ্‌গরের প্রচণ্ড আঘাতে তাঁর মাথা ও দেহের সমস্ত হাড ভেঙ্গে দিয়ে তাঁকে জীবন্মৃত করে ফেলে পালিয়ে যায়। গভীর ধ্যানে নিমগ্ন মহাযোগী স্বদেহের এই অসহ্য যন্ত্রণা একবারে বিস্মৃত হন। কিন্তু ধ্যানশেষে যখন তাঁর মন দেহ-ভূমিতে নেমে এল তখন তিনি সর্বশরীরে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করলেন। কিন্তু এই যন্ত্রণা তিনি বেশী ক্ষণ সহ্য করতে পারবেন না জেনে ঋদ্ধি-বলে জর্জরিত দেহে শক্তি সঞ্চার করে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তথাগতের শেষ পুণ্য দর্শন লাভান্তে সজ্ঞানে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হলেন।

প্রধান দুই শিষ্যের পরিনির্বাণের পর তথাগত তাঁদের দেহাস্থি রাজগৃহে স্বহস্তে স্মৃতিবেদীতে স্থাপিত করেন। উক্ত স্থানেই এই দুই মহাপুরুষের পূতাস্থি* দীর্ঘকাল সংরক্ষিত ছিল।

তথাগতের পুণ্য প্রভাবে মগধরাজ্যে বহু বিশিষ্ট তরুণ ধর্মজীবন বরণ করছে দেখে লোকে ক্রোধান্বিত হয়ে কানাকানি করতে লাগল, গৌতম বুদ্ধ পতিদিগকে স্ব স্ব পত্নীত্যাগ করতে প্ররোচনা দিচ্ছেন এবং তার ফলে বহু পরিবার উৎসন্ন হয়ে যাচ্ছে। যখন তাঁরা ভিক্ষুদিগকে দেখতেন, তাঁরা দুর্বাক প্রয়োগ করতেন এবং বলতেন, "শাক্যমুনি রাজগৃহে এসে মানুষের মনগুলিকে বদলে দিচ্ছেন। এর পরে কে তাঁর শিষ্য হবে?" ভিক্ষুগণ বুদ্ধকে জনসাধারণের অভিমত জানালেন। তা শুনে বুদ্ধ বললেন, "হে ভিক্ষুগণ, এই কানাকানি বা অপবাদ বেশী দিন টিকবে না। এটি মাত্র সাত দিন চলবে। যদি লোকে তোমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে তোমরা এই বলে উত্তর দেবে 'তথাগত ধর্মপ্রচার করেই লোকনায়ক হন। প্রজ্ঞদের প্রতি কে অপবাদ দেবে? ধার্মিকগণকে কে নিন্দা করবে? আত্মসংযম, ধর্মপরায়ণতা ও চিত্তশুদ্ধি তথাগতের প্রধান উপদেশ।

* এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রথম পরিশিষ্টে প্রদত্ত।

অনাথপিণ্ডদ

তখন অনাথপিণ্ডদ* নামে এক অমিতসম্পদশালী ব্যক্তি রাজগৃহে আসেন। ...নি খুব দানশীল ছিলেন বলে লোকে তাঁকে উক্ত নামে অভিহিত করেছিলেন। ...নি সত্যই দীনবন্ধু ও অনাথশরণ ছিলেন। বুদ্ধ ধরাতে এসেছেন এবং ...খন নগরের উপকণ্ঠে বেণুবনে আছেন শুনে তিনি সেই রাত্রেই তাঁকে দর্শন ...রবার জন্য যাত্রা করলেন। তথাগত অনাথপিণ্ডদের হৃদয়স্থ গুণরাশি অন্তর্দৃষ্টি ...রা দেখতে পেয়ে ধর্মীয় আশ্বাসবাণী দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। উভয়ে ...কত্রে উপবিষ্ট হলেন। অনাথপিণ্ডদ মনোযোগ দিয়ে তথাগতের নিম্নোক্ত ...থামৃত পান করতে লাগলেন।

"জগতের কর্ম-চাঞ্চল্যই সকল দুঃখের কারণ। যে মানসিক স্থৈর্য্য অমৃত ...স্থিতে সুপ্রতিষ্ঠিত তাহা লাভ কর। অভিমান ভ্রান্তিমাত্র, জগৎ স্বপ্নবৎ ...থ্যা। যেমন বীজ থেকে গাছ উৎপন্ন হয় তেমনি প্রত্যেক কার্য্যের কারণ ...াছে। আমাদের কর্ম সদসৎ ফল প্রসব করে। সমগ্র জগৎ কার্য্য-কারণ ...খলে আবদ্ধ। মনই সকল কারণের মূল। এস, আমরা সৎকর্ম ও সৎচিন্তা ...ভ্যাস করি। তাহলে আমরা সুফল পাব।"

অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধের উপদেশ শুনে বল্লেন, "আপনি সম্যক্ সম্বুদ্ধ। আপনি ...ক্ষাৎ তথাগত। আমার মনের কথা আপনাকে বলতে চাই। সব কথা ...নে আমাকে আপনি উপদেশ দিন, আমার কি কর্তব্য। আমার জীবন ...র্মময়। প্রচুর অর্থ উপার্জন করে আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছি। তথাপি ...াজ করতে আমি ভালবাসি এবং মনপ্রাণ সৎকাজে নীয়োগ করি। বহু ...াকে আমার অধীনে নানা কাজ করে। তাদের জীবন আমার সাফল্যের ...ধীন। শুনেছি, আপনার শিষ্যবৃন্দ সন্ন্যাসের প্রশংসা এবং কর্ম-ব্যস্ততার ...ন্দা করেন। লোকে বলে, "বুদ্ধদেব পিতৃ রাজ্য ও উত্তরাধিকার ছেড়ে দিয়ে ...ক্তি-পথ আবিষ্কার করেছেন। জগৎকে তিনি নির্বাণ লাভের সহজ সরল

* অনাথপিণ্ডিকও বলা হয়। যিনি অনাথকে অন্নদান করেন তিনিই অনাথপিণ্ডদ।

পথ দেখিয়েছেন।” যা সত্য তা করতেই আমার অন্তর আকুল। মানুে দুঃখ দৈন্য মোচনে আমার প্রাণ কাঁদে। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আ আমার ধন, আমার গৃহ ও আমার ব্যবসাদি কি ত্যাগ করবো এবং আপন মত গৃহহীন সন্ন্যাসী হয়ে ধর্মজীবনের আনন্দ লাভে কোমর বাঁধবো?”

বুদ্ধ ধীর ভাবে উত্তর দিলেন, “সে ধর্ম-সাধনার আনন্দ পাবে যে অষ্ট আর্যপথে চলবে। যে ধন-সম্পদে আসক্ত তার পক্ষে ধন-সম্পদ ত্যাগই শ্রে নচেৎ উহা দ্বারা তার চিত্ত মলিন হবে। যে ধন-সম্পদে আসক্ত নয তৎসমুদয়ের অধিকারী হলেও সেগুলির সদ্ব্যবহার করবে এবং মানব ভ্রা মঙ্গলস্বরূপ হবে। আমি বলি, তুমি যে অবস্থায় আছ তাতেই থাক এবং অধ্যবস সহকারে স্বীয় ব্যবসা চালাও। জীবন, ধন বা শক্তি মানুষকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আ করে না। সে গুলির প্রতি তৃষ্ণা ও আসক্তিতেই মানুষ বাঁধা পড়ে। যে ভি অবসর ও আরাম উপভোগার্থ সংসার ত্যাগ করে তার ত্যাগ নিষ্ফ অনুদ্যমের জীবন ঘৃণার্হ।”

“তথাগতের ধর্ম কাউকে গৃহ ত্যাগ করতে, বা সংসার ছেড়ে যেতে ব না। অবশ্য যদি কেউ সংসার ত্যাগের অনাহত আহ্বান শোনে তার ক স্বতন্ত্র। তথাগতের ধর্ম চায়, প্রত্যেকে মোহমুক্ত হোক, চিত্ত শুদ্ধ কর এবং সকল সুখেচ্ছা বিসর্জন দিয়ে ধর্মপথে চলুক। যারা কারিকর, বণি রাজকর্মচারী প্রভৃতি হয়ে সংসারে থাকে বা সংসার ত্যাগ করে ধর্ম সাধন নিযুক্ত হয় তারা স্ব স্ব কর্তব্যে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করুক। তারা কর্ত পালনে অধ্যবসায়ী ও উদ্যমী হোক। যেমন পদ্ম জলে জন্মে ও জলেই ভা অথচ জলসিক্ত হয় না তেমনি যে সংসারে থেকে দ্বেষ বা আসক্তির অ হয় না এবং ধর্মজীবন যাপন করে সে নিশ্চয়ই সুখ-শান্তি ও আনন্দ লা ধন্য হয়।”

তথাগতের অমৃতবাণী শুনে অনাথপিণ্ডদ পরমানন্দ পেলেন এবং বল্লে “আমি কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তীতে থাকি। শ্রাবস্তী খুব উর্বর ও শান্তি নগর। আমাদের রাজা প্রসেনজিৎ প্রজাবৃন্দ এবং প্রতিবেশীদের ম

পরিচিত। আমার একান্ত ইচ্ছা, শ্রাবস্তীতে একটি বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়, খানে আপনার শিষ্যবৃন্দ ধর্মসাধনা নিয়ে থাকেন। আপনি কৃপাপূর্বক মার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।"

বুদ্ধ অনাথপিণ্ডদের এই দান নিঃস্বার্থভাবপ্রহৃত জেনে উহা গ্রহণ করলেন বং দান-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এই সদুপদেশ তাঁকে দিলেন, "দানশীল ব্যক্তি সকলের তির পাত্র হন। সকলে তাঁর বন্ধুত্ব কামনা করে। মৃত্যুতে তাঁর চিত্ত াম ও আনন্দ লাভ করে, কখনও অনুতপ্ত হয় না। দানের ফল পেয়ে আত্মা পরলোকে সুখে থাকে। অন্নদান করলে আমরা অধিকতর ফল ই, নগ্নকে বস্ত্রদান করলে আমাদের সৌন্দর্য্য বাড়ে এবং ধর্মকেন্দ্র স্থাপন করলে রা প্রচুর সম্পদ্ পাই। এই দিব্য রহস্যের ভাবার্থ হৃদ্গত কর। বলিষ্ঠ া যেমন সোৎসাহে যুদ্ধে যায় তেমনি নিঃস্বার্থ দাতা দানে অগ্রসর হয়। সর্বাপেক্ষা সুমহৎ সৎকর্ম্ম। নিঃস্বার্থ দাতার মুক্তিমার্গ সহজপ্রাপ্য। যে ক্ষ চারাগাছ রোপণ করে সে ভবিষ্যতে সেই গাছ থেকে ছায়া, ফুল ও ফল। তেমনি দাতাও পুণ্যকর্মের ফল ইহজন্মে বা পরজন্মে লাভ করেন। ও দান, মৈত্রী ও করুণা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয়, মুক্তি লাভ হয়।"

অনাথপিণ্ডদ শারিপুত্রকে আমন্ত্রণ করলেন, তাঁর সঙ্গে কোশলে যেতে এবং ারের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করতে।

রাজা শুদ্ধোদন

যখন বুদ্ধ রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন তখন তাঁর পিতা শুদ্ধোদন এই াদ পাঠালেন, "মৃত্যুর পূর্বে আমি একবার আমার প্রাণাধিক পুত্রকে দেখতে করি। তার মুখে ধর্মপ্রসঙ্গ শোনবার সৌভাগ্য অনেকেই লাভ করেছে; তার পিতা বা আত্মিয়েরা তা থেকে এখনো বঞ্চিত।" বার্তাবহ গিয়ে এই সংবাদ দিলেন এবং নিবেদন করলেন, "হে বিশ্ববন্দ্য তথাগত! পঙ্কজ সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করে তেমনি আপনার পিতা আপনার গমনের অপেক্ষায় আছেন।"

বুদ্ধ পিতার অনুরোধ রক্ষা করতে সম্মত হলেন এবং কপিলবাস্তুতে করলেন। অচিরে শাক্যরাজ্যে এই শুভ সংবাদ প্রচারিত হল, যুবরাজ সি অমৃতত্ব লাভের জন্য সংসার ত্যাগ করেছিলেন। তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ ফিরে আসছেন।

অমাত্যবৃন্দ ও আত্মীয়স্বজনগণকে সঙ্গে নিয়ে রাজা শুদ্ধোদন বুদ্ধকে সম করতে বাহির হলেন। দূর থেকে স্বীয় পুত্র বুদ্ধকে দেখতে পেয়ে, তাঁর সৌ ও দৃপ্ত ভাব দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। তিনি অন্তরে আনন্দিত হলেও মুখে প্রকাশ করলেন না। তিনি ভাবলেন, "বস্তুতঃ এই আমার পুত্র সিদ্ধ তার চোখ, মুখ, হাত, পা সবই আমার সুপরিচিত। এই সন্ন্যাসী আ প্রাণাধিক পুত্র হলেও তার এবং আমার মধ্যে এখন দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান হয়েছে। সে এখন সম্বুদ্ধ জগৎগুরু।" শুদ্ধোদন পুত্রের ধর্মীয় মর্য্যাদা বি করে রথ থেকে নেমে এলেন এবং পুত্রকে প্রথমে অভিবাদন করে সজল বললেন, "সাত বৎসর পরে তোমাকে দেখতে পেলাম। এই মিলন আমার অত্যন্ত আকাঙ্খিত ছিল।" বুদ্ধ পিতার সম্মুখে আসন গ্রহণ ক এবং পিতা উৎসুক নয়নে সস্নেহে পুত্রকে দেখতে লাগলেন। তিনি নাম ধরে ডাকতে চাইলেন, কিন্তু সাহস করলেন না। তিনি স্নেহাতি মনে মনে চীৎকার করে উঠলেন, "প্রাণাধিক সিদ্ধার্থ! বৃদ্ধ পিতার ফিরে এস বাবা! আবার তার কাছে পুত্ররূপে থাক!" কিন্তু পুত্রের দাঢ় ভাব দেখে তিনি স্বীয় আবেগ চেপে রইলেন, বাক্যে প্রকাশ করলেন না বিষাদে অভিভূত হলেন।

এইরূপে পিতা পুত্রের সম্মুখেই বসে রইলেন। বিষাদে হর্ষ এবং হর্ষে উভয় ভাবই তাঁর চিত্তকে আন্দোলিত করল। কখনো তিনি পুত্রের নিজে গৌরবান্বিত বোধ করলেন, কখনো বা সেই গৌরব বিষাদে পরিণত যখন তিনি মনে করলেন যে তৎপুত্র আর কখনো সিংহাসনে বসবেন রাজা বিষন্ন বদনে পুত্রকে বলে উঠলেন, "আমার সমগ্র রাজ্য তোমাকে ইচ্ছা করি; কিন্তু তুমি তো রাজ্যভার গ্রহণ করবে না। কারণ এই বৃদ্ধ

ামার কাছে ভস্মবৎ মূল্যহীন।" পিতার মনোবেদনা বুঝতে পেরে বুদ্ধ রাজাকে
লেন, "আমি জানি যে, রাজার হৃদয় পুত্রের প্রতি স্নেহপ্রবণ এবং পুত্রের
ভাবে পিতা মৃতপ্রায়। কিন্তু পুত্রকে আপনি যে স্নেহ-সূত্রে বেঁধে ছিলেন
তো এখন ছিন্ন হয়েছে। সেই পুত্রপ্রীতি আপনার প্রজাবৃন্দ ও মানবজাতির
ার সমানভাবে ছড়িয়ে দিন। প্রত্যেক প্রজাকে এবং এমন কি, প্রত্যেক
ুষকে পুত্রবৎ স্নেহ করুন। তাহলে আপনি সিদ্ধার্থ অপেক্ষা মহত্তর সন্তান
বেন, বুদ্ধকেও পাবেন এবং নির্বাণ-সুখের অধিকারী হবেন।"

স্বপুত্র বুদ্ধের মধুর বাক্য শুনে পিতার হৃদয় মহানন্দে উচ্ছ্বসিত হল। তিনি
নন্দের আতিশয্যে কাঁপতে লাগলেন এবং বুদ্ধের হাত দুইটি ধরে সজল নয়নে
কার করে বললেন, "অদ্ভুত আমার পরিবর্তন! আমার হৃদয়ের গভীর শোক
স্ত হয়েছে। প্রথমে আমার বিষন্ন হৃদয় শোকভারগ্রস্ত ছিল। কিন্তু
ন আমি তোমার দিব্য স্পর্শের মহিমা বুঝতে পারছি, তোমার সন্ন্যাসে সুফল
ভব করছি। এখন আমি বুঝেছি, তুমি রাজ্যসুখ ছেড়েও ধর্মসাধন করে
ই করেছ। তুমি যে বোধিলাভ করেছ তা জগতে প্রচার কর।
পিপাসুগণ তোমার মুখে মুক্তি-বাণী শুনে ধন্য হোক।" শুদ্ধোদন রাজপ্রাসাদে
র এলেন এবং বুদ্ধ কপিলবাস্তুর উপকণ্ঠে রাজোদ্যানে অবস্থান করলেন।

পরদিন প্রাতে বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র নিয়ে মাধুকরী ভিক্ষায় বহির্গত হলেন।
ই সংবাদ রাষ্ট্র হল, "যুবরাজ সিদ্ধার্থ যে নগরে অনুচর বর্গ-সহ রথে চড়ে
ড়াতেন তথায় তিনি দ্বারে দ্বারে ঘুরে অন্ন ভিক্ষা করছেন। রাজবেশের
রিবর্তে তিনি গৈরিক বসনে দেহাবৃত করেন এবং তাঁর হাতে মাটির
ক্ষাপাত্র।" এই অদ্ভুত জনরব শুনে রাজা অবিলম্বে রাস্তায় গিয়ে পুত্রকে
লেন, "তুমি আমাকে এরূপে অপমানিত করছ কেন বাপধন? তুমি কি
ন না যে, আমি অনায়াসে তোমাকে এবং তোমার ভিক্ষুবৃন্দকে আহার
গাতে পারি?" বুদ্ধ গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, "রাজন্, ভিক্ষান্নে উদরপূর্তি
াগতের বংশধারা।" রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন, "তা কিরূপে হতে পারে?
ম রাজবংশ-সম্ভূত এবং তন্মধ্যে একজনও কখনো অন্ন ভিক্ষা করেন নি।"

বুদ্ধ উত্তর দিলেন, "আপনি ও আপনার বংশের পূর্বপুরুষগণ রাজা হতে পারেন কিন্তু আমি প্রাচীন বুদ্ধবংশজাত। আমার পূর্বে আরো চব্বিশ জন বুদ্ধ* হয়েছেন। তাঁরা সকলেই ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করতেন।"

রাজা নিরুত্তর রইলেন। বুদ্ধ বলতে লাগলেন, "হে রাজন্। ইহা একটি প্রাচীন প্রথা যে, যদি কেহ একটী গুপ্ত রত্ন পায় সে সেই অমূল্য ধন স্বীয় পিতাকে উপহার দেয়। আপনি অনুমতি করুন, যে দুর্লভ ধর্ম-রত্ন আমি লাভ করেছি সেটী আপনাকে উপহার দিই। আপনি এই রত্ন গ্রহণ করুন।" অনন্তর বুদ্ধ রাজাকে শুনিয়ে যে স্বগত উদান উচ্চারণ করলেন, তার ভাবার্থ এই—"জীবন-স্বপ্ন থেকে জাগুন, আর মোহ-নিদ্রায় অভিভূত থাকবেন না। শাশ্বত সত্য লাভের জন্য চিত্ত-দ্বার উন্মুক্ত করুন। অষ্টাঙ্গ আর্য ধর্ম অভ্যাস করলেই অনন্ত সুখের অধিকারী হবেন।"

অনন্তর রাজা স্বপুত্রকে প্রাসাদের মধ্যে নিয়ে গেলেন। মন্ত্রীরা এবং রাজবাড়ীর বাসিন্দারা সকলে মিলে বরেণ্য অতিথিকে গভীর শ্রদ্ধাভরে সম্বর্ধনা করলেন। কিন্তু তথায় রাহুলের জননী যশোধরাকে দেখা গেল না। রাজা যশোধরাকে ডেকে পাঠালেন, কিন্তু যশোধরা অভিমান-ভরে উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই আমি যদি কোন সম্মানের যোগ্য হই, তবে সিদ্ধার্থ এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।" বুদ্ধ সকল স্বজন ও বান্ধবকে যথাযোগ্য অভিনন্দন জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "যশোধরা কোথায়?" যশোধরা আসতে অস্বীকৃত হয়েছেন শুনে তিনি গাত্রোত্থান করে সোজা তাঁর কক্ষে গেলেন। দুই শিষ্য শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে তিনি তাঁর সঙ্গে যুবরাণীর কক্ষে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি শিষ্যদ্বয়কে বললেন, "আমি মুক্ত। কিন্তু যুবরাণী এখনো মুক্ত নয়। প্রায় সাত বৎসর আমার বিরহে সে অত্যন্ত শোকাকুল হয়েছে। তার শোক প্রশমিত না হওয়া পর্য্যন্ত তার হৃদয় ব্যথিত থাকবে যদি সে তথাগতকে স্পর্শ করে তোমরা তাকে বাধা দিও না।"

---

* সূত্রপিটকের অন্তর্গত 'বুদ্ধবংশ' গ্রন্থে গৌতম ও তৎপূর্ববর্তী চব্বিশ বুদ্ধের জীবন বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

স্বীয় কেশরাজি কেটে ফেলে ও সামান্য বসন পরে যশোধরা স্বীয় কক্ষে আনমনা হয়ে দেবপতির শুভাগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। যখন বুদ্ধ তাঁর কক্ষে এলেন তখন তিনি উচ্ছ্বসিত জলপাত্রের মত আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তাঁর প্রেমাস্পদ এখন সত্যপ্রচারক, ধর্মশিক্ষক ও সম্বুদ্ধ হয়েছেন, এই কথা ভুলে গিয়ে তাঁর পা দুটী ধরে তিনি প্রাণের আবেগে কাঁদতে লাগলেন। তারপর শ্বশুর শুদ্ধোদন সমীপে আছেন স্মরণ হওয়ায় তিনি পতির পা ছেড়ে উঠে একটু দূরে শ্রদ্ধাভরে আসন গ্রহণ করলেন।

রাজা শোকাকুলা পুত্রবধূর পক্ষ সমর্থন করে বললেন, "এটি যশোধরার সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাস নয়, এটি অসীম প্রীতির আধিক্যে ঘটেছে। গত সাত বৎসর পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে সে মাথার কেশদাম কেটে ফেলে অলঙ্কার ও সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার ত্যাগ করে সন্ন্যাসিনীর মত জীবন কাটিয়েছে। পতির মতই সে নির্দিষ্ট সময়ে মাটির পাত্রে পানাহার করত। যেদিন সিদ্ধার্থ তাকে না জাগিয়ে সংসার ছেড়ে চলে গেল সেদিন থেকে সে উচ্চাসনে বসত না, পালঙ্কে শুত না। অন্যান্য রাজকুমার যখন তাকে বিয়ে করতে চাইল সে সগর্বে উত্তর দিয়েছিল, "আমি এখনো তাঁরই আছি এবং আমৃত্যু তাঁরই থাকব!" সুতরাং সিদ্ধার্থ, তার ভাবাতিশয্য মার্জনা কর।"

বুদ্ধ কোমলভাবে যশোধরাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং পূর্ব পূর্ব জন্মের সুকৃতি-বশে সে এই শুভ জন্ম পেয়েছে তাও বললেন। বুদ্ধ যশোধরাকে সপ্রেমে জানালেন, "তুমি পূর্ব পূর্ব জন্মেও আমার জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করেছ। তোমার পবিত্রতা, তোমার নিষ্ঠা, তোমার ভক্তি বোধিসত্ত্বের পরম সম্পদ্ ছিল। বুদ্ধত্ব লাভের পথে তুমি বোধিসত্ত্বকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলে। তুমি এত পবিত্র ছিলে যে, তুমি বুদ্ধকে পতিরূপে পাবার কামনা করেছিলে। সুতরাং তোমার কর্মফলেই তুমি আমাকে এজন্মেও পতিরূপে পেয়েছ। পাঁচ শত জন্ম তোমাকে ত্যাগ করার ফলে, তোমার সাহচর্যের বলে আমি বুদ্ধত্ব লাভে সমর্থ হয়েছি।" যশোধরার শোক বর্ণনাতীত ছিল। কিন্তু যখন তিনি তাঁর ত্যাগ ও দুঃখের মহিমা বুঝতে পারলেন তখন অদ্ভুতরূপে তাঁর দুঃখরাশি দিব্যানন্দে পরিণত হল।

রাহুল

বুদ্ধ যখন কপিলবাস্তুর বহির্গ্রামে ছিলেন তখন নগরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর নিকট নবধর্মে দীক্ষিত হন। তন্মধ্যে আনন্দ, দেবদত্ত, উপালি, রাহুল ও অনুরুদ্ধ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কপিলবাস্তুতে প্রথম তিনি তাঁর পুত্র রাহুলকে ধর্মদীক্ষা দেন। কপিলবাস্তুতে তাঁর আগমনের সপ্তম দিবসে সপ্তবর্ষ বয়স্ক পুত্র রাহুলকে যশোধরা রাজকুমারের পোষাকে সজ্জিত করে তাঁকে বললেন, "এই সাধু তোমার পিতা। তাঁকে ব্রহ্মার মত দ্যুতিমান্ দেখাচ্ছে। চারটি অনন্ত রত্নখনি তাঁর অধিকারে আছে। তাঁর কাছে যাও এবং পৈতৃক সম্পত্তি চেয়ে নাও। কারণ পুত্রই পিতার সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।" রাহুল উত্তর দিলেন, "মা, রাজা শুদ্ধোদন ব্যতীত অন্য পিতাকে আমি জানি না। কে আমার পিতা?" মাতা পুত্রকে কোলে নিয়ে জানালার মধ্য দিয়ে বুদ্ধকে দেখিয়ে দিলেন। তখন বুদ্ধ প্রাসাদের সমীপে দাঁড়িয়ে ভিক্ষান্ন ভোজন করছিলেন। মাতা পুত্রকে বললেন, "ঐ যে পুরুষসিংহকে দেখছ ইনিই তোমার পিতা।" শাক্যবংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী বুদ্ধের কাছে গিয়ে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে স্নেহভরে ডাকলেন, "পিতঃ, আমাকে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী করুন।" পিতার কাছে দাঁড়িয়ে পুত্র রাহুল মধুর স্বরে আরও বললেন, "হে সাধু! এমন কি, আপনার ছায়াও সুশীতল ও শান্তিপ্রদ।" তথাগত ভোজন সমাপনান্তে পুত্রকে স্নেহাশীষ দিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু রাহুল তাঁর পেছনে পেছনে যেতে লাগলেন এবং বার বার পিতার নিকট উত্তরাধিকার ভিক্ষা করলেন। কেহই বালককে তাঁর পিতার পেছনে যেতে নিষেধ করলেন না, এমনকি বুদ্ধও না।

বুদ্ধ শারিপুত্রের দিকে ফিরে বললেন, "আমার পুত্র উত্তরাধিকার চাইছে। যে নশ্বর সম্পদ্ দুশ্চিন্তা ও দুঃখ টেনে আনে তা আমি পুত্রকে দেব না। অবিনশ্বর অধ্যাত্ম সম্পদ্‌ই আমি তাঁকে দান করব।" রাহুলকে সস্নেহে সম্বোধন করে বুদ্ধ বললেন, "স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মাণিক্য আমার অধিকারে নেই। যদি

তুমি অধ্যাত্ম সম্পদ্ নিতে ইচ্ছুক থাক এবং তা রক্ষা করতে যত্নবান্ হও তাহলে আমি তোমাকে চারিটি আর্যসত্য শিক্ষা দেব। যার ফলে তোমাকে অষ্টাঙ্গ ধর্মপথে চলতে হবে। যে সংঘে সাধুরা সর্বস্ব ত্যাগ করে সর্বোত্তম সুখ শান্তি লাভার্থে বাস করে তুমি তাতে যোগ দেবে কি ?" রাহুল দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিলেন, 'হাঁ।' রাহুলকে সম্মত দেখে বুদ্ধ আনন্দকে বললেন, "বালককে একখানি গেরুয়া কাপড় দাও।" ত্যাগের পতাকা গেরুয়া বস্ত্র পেয়ে রাহুল সংঘভুক্ত হলেন। এই সংবাদ পেয়ে রাজা শুদ্ধোদন অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি ইতঃপূর্বে তাঁর দুই পুত্র সিদ্ধার্থ ও আনন্দ এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দেবদত্তকে হারিয়েছিলেন। এখন পৌত্র রাহুল সন্ন্যাসী হলেন দেখে তিনি বুদ্ধের কাছে গিয়ে অভিযোগ করলেন। বুদ্ধ তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এখন থেকে পিতামাতার বা অভিভাবকের সম্মতি ব্যতীত তিনি কোন নাবালককে সন্ন্যাস দেবেন না ও সংঘভুক্ত করবেন না।

রাহুলের দীক্ষালাভের পরদিন বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ নবধর্মে দীক্ষিত হন। সেদিন নন্দের যৌবরাজ্যে অভিষেক এবং কল্যাণী নাম্নী সুন্দরীর সহিত বিবাহ স্থির হয়েছিল। বুদ্ধদেব নন্দগৃহে প্রবেশ করে নন্দকে ডাকলেন এবং তাঁকে নগরের বাইরে এক বটবৃক্ষতলে নিয়ে গিয়ে যথাবিধি আর্য্য ধর্মে দীক্ষা দিলেন। কন্যা কল্যাণী ব্যাকুল হৃদয়ে বরাগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। কিন্তু বর আর বাড়ীতে ফিরে এলেন না। পরে শোনা গেল, নন্দ তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও সংঘভুক্ত হয়েছেন।

বুদ্ধের পাঁচ শত্রু ছিলেন। তাঁদের নাম সুপ্রবুদ্ধ, দেবদত্ত, নন্দ, যক্ষ নন্দক, ও চিঞ্চা। বুদ্ধ তাঁর চতুর্দশ বর্ষা জেতবনে যাপন করেন। তথায় রাহুল বিশ বৎসর বয়সে উপসম্পদা দীক্ষা প্রাপ্ত হন। সেই বৎসর বুদ্ধ পুনরায় কপিলবাস্তুতে আগমন করেন। সুপ্রবুদ্ধ ছিলেন যশোধরার পিতা ও বুদ্ধের শ্বশুর। কপিল-বাস্তুতে অবস্থানকালে বুদ্ধ সুপ্রবুদ্ধ কর্তৃক অতিশয় অপমানিত হয়েছিলেন। বুদ্ধ রাজধানীর বহিঃস্থানে এক বটবৃক্ষতলে অবস্থান করছিলেন। তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে সুপ্রবুদ্ধ তথাগতকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়নে প্রবৃত্ত হন।

বুদ্ধদেব ভিক্ষায় বাহির হবেন শুনে সেই পাষণ্ড মদ্যপানে উন্মত্ত হয়ে তাঁর পথরোধ করতে আসেন এবং তাঁকে অশিষ্ট ভাবে তিরস্কার করেন। বুদ্ধ নীরবে শ্বশুরের দুর্বাক্য সহ্য করে আনন্দকে মৃদু স্বরে বল্লেন, "দেখ, এঁর অন্ত কাল আসন্ন। সাত দিনের মধ্যেই এঁকে পৃথিবী গ্রাস করে ফেলবে।" এই কথা শুনে সুপ্রবুদ্ধ ঈষৎ হাস্য করে মনে মনে ভাবলেন, "আমি এক সপ্তাহ আমার প্রাসাদের স্তম্ভোপরি দিনপাত করব। দেখা যাক্, পৃথিবী আমাকে কিরূপে গ্রাস করে।" সে দুরাত্মা ভাবেন নাই যে, পাপী পাপ-ফল হতে কোথাও নিস্তার পায় না। তথাগত সুপ্রবুদ্ধকে বলেছিলেন, "অন্তরীক্ষে, সমুদ্রমধ্যে, পর্বত-বিবরে বা জগতে এমন কোন স্থান নেই যেখানে থাকলে মানুষ পাপকর্ম বা মৃত্যু-কবল থেকে রক্ষা পাবে।" বুদ্ধের কথাই অচিরে সত্য হল। সপ্তম দিবসে পৃথিবী সুপ্রবুদ্ধের পদতলে বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং দুষ্কৃতির দণ্ডরূপে তাঁকে অবীচি নরকে নিক্ষেপ করল।

কপিলবাস্তু হতে ফিরে এসে বুদ্ধদেব জেতবন বিহারে কিছুদিন বাস করেন। পার্শ্ববর্তী আলাবি গ্রামে এক নৃশংস যক্ষ থাকত। একদিন বুদ্ধ সেই যক্ষকে দেখতে গেলেন। যক্ষ তাঁকে অভ্যর্থনা করা তো দূরের কথা, তাঁকে অকারণে তিরস্কার করতে লাগল। তীব্র তিরস্কারে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বুদ্ধ সাধু ব্যবহারে তাকে বশীভূত করলেন। যক্ষ একটু শান্ত হয়ে তাঁকে বল্ল, "হে শ্রমণ! আমি তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব। তার সদুত্তর যদি দিতে না পার তোমাকে জলে ডুবিয়ে মারব।" 'তথাস্তু' বলে বুদ্ধ তার সকল প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করলেন। সেই অবধি যক্ষ তাঁর পদানত দাস হয়ে তাঁর সেবায় নিযুক্ত রইল এবং ক্রমে সংঘভুক্ত হয়ে শুদ্ধাচারী সাধুরূপে সুখ্যাতি লাভ করল। লোকে এই অলৌকিক ঘটনা দেখে স্তম্ভিত হল। এইরূপ অলৌকিক ঘটনা বুদ্ধের জীবনে বহু ঘটেছিল। কিন্তু তিনি অলৌকিকতার বিরোধী ছিলেন বলে সেগুলিকে অগ্রাহ্য করেছিলেন।

জেতবন

অনাথপিণ্ডদ স্বগৃহে ফিরে এসে উত্তরাধিকারী জেতের মনোরম উদ্যানটি দেখলেন। উদ্যানটি সবুজ বিতান ও স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বতীতে শোভিত ছিল। তিনি ভাবলেন, এই স্থানটি বৌদ্ধ সংঘের বিহারের উপযোগী। তিনি রাজকুমারের কাছে গিয়ে জমিটি কিনতে চাইলেন। কিন্তু রাজকুমার জেত সেই স্থানটি খুব পছন্দ করতেন। তাই সেটি বিক্রয় করতে তিনি সম্মত হলেন না। প্রথমে অস্বীকৃত হলেও শেষে তিনি এই সর্তে সম্মত হলেন, "যদি আপনি এই ভূমি স্বর্ণ মুদ্রায় ঢেকে দিতে পারেন তাহলেই আমি এটি বিক্রয় করব। অন্য কোন মূল্যে এটি বিক্রয় করতে রাজী নই।"

অনাথপিণ্ডদ আনন্দিত হয়ে জমির উপর স্বর্ণমুদ্রা বিছাতে লাগলেন। কিন্তু রাজকুমার জেত বললেন, "কষ্টকরে আপনি আর স্বর্ণমুদ্রা ছড়াবেন না; কারণ আমি কিছুতেই এটি বেচব না।" কিন্তু অনাথপিণ্ডদ এতে নিরস্ত হলেন না। এইজন্য উভয়ের মধ্যে মতভেদ ও বিরোধ উপস্থিত হল এবং তাঁরা আদালতে বিচারার্থ গেলেন। ইতোমধ্যে লোকে এই কথা শুনে অপ্রিয় মন্তব্য করতে লাগল। এদিকে কুমার জেত অনাথপিণ্ডদের দানশীলতা ও সদুদ্দেশ্যের পরিচয় পেয়ে একটু নরম হলেন। বুদ্ধের নাম শুনে তিনি বিহার-স্থাপনে অংশগ্রহণার্থ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং স্বর্ণমুদ্রায় কেবলমাত্র অর্ধমূল্য নিয়ে জমিটি অনাথ-পিণ্ডদকে দিলেন। তিনি তাঁকে ব'লে রাখলেন, "জমিটি আপনার; কিন্তু গাছগুলি আমার। আমি গাছগুলি বুদ্ধকে বিহারের জন্য উপহার দিব।" শারিপুত্রের মধ্যস্থতায় উভয়ে একমত হলেন।

বিহারের ভিত্তি স্থাপনান্তে গৃহ-নির্মাণ আরম্ভ হল। বুদ্ধের নির্দেশ মত গৃহের উচ্চতা, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ স্থির হল। বিহারটি নানা কারুকার্যে সুশোভিত হয়ে উঠল। এই বিহারের নাম জেতবন। ইহার নামকরণ হয় কুমার জেতের নামানুসারে। গৃহ-নির্মাণ শেষ হলে অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ জানালেন শ্রাবস্তীতে এসে বিহারের দ্বারোদ্ঘাটন করতে। তাঁর অনুরোধে তথাগত কপিলবাস্তু থেকে শ্রাবস্তীতে এলেন। বুদ্ধদেব যখন জেতবনে প্রবেশ

করলেন তখন অনাথপিণ্ডদ বিহারপথে ফুল ছড়িয়ে দিয়ে ধূপ-ধুনো জ্বাললেন এবং একটি স্বর্ণ পাত্র থেকে জল ঢালতে ঢালতে বল্লেন, "এই জেতবন বিহার বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘের ব্যবহারার্থ নিবেদিত হল।" বুদ্ধ এই দান গ্রহণ করে আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন, "সকল অসৎপ্রভাব থেকে এই স্থান অতিক্রান্ত হোক। এই দান ধর্মরাজ্য বিস্তারে সহায়ক হোক। ইহা সাধারণতঃ মানবজাতির এবং বিশেষতঃ দাতার কল্যাণকর হোক।"

বুদ্ধদেব এসেছেন শুনে রাজা প্রসেনজিৎ জেতবনে গেলেন এবং করজোড়ে বুদ্ধকে প্রণতি জানালেন ও শ্রদ্ধাভরে বল্লেন, "আমার অযোগ্য ও অখ্যাত রাজ্য আপনার পদার্পণে আজ ধন্য হল, আমার রাজ্যের এই সৌভাগ্য অপূর্ব। ধর্মরাজের উপস্থিতিতে এখানে আর কোন বিপদ-আপদ ঘটবে না। যখন আমি সুকৃতিবশতঃ আপনার দর্শন পেয়েছি তখন আপনার কথামৃত পানে ধন্য হতে চাই। ঐহিক লাভ ক্ষণিক। কিন্তু ধর্মোন্নতি অক্ষয়। রাজা হলেও বিষয়ী লোক দুঃখকষ্ট পায়। কিন্তু সাধারণ লোকও ধর্মপথে চল্লে শান্তির অধিকারী হয়।" রাজার মনোভাব বুঝতে পেরে বুদ্ধ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন এবং বল্লেন, "যারা অসৎকর্মের ফলে নিম্ন জাতিতে জন্মেছে ধার্মিক লোককে দেখলে তারাই শ্রদ্ধান্বিত হয়। আপনার মত সৎকর্মনিষ্ঠ স্বাধীন রাজা বুদ্ধকে দর্শন করে ভক্তিমান্ হবেন, ইহাই শোভনীয়।

"আমি সংক্ষেপে ধর্মব্যাখ্যা করছি। মহারাজ মনোযোগ দিয়ে তা শুনুন ও হৃদয়ঙ্গম করুন। আমাদের সৎকর্ম বা অসৎকর্ম ছায়ার মত সদাই আমাদিগকে অনুসরণ করে। প্রেমিক হৃদয় সমাজে বিশেষ প্রয়োজন। পুত্রবৎ আপনি প্রজাদিগকে পালন করুন। তাদের প্রতি অত্যাচার করবেন না, তাদের কোন অনিষ্ট করবেন না। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখুন এবং সর্বতোভাবে অধর্ম ছেড়ে সরল ধর্মপথে চলুন। দীন হীন দুর্বলকে পদদলিত করবেন না। দুঃখীকে সান্ত্বনা দিন, সাহায্য করুন। রাজকীয় মর্যাদার দিকে বেশী নজর দেবেন না, বা চাটুকারদের মিষ্টবাক্যে ভুলবেন না। কঠোরত আশ্রয় করে ধর্মজীবনে বিশেষ লাভ হয় না। কিন্তু বুদ্ধ ও তৎপ্রচারিত ধর্ম

অনুধ্যান করলে শান্তি পাওয়া যায়। আমরা চার দিকে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির পার্বত্য প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত।

"অষ্টাঙ্গ আর্য্য ধর্ম সাধন দ্বারাই এই দুঃখময় পর্বত লঙ্ঘন করা যায়। বৈষম্য অভ্যাস করে কি লাভ? যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা দেহসুখ, ভোগেচ্ছা ঘৃণা করেন এবং ধর্মোন্নতি ভালবাসেন। যখন গাছ আগুণে জ্বলতে থাকে তখন কি পাখীরা তথায় বাসা বাঁধতে পারে? ষড়রিপুর জ্বলন্ত আগুনে যখন জীবন প্রজ্জলিত থাকে তখন তাতে সত্যের বিকাশ বা শান্তির উদয় হয় না। ধর্মহীন মানুষ পশুতুল্য। ধর্মমহিমা যে বুঝতে পারে সে পূর্ণপ্রজ্ঞ হয়। বোধিলাভই মানব জীবনের চরম উৎকর্ষ। বোধি-ধর্ম অবহেলিত হলে জীবন ব্যর্থ হয়। এই সত্য শুধু সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রযোজ্য নয়, ইহা গৃহী ও সন্ন্যাসী সকলের পক্ষেই সমানভাবে প্রযোজ্য। ব্রতধারী সন্ন্যাসী এবং গৃহবাসী সংসারীর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। অনেক সন্ন্যাসী ব্রতচ্যুত হয়ে নরকে যায়, আবার বহু গৃহী ব্রতসাধনপূর্ব্বক ঋষিত্বলাভে ধন্য হয়। তৃষ্ণা-স্রোত সকল মানুষের পক্ষেই বিপজ্জনক। তৃষ্ণানলে পৃথিবী প্রজ্জলিত। তৃষ্ণার আবর্তে পড়লে আর রক্ষা নেই। মারের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে ভব-সাগরে ধর্মপোতে চড়ে বিচারের হাল ধরে বসতে হবে। যখন কর্মফল থেকে অব্যাহতি লাভ অসম্ভব তখন সৎকর্ম অনুষ্ঠানই শ্রেয়স্কর। আমাদের মনোগত ভাবরাশি বিশ্লেষণ করা উচিত, অসৎ ভাবগুলিকে বেছে ফেলবার জন্য। আমরা যেমন বীজ বপন করব তেমন শস্য কাটতে পারব। জীবনের পথ দুটি—অসৎ থেকে সতে এবং সৎ থেকে অসতে গমন। বিবেকী সতত অসৎ থেকে সতে যাবার চেষ্টা করে। ধর্মাচরণ দ্বারা প্রকৃত আভিজাত্য, চরম উৎকর্ষ প্রদর্শন করুন। পার্থিব বস্তুর অনিত্যতা এবং জীবনের নশ্বরতা উপলব্ধি করে ধর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। চিত্তকে উন্নত করুন। কখনও রাজকীয় সদাচারের বিধি লঙ্ঘন করবেন না। আপনার সুখশান্তি যেন ধর্মানুসারী হয়, ইহা যেন ভোগ্য বস্তুর উপর নির্ভর না করে। এইরূপে আপনি চিরকালের জন্য সুনাম রেখে যেতে পারবেন এবং তথাগতের অনুগ্রহ লাভ করবেন।"

রাজা প্রসেনজিৎ একমনে ও শ্রদ্ধাভরে বুদ্ধদেবের উপদেশ শুনলেন এবং স্মৃতিপটে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখলেন। বুদ্ধ-বাণী তাঁর মর্ম স্পর্শ করল।

ধর্মরাজ্য সম্প্রতিষ্ঠা

রাজবৈদ্য জীবক

'মহাবগ্গ' নামক পালি গ্রন্থে জীবক-চরিত পাওয়া যায়। জীবক বুদ্ধদেবের সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। রাজা বিম্বিসারের পুত্র অভয়ের ঔরসে রাজগৃহে তাঁর জন্ম হয়। রাজগৃহ, উজ্জয়িনী, বারাণসী প্রভৃতি বিখ্যাত নগরে তিনি চিকিৎসা করতেন। পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবেন না, এই আশঙ্কায় তিনি উচ্চ বিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে জীবিকা নির্বাহের সংকল্প করেন। সেই অনুসারে তিনি তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আয়ুর্বেদের অধ্যাপক আত্রেয়ের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। আত্রেয় জীবককে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি আমাকে কত করে বেতন দিতে পারবে?" জীবক উত্তর দিলেন, "মহাশয়, কাউকে না বলে আমি বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছি। আপনাকে দেবার মত একটী কপর্দকও এখন আমার হাতে নেই। শিক্ষা শেষ হলে আমি চির জীবন আপনার অনুগত থাকবো।" আত্রেয় জীবকের কথায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে আয়ুর্বেদ পড়াতে আরম্ভ করলেন। জীবক সুদীর্ঘ সাত বৎসর অধ্যয়নের ফলে চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হলেন। তখন অধ্যাপক অন্তেবাসীর অভিজ্ঞতা পরীক্ষার্থ আদেশ দিলেন, "এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চারি দিকে আট ক্রোশের মধ্যে যে সকল লতা ও বৃক্ষ আছে তন্মধ্যে যে গুলি চিকিৎসার কাজে লাগে না সেগুলি সন্ধান করে এস।" চারি দিন ক্রমাগত অনুসন্ধান করে জীবক আত্রেয়ের সম্মুখে ফিরে এসে বললেন, "ঔষধে কাজে লাগে না, এমন কোন লতা পেলাম না।" উত্তর শুনে গুরু সানন্দে ছাত্রকে গৃহে ফিরে যেতে অনুমতি দিলেন।

জীবক মগধে ফিরবার পথে একদিন অযোধ্যাতে বিশ্রাম করেন। তথায় তিনি একটু মাখন গরম করে তাতে একটা ঔষধ মিশিয়ে নস্ত তৈয়ার করেন। তা ব্যবহার করে কোন স্থানীয় রমণী কঠিন শিরঃপীড়া থেকে মুক্ত হন। রাজগৃহে এসে রাজা বিম্বিসারের কোন দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি সারিয়ে তিনি বহু মূল্যবান পুরস্কার পান। বারাণসী এবং উজ্জয়িনীতেও তিনি সুচিকিৎসকরূপে পরিগণিত ছিলেন। রাজগৃহে অস্ত্র-চিকিৎসাতেও তাঁর অশেষ সুনাম ছিল। তথাগতের বুদ্ধত্ব লাভের বিশ বৎসর পরে জীবক বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। বুদ্ধদেব তাঁর চিকিৎসায় বহুবার আরোগ্য লাভ করেন। একবার বুদ্ধ আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। জীবক পদ্মফুলের মধ্যে ঔষধ রেখে তাঁকে সেবন করতে দেন। তাতেই বুদ্ধদেব আমাশয় থেকে মুক্ত হন। আর একবার বুদ্ধ অসুস্থ হলে জীবক পূর্ববৎ তাঁকে পদ্মফুলে ঔষধ রেখে আঘ্রাণ করতে দেন। সেই পদ্মফুল আঘ্রাণ করেই বুদ্ধ নীরোগ হন। বুদ্ধকে সেবাশুশ্রূষা করবার সুযোগ পাবেন ভেবে জীবক নিজ উদ্যানে একটি বিহার নির্মাণ করেন। উক্ত বিহার তিনি বুদ্ধকে উপহার দেন। একদা মগধে কুষ্ঠ, ধবল, অপস্মার প্রভৃতি পঞ্চবিধ কঠিন রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। রোগীরা দলে দলে জীবকের নিকট চিকিৎসার জন্য আসতে লাগল। জীবক তাদের বললেন, "আমার হাতে এখন অনেক কাজ, আমি রাজা বিম্বিসারের প্রাসাদ-চিকিৎসক। বুদ্ধদেব এবং তাঁর ভিক্ষুসংঘের চিকিৎসার ভারও আমি নিয়েছি। সুতরাং আমার সময় নেই। আমি আপনাদের চিকিৎসা করতে পারব না।" রোগীরা ভাবল, "যদি আমরা বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হই ও ভিক্ষুসংঘে প্রবেশ করি তাহলে ভিক্ষুরাই আমাদের পরিচর্যা করবেন, আর জীবক আমাদের চিকিৎসক হবেন।" এইরূপ স্থির করে বহু রোগী বৌদ্ধ সংঘে যোগদান করল। কিন্তু তারা যেই সেরে উঠল অমনি সংঘ ছেড়ে স্ব স্ব গৃহে ফিরে গেল। জীবক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে তারা বলল, "এখন আমরা নীরোগ ও সুস্থ হয়েছি, আর আমাদের ধর্মসাধনের প্রয়োজন নেই।" জীবক বুদ্ধের নিকট গিয়ে এসকল কথা নিবেদন করলেন। তা শুনে বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে ডেকে আদেশ দিলেন, "তোমরা

কুষ্ঠ, ধবল, যক্ষ্মাদি মহাব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে দীক্ষা দিও না বা .সংঘভুক্ত করো না।"

জীবক বহু ভিক্ষুকেও চিকিৎসা করেছিলেন। একবার একটি ভিক্ষুর পায়ে বড় ক্ষত হয়। জীবক তা শীঘ্র সারিয়ে দেন। তখন থেকে তাঁর পরামর্শে বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে আবশ্যকমত মোজা ও পাদুকাদি ব্যবহার করতে অনুমতি দেন। একদা উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোত পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হন। রাজবৈদ্য জীবকের চিকিৎসায় প্রদ্যোত নষ্টস্বাস্থ্য ফিরে পান। এই জন্য রাজা চিকিৎসককে এক প্রস্থ বহুমূল্য উৎকৃষ্ট পোষাক উপহার দেন। তা পেয়ে জীবক মনে মনে ভাবলেন, 'এই পোষাক দামী কাপড়ে প্রস্তুত। তথাগত বা বিম্বিসার ব্যতীত এই পোষাক ব্যবহার আর কারুর সাজে না।" এই ভেবে জীবক পোষাকটি নিয়ে বুদ্ধের কাছে গেলেন এবং তাঁকে অভিবাদনান্তে তৎসমীপে উপবেশন করে বললেন, "ভগবন্, আপনার কাছে একটি বর চাই।" বুদ্ধ উত্তর দিলেন, "জীবক তথাগতরা বরণীয় বিষয় অবগত না হয়ে বর দান করেন না।"

জীবক নিবেদন করলেন, "ভগবন্। ইহা সুসঙ্গত ও অনাপত্তিকর প্রার্থনা।" বুদ্ধ বললেন, "জীবক, কি বর চাও বল।" জীবক করযোড়ে প্রার্থনা করলেন, তথাগত শ্মশান বা জঞ্জাল-স্তূপ থেকে ছেঁড়া কাপড় কুড়িয়ে এনে ব্যবহার করেন। আপনার ভিক্ষু-সংঘও তদ্রূপ করে থাকেন। কিন্তু ভগবন্। এই মূল্যবান্ ও উৎকৃষ্ট পোষাক রাজা প্রদ্যোত আমাকে উপহার পাঠিয়েছেন। এরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর, রত্নখচিত ও মনোহর পোষাক বিরল দেখা যায়। হে ভগবন্, আপনি এই পোষাক গ্রহণ করুন এবং ভিক্ষুসংঘকে ভাল পোষাক পরতে অনুমতি দিন।" বুদ্ধ উক্ত পরিচ্ছদ গ্রহণান্তে জীবককে ধর্মোপদেশ দিলেন। পরিশেষে তিনি ভিক্ষুবৃন্দকে সম্বোধন করে বললেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ইচ্ছা কর তারা ত্যক্ত ও ছিন্ন বস্ত্র ব্যবহার করতে পার। কিন্তু যারা ইচ্ছা কর তারা ভাল পরিচ্ছদও পরতে পার। তোমরা এই দুটির মধ্যে যেটা পছন্দ কর সেটাতেই আমার অনুমোদন আছে।" যখন রাজগৃহের নাগরিকগণ শুনলেন যে, বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে ভাল পরিচ্ছদ পরতে অনুমতি দিয়েছেন তখন

দের মধ্যে যাঁরা দানশীল তাঁরা আনন্দিত হলেন। একদিনেই কয়েক হাজার
রিচ্ছদ রাজগৃহে ভিক্ষুরা উপহার পেলেন।

প্রথমে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ঔষধ-পথ্য বা ভাল পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন না।
ন্তু যখন তাঁরা নানা রোগে আক্রান্ত হতে লাগলেন বুদ্ধ তাঁদের ঔষধ-বস্ত্রাদি
বহারের অনুমতি দিলেন। এই ব্যাপারে জীবকের পরামর্শ বিশেষ কার্য্যকরী
য়ছিল। যখন গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করেন তখন মুক্তিপথের যাত্রিগণ কৃচ্ছ্র
ধনে প্রবৃত্ত হতেন। তৎকালে সেই প্রথাই সমধিক প্রচলিত ছিল। দৈহিক
য়োজন থেকে আত্মাকে মুক্ত করা এবং পরিশেষে আত্মাকে অশরীরী করাই
দের চরম লক্ষ্য ছিল। সেজন্য অশনে, বসনে, ও আশ্রয়ে তাঁরা বিলাসিতা
র্জন করতেন এবং অরণ্যে পশুদের মত জীবন কাটাতেন। অনেক সাধু উলঙ্গও
কতেন। আর যাঁরা কাপড় পড়তেন তাঁরা শ্মশান বা আবর্জনা-স্তূপ থেকে
ছু ছেঁড়া কাপড় কুড়িয়ে এনে জোড়া দিয়ে পরতেন। বুদ্ধ যখন সংসার ত্যাগ
রলেন তখন তিনি নগ্ন সাধুদের এই ভ্রম ধরে ফেললেন এবং উক্ত অভ্যাসের
শিষ্টতা বিবেচনা করে ত্যক্ত বস্ত্রে স্বদেহ আবৃত করতেন। বুদ্ধত্ব লাভের
র তিনি ও তাঁর ভিক্ষুগণ অশনে ও বসনে এই ভাবে চলতেন। কিন্তু
য়োজন-বশে উক্ত প্রকার কৃচ্ছ্রতা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয় এবং কালোপযোগী
বহার আরম্ভ হয়।

শুদ্ধোদন বৃদ্ধ ও রুগ্ন হয়ে পড়লেন এবং স্বপুত্রকে ডেকে পাঠালেন। দূত গিয়ে
দ্ধকে বললেন,"মৃত্যুর পূর্বে আর একবার রাজা আপনার দর্শন কামনা করেন।"
াজা শয্যাশায়ী শুনে বুদ্ধ তাঁর রোগশয্যার পাশে এসে বসলেন। শুদ্ধোদন
ান্তিম সময়ে সম্বুদ্ধ সন্তানকে কাছে পেয়ে পরম শান্তিলাভ করলেন। পুত্রের
ত সান্নিধ্যে পিতাও বোধিলাভে সমর্থ হলেন এবং পুত্রের ক্রোড়ে মাথা রেখে
হত্যাগ করলেন। প্রবাদ আছে, গর্ভধারিণী মায়াদেবীকে ধর্মালোক দানার্থ
দ্ধ ঊর্ধ্বলোকে গমনপূর্বক দেবতাগণের সঙ্গে বাস করেন। স্বর্গে সঙ্কল্পিত
দেশ্য সিদ্ধ করে তিনি মর্ত্যে ফিরে আসেন এবং পূর্ববৎ ধর্ম প্রচারে
প্রবৃত্ত হন।

ভিক্ষুণী সংঘ

যশোধরা সংঘে যোগদানের জন্য তিনবার বুদ্ধের অনুমতি ভিক্ষা করেন। কিন্তু বুদ্ধ তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করেন নি। এখন বিমাতা প্রজাপতি যশোধরা এবং অন্যান্য রাজবংশীয় মহিলাদের সঙ্গে তথাগতের কাছে গেলেন এবং ভিক্ষুণী-ব্রত গ্রহণার্থ কাতর প্রার্থনা জানালেন। যখন আনন্দ বুদ্ধের নিকট এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন তখন বুদ্ধ বললেন, "যদি স্ত্রীলোকেরা গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসিনী না হয় তাহলে এই ধর্ম হাজার বছর অব্যাহত থাকবে। আর তারা সংঘে যোগদান করলে সংঘের আয়ু পাঁচশত বৎসর কমে যাবে, ধর্মের পবিত্রতা শীঘ্রই নষ্ট হবে।" আনন্দ পুনরায় প্রার্থনা জানালেন, "মহিলারা কি সংঘে প্রবেশ করতে পারে? তাঁহাদিগকেও গেরুয়া কাপড় দিব কি?" বুদ্ধ উত্তর দিলেন 'বোধিলাভে লিঙ্গ-ভেদ নেই। আমি কি কখনও বলেছি যে, আমার সংঘে নারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ?" আনন্দ যখন তৃতীয়বার প্রার্থনা জানালেন সমবেত নারীদের পক্ষ থেকে, তখন বুদ্ধ অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুমতি দিলেন। এইরূপে বিমাতা প্রজাপতি প্রথম ভিক্ষুণীরূপে সংঘে স্থান পেলেন। পরে যশোধরাও ভিক্ষুণী সংঘে যোগদান করেন।

বুদ্ধ পাঁচশত জন্মের জাতক গল্পগুলি যশোধরাকে উদ্দেশ্য করেই বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, 'পাঁচ শত জন্ম বুদ্ধ ও গোপা পরস্পরকে ভুলে ছিলেন এবার উভয়ে একত্রে বোধিলাভ করলেন।" বুদ্ধ বিমাতা প্রজাপতিকে নিম্নোক্ত নিয়মাষ্টক পালনের সর্তে ভিক্ষুণী-সংঘে যোগদানের অনুমতি দেন।—(১) ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে অভিবাদন করবে। (২) যেখানে কোন ভিক্ষু নেই সেখানে কোন ভিক্ষুণী বর্ষাবাস করবে না। (৩) প্রত্যেক পক্ষে কোন ভিক্ষুর নিকট থেকে ভিক্ষুণী উপবসথের দিন ধার্য্য করবে। (৪) বর্ষাবাসের পরে ভিক্ষুণী উভয় সংঘের কাছে পবরণ করবে। অর্থাৎ ভিক্ষু সংঘ বা ভিক্ষুণী সংঘের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করবে। (৫) যে ভিক্ষুণী কোন মারাত্মক অপরাধে অপরাধিনী হবে সে উভয় সংঘের নিকট মানাত্তা শাস্তি মেনে নেবে। (৬) কোন ব্রহ্মচারিণী দুই বৎসর সংঘবাসের পর উভ

ংঘের নিকট উপসম্পদা দীক্ষা প্রার্থনা করবে। (৭) কোন ভিক্ষুণী কোন ভিক্ষুকে নিন্দা বা নির্যাতন করবে না। (৮) ভিক্ষুণী কর্তৃক ভিক্ষুকে বৈধ শিক্ষা দান নিষিদ্ধ।

বুদ্ধোক্ত নিয়মাষ্টক শুনে গোতমী প্রজাপতি স্বপুত্র আনন্দকে বললেন, "ঠিক যেমন কোন পুরুষ বা নারী বাল্যে বা তারুণ্যে স্নানান্তে পদ্ম, জুঁই বা চাঁপা লের মালা দুই হাতে নিয়ে মাথায় রাখে বা গলায় পরে তেমনি আনন্দ! আমি এই আটটি প্রধান নিয়ম আজীবন পালনার্থ গ্রহণ করলাম।" ভিক্ষুণী প্রজাপতি কর্তৃক রচিত একটী সুন্দর কবিতা পালি গ্রন্থ 'থেরী গাথা'তে পাওয়া য়। কবিতাটীর সারাংশ এখানে দেওয়া হল।—"হে বুদ্ধ! এই ধর্মদান রে তুমি আমাকে নবজীবন দিয়েছ এবং তুমি আমার পিতা হয়েছ। তুমি আমার ক্রোড়েই বড় হয়েছিলে। এখন তুমি আমাকে ধর্মবাহু দিলে। তোমার ক্ষুধা-তৃষ্ণার সাময়িক নিবৃত্তির জন্য আমি তোমাকে দুধ ও ফলাদি ওয়াতাম। তুমি আমাকে ধর্মামৃত খাইয়ে চিরস্থায়ী চিত্ত-শান্তির অধিকারিণী রছ। মান্ধাতাদি রাজাদের মায়েদের নাম অতীতের বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন য়েছে। তোমার বিমাতা হয়েও আমি অমর হয়েছি। রাজমাতা বা জরাণী হওয়া কঠিন নয়; কিন্তু বুদ্ধ-মাতা হওয়া অত্যন্ত শ্লাঘ্য। শৈশবে তুমি কথা বলতে তা শুনে আমি যা তৃপ্তি পেতাম এখন তোমার মুখে ধর্মোপদেশ ন আমি তদপেক্ষা অধিক তৃপ্তি পেয়েছি।"

বুদ্ধদেব তাঁর চতুর্দ্দশ বর্ষাবাস জেতবনে করেন। তথায় রাহুল তাঁর নিকট শ বৎসর বয়সে উপসম্পদা দীক্ষা লাভ করেন। রাহুল অতি অল্প বয়সেই ঘভুক্ত হয়েছিলেন। পুত্রকে ও পতিকে নিত্য দর্শনের আশায় যশোধরাও ক্ষুণী হলেন। রাহুল শ্রমণ হয়েও জননী যশোধরাকে ভিক্ষুণী সংঘে প্রায়ই খতে যেতেন। একদিন তিনি গিয়ে দেখেন, তাঁর মাতা নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত াই। এক ভিক্ষুণী এসে তাঁকে সংবাদ দিলেন যে, যশোধরা কোষ্ঠকাঠিন্যে ষ্ট পাচ্ছেন। তখন রাহুল ভিক্ষুণী মাতার শয্যাপার্শ্বে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এই রোগে আপনার কি পথ্য করা উচিত?' যশোধরা উত্তর দিলেন,

'যখন আমি পিত্রালয়ে বা শ্বশুরালয়ে থাকতাম তখন পাকা আমের রস ও চি
মিশিয়ে খেলে আমার কোষ্ঠবদ্ধতা সেরে যেত। এখন আমি ভিক্ষান্নে জী
ধারণ করি। এখন আমি চিনি মিশ্রিত আমরস পাব কোথায়, বাবা
রাহুল বল্লেন, 'আমি এখনি তা আপনাকে এনে দিচ্ছি। আমি যত
পারি উক্ত পথ্য নিয়ে ফিরে আসব।' রাহুলের ধর্মসেনাপতি ছিলেন শারিপু
ধর্মশিক্ষক মৌদ্গল্যায়ন, খুল্লতাত ছিলেন আনন্দ এবং পিতা ছিলেন স্বয়ং বু
সুতরাং তিনি সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান্ ভিক্ষু ছিলেন। তাঁকে সংঘের ভিক্ষু-ভিক্ষুণী
সকলেই স্নেহের চোখে দেখতেন। তিনি অন্য কারুর কাছে না f
সোজা শারিপুত্রের কাছে গেলেন এবং তাঁকে অভিবাদনান্তে বিষণ্ন ব
তথায় দাঁড়িয়ে রইলেন। শারিপুত্র সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বা
তোমাকে বিষণ্ন দেখছি কেন?' রাহুল উত্তর দিলেন, 'আমার মা কোষ্ঠকাf
ভুগ্ছেন। তাঁর বিশ্বাস, চিনি মিশ্রিত আমরস খেলে তিনি সুস্থ হবে
শারিপুত্র আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'রাহুল, বেশ কথা। আমি তোমার মা
জন্য এই পথ্য শীঘ্র এনে দিচ্ছি। তুমি সেজন্য চিন্তিত হয়ো না।' এই
শারিপুত্র রাহুলকে নিয়ে শ্রাবস্তীতে গেলেন এবং তাঁকে একটি পাথরের উ
বসিয়ে রাজপ্রাসাদে ঢুকলেন। তখন বাগানের মালী রসপূর্ণ মিষ্ট আম এ
পাত্রে এনে দিল। রাজা স্বয়ং পাকা আমগুলি ছাড়িয়ে রস তৈরী করে f
মিশিয়ে শারিপুত্রের ভিক্ষা-পাত্র ভরে দিলেন। শারিপুত্র আমরসপূর্ণ ভিক্ষাপা
রাহুলের হাতে দিয়ে বললেন, 'এটি তোমার মাকে দাও।' রাহুল আমরস f
মাতাকে দিলেন এবং মাতা তা খেয়ে কোষ্ঠবদ্ধতা থেকে আরোগ্য লাভ করলে
অন্য এক সময় যশোধরা অম্লাধিক্য রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। রাহুলের ক
এই সংবাদ পেয়ে শারিপুত্র তাঁর জন্য টাট্কা মাখন মিশ্রিত ভাত ও বাটামা
তরকারী ভিক্ষা করে এনেছিলেন। তা খেয়ে যশোধরা উক্ত রোগ থেকে
পান। অবশ্য যশোধরার অভিপ্রায় অনুযায়ী উক্ত পথ্য সংগৃহীত হয়।

প্রজাপতি, যশোধরা প্রভৃতি শাক্যনারীগণ ভিক্ষুণী রূপে সংঘে যোগ
পর ভিক্ষুগণ একদিন তথাগতকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে ভগবন্! সংসা

ণদিগকে নারীদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে আপনি আদেশ দেন ?"
থাগত উত্তর দিলেন, "নারীর প্রতি দৃষ্টিপাতের সময় তোমরা সাবধান হবে।
ই কোন নারীকে দেখ তার মুখের দিকে তাকাবে না। মনে করবে, যেন
কে তুমি দেখনি। আর দেখে ফেললেও তার সঙ্গে কথা বলবে না। যদি
ান কারণে কথা বলতে বাধ্য হও শুদ্ধ মনে কথা বলবে এবং ভাববে, 'আমি
ণ। বেদাগ পদ্মপত্র যেমন পাঁকের মধ্যেও নির্মল থাকে তেমনি আমি এই
পময় জগতে নিষ্পাপ থাকব। যদি সেই নারী বৃদ্ধা হন তাঁকে স্বীয় জননীর
মনে করবে। যদি তিনি তরুণী হন তাঁকে নিজ ভগিনী তুল্য জ্ঞান করবে।
র যদি সে খুব অল্পবয়স্কা হয় তাকে তোমার কন্যাতুল্য ভাববে। যে শ্রমণ
ীকে শুধু নারী বলেই দেখে বা স্পর্শ করে সে নিশ্চয়ই ব্রতচ্যুত হয়। সে
র শাক্যমুনির শিষ্য নয়।"

"মানুষের কাছে কামশক্তি প্রবলরূপ ধারণ করে। সুতরাং কামকে ভয়
। চলতে হবে। আন্তরিক অধ্যবসায়ের ধনুতে বিবেকের তীক্ষ্ণ তীর
গয়ে কাম রিপুকে পরাজিত করতে হবে। সংচিন্তার শিরস্ত্রাণ দিয়ে মাথা
ক রাখ এবং দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কাম রিপুর সঙ্গে যুদ্ধ কর। কাম-চিন্তা
ষের মনকে তখনই অভিভূত করে যখন মানুষ নারীরূপ দেখে মুগ্ধ হয় ও
াক হারায়। উত্তপ্ত আরক্ত লৌহ শলাকা দিয়ে দুই চোখ উপড়ে ফেলা
, তথাপি মনে কাম-চিন্তার প্রশ্রয় দেওয়া বা কোন নারীর প্রতি কামভাবে
ান উচিত নয়। ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রের করাল কবলে বা ঘাতকের তীক্ষ্ণ খড়্গের
পড়া ভাল, তথাপি নারীসঙ্গ করা ও কামচিন্তা জাগান উচিত নয়।
াসক্ত নারী চলতে, দাঁড়াতে, বসতে বা ঘুমাতে স্বীয় সৌন্দর্য্য দেখাতে ব্যগ্র
এমন কি, নারীচিত্র মানবমনকে রূপমোহে মুগ্ধ করে এবং তার চিত্তস্থৈর্য
রে। হে ভিক্ষুবৃন্দ, কাম-দমনে তোমাদিগকে কতদূর সাবধান ও সচেষ্ট
হবে তা ভেবে দেখ। নারীর অশ্রু ও হাসি, বঙ্কিম দেহ, দোদুল্যমান
য়, আলুলায়িত কেশপাশ মানবচিত্তকে শৃঙ্খলিত করে। সুতরাং সর্বদা
সংযত রাখ। সংযমের বাঁধ কখনো ভেঙ্গে ফেলো না।" *

বিশাখা

শ্রাবস্তীতে বিশাখা নামে এক ধনী রমণী বাস করতেন। তাঁর ব পুত্র-পৌত্রাদি ছিল। তিনি বৌদ্ধ সংঘকে পূর্বারাম দান করে এবং বুদ্ধে শিষ্যগণের প্রথম সেবিকা হন। ভদ্রিয়াতে অঙ্গরাজ্যের কোষাধ্যক্ষদ্বয় ছিলে ধনঞ্জয় ও মেণ্ডক। বিশাখা ধনঞ্জয়ের পুত্রী এবং মেণ্ডকের পৌত্রী ছিলেন যখন বুদ্ধ ভদ্রিয়াতে যান তখন বিশাখার বয়স মাত্র সাত বৎসর। এত বয়সেই বিশাখা ভগবান বুদ্ধের সেবার সুযোগ পান। শ্রাবস্তীতে র প্রসেনজিতের কোষাধ্যক্ষ মৃগরের পুত্র পুণ্যবর্দ্ধনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হ বিশাখা ছিলেন বুদ্ধ-ভক্ত। আর মৃগর ছিলেন নির্গ্রন্থ নাথপুত্র জৈনের শি একদিন মৃগর পুত্রবধূ বিশাখাকে উক্ত জিনের কাছে নিয়ে যান। বিশ জিনের নগ্নদেহ দেখে বিরক্ত হন এবং অবজ্ঞায় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে জিন তা দেখে মৃগরের কাছে মন্তব্য করলেন, 'তোমার পুত্র-বধূ সম্ভবতঃ বৌদ্ধ একদিন সেই জিন সশিষ্য মৃগরের বাড়ীতে আসেন। বিশাখা তাঁকে ভি না দিয়ে বললেন, 'কাপড় না পরে আপনি এখানে আর নগ্নভাবে আসবেন না

যখন একথা মৃগরের কাণে গেল তিনি বিশাখাকে তাড়িয়ে দিতে চাইলে বিশাখা বল্‌লেন, "আমি ক্রীতদাসী নই যে,প্রভুদের খেয়ালমত আমি বিতা হব। আপনি আমার .পিতামাতাকে এই খবর পাঠান।" এই খবর পিতা ধনঞ্জয় ছুটে এলেন। কন্যা পিতাকে বল্‌লেন, "আমি বৌদ্ধ। আমার বাড়ীর সকলে জৈন। এই অবস্থায় আমি যদি বৌদ্ধ সাধুদিগকে পরিচর্য্যা ক সুযোগ না পাই, আমি এখানে থাকবো না, আপনার সঙ্গে বাড়ীতে যা মৃগর একথা শুনে বিশাখাকে স্বাধীনতা দিতে রাজী হলেন। বিশাখার শ সবল ও সুপুষ্ট ছিল। বুদ্ধ তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। বুড়ো বয়সে ভিক্ষুণী ও থেরী হয়েছিলেন।

*'বুদ্ধঘোষের গল্প' দ্রষ্টব্য। ইহা টি, রোজার্স কর্ত্তৃক ইংরাজিতে অনূদিত এবং লণ্ডন ১৮৭০ খ্রীঃ প্রকাশিত।

বুদ্ধদেব যখন শ্রাবস্তীতে ছিলেন তখন বিশাখা একদিন তাঁর কাছে গিয়ে কে স্বগৃহে পরদিন ভিক্ষাগ্রহণের প্রার্থনা জানান। বিশাখা তাতে সানন্দে ত হন। সেই রাত্রে এবং পরদিন সকালে ভীষণ বৃষ্টি হল। ভিক্ষুরা স্ব স্ব াষাক খুলে শুকাতে দিলেন এবং নগ্ন গাত্রে বর্ষাতে ভিজতে লাগলেন। দিন বুদ্ধ যখন তাঁর বাড়ীতে আহার শেষ করলেন তখন বিশাখা তাঁর শে বসে তাঁকে বললেন, "ভগবন্, আপনার কাছে আজ আটটী বর চাই।" উত্তর দিলেন, "বিশাখা! তথাগতগণ প্রার্থনীয় বর কি না জেনে তা পূর্ণ রন না।" বিশাখা বললেন, "সে বরগুলি অযথা ও আপত্তিজনক নয়।"

চাওয়ার অনুমতি পেয়ে বিশাখা বললেন, "আমি সারা জীবন ভিক্ষু-সংঘকে াকালে পোষাক, নবাগত ও অন্যত্র যাত্রী ভিক্ষুগণকে আহার, রুগ্নও াষাকারী ভিক্ষুগণকে আহার, রুগ্ন ভিক্ষুদিগকে ঔষধ, সমগ্র সংঘকে পায়সান্ন ং ভিক্ষুণীদিগকে স্নান-বস্ত্র দিতে ইচ্ছা করি।"

বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, "বিশাখা, কি কারণে তুমি এই বরগুলি চাও?" াখা নম্রভাবে উত্তর দিলেন, "ভগবন্, আমার পরিচারিকাকে আদেশ াছিলাম, তুমি গিয়ে ভিক্ষু-সংঘকে নিবেদন কর যে, আহার প্রস্তুত। সে ারে গিয়ে কিছু না বলে ফিরে এল এবং বলল, "ভিক্ষুরা নগ্ন দেহে বৃষ্টিতে াছেন।" তাঁদের নগ্ন দেখে সে ভেবেছিল, তাঁরা ভিক্ষু নয়, নগ্ন জৈন সাধু। মি তাকে দ্বিতীয় বার বিহারে পাঠালাম। ভগবন্, নগ্নতা অনৈতিক ও দ্বিকর। এই জন্যই ভিক্ষু-সংঘকে বিশেষতঃ বর্ষা ঋতুতে আমি পৃথক্ াক সরবরাহের সৌভাগ্য ভিক্ষা করেছিলাম। আমার দ্বিতীয় বর প্রার্থনার ণ এই যে, নবাগত ভিক্ষুগণ স্থানীয় পথাদি ও ভিক্ষার স্থান না জানায় াটনে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। সেই জন্য আমি সারা জীবন নবাগত ভিক্ষুগণকে ার দিতে চেয়েছিলাম। তৃতীয়তঃ, ভগবন্! অন্যত্র গমনেচ্ছু ভিক্ষু াটনে বেরিয়ে পেছনে পড়ে থাকবেন, বা গন্তব্য স্থলে দেরী করে পৌছবেন ভিক্ষা না পেলে ক্ষুধার্ত্ত হয়েই পথে চলবেন। চতুর্থতঃ, ভগবন্! রুগ্ন ভিক্ষু পথ্য না পান, তাঁর অসুখ বাড়তে পারে এবং তিনি মারা যেতেও পারেন।

পঞ্চমতঃ, যে ভিক্ষু রুগ্ন ভিক্ষুর সেবায় ব্রতী হন তিনি ভিক্ষাটনের সুযো পান না। আর যদি তিনি যথাসময়ে ভিক্ষার্থ বাহির হন তাহলে রোগীসে ব্যাহত হবে। ষষ্ঠতঃ, ভগবন্, যদি রুগ্ন ভিক্ষু আবশ্যকীয় ঔষধ ও পথ্য না প তাঁর রোগ বৃদ্ধি পাবে এবং তজ্জন্য তাঁর জীবন বিপন্ন হবে। সপ্তমতঃ, ভগবন্, আমি শুনেছি, তথাগত পায়সান্নের প্রশংসা করেন। কারণ, এ সহজপাচ্য সুস্বাদু খাদ্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বাড়ায় এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর করে ইহা স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্যরূপে এবং রোগীর পক্ষে পথ্যরূ উপাদেয়। সেই জন্য আমি সংঘকে সারা জীবন পায়সান্ন সরবরাহ করা চাই। শেষতঃ ভিক্ষুণীরা অচিরাবতী নদীতে পতিতাদের সহিত একই ঘা নগ্ন দেহে স্নান করেন। পতিতারা ভিক্ষুণীদিগকে উপহাস করে বলে, 'ভগিনী তারুণ্যে সতীত্ব রক্ষায় কি লাভ? যখন বুড়ো হবে তখন সতীত্ব রক্ষ চেষ্টিতা হবে। তাহলে উভয় দিকের ফল পাবে।' ভগবন্, নারীর পে নগ্নতা অপমানজনক ও অনিষ্টকর।"

তথাগত জিজ্ঞাসা করলেন, বিশাখা, এই আটটি বর পূর্ণ করলে তোমা কি লাভ হবে? বিশাখা উত্তর দিলেন, "ভিক্ষুরা নানা স্থানে বর্ষাবা করে শ্রাবস্তীতে আসবেন বুদ্ধদর্শনে। তখন তাঁরা তথাগতকে মৃত ভিক্ষুদে গতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করবেন এবং তথাগত তাঁদিগকে বলবেন, "কে নির্বা লাভ করেছেন? কে অর্হত্ব পেয়েছেন?" সেই সব ধর্মপ্রসঙ্গ শুনে আমা আনন্দের সীমা থাকবে না, আমার অন্তর আনন্দে নেচে উঠবে। আমি পরম শান্তি ও চরম তৃপ্তি লাভ করব। তাতেই আমার ধর্মজীবনের অ উৎকর্ষ হবে মনে হয়।" তথাগত এই কথা শুনে বললেন, "অতি উত্ত বিশাখা, অতি উত্তম। তুমি যে দৃষ্টিভঙ্গীতে এই বরাষ্টক চেয়েছ তা প্রশংসনী সৎপাত্রে দান উর্বর ভূমিতে বীজবপন তুল্য ফলপ্রদ। যারা অসংযত অজিতেন্দ্রিয় তাহাদিগকে দান বন্ধ্যা জমিতে বীজবপনের ন্যায় নিষ্ফ গ্রহীতার পাপ দাতার সুফলপ্রাপ্তি ব্যাহত করে।" বিশাখাকে ধন্য জ্ঞাপনান্তে তথাগত বললেন, "আমার যে শিষ্য অকপট চিত্তে পরমানন্দে

হস্তে দান করে তার দান স্বর্গপ্রাপ্তিকর, দুঃখনাশক ও শান্তিপ্রদ। সে শান্তিময় জীবন লাভ করে এবং অশুদ্ধি ও কলুষ থেকে মুক্ত হয়। যে সৎচিন্তায় ও সৎকাজে আনন্দিত হয় সে-ই ধর্মজীবনে উন্নতি লাভ করে।"

মগধরাজ বিম্বিসার ধর্মজীবন যাপনার্থ সংসার থেকে অবসর নিলেন। তিনি মন্তব্য করলেন, রাজগৃহে অনেক বৈদিক ধর্ম সম্প্রদায় আছে। তথায় কোন কোন দিন ধর্মানুষ্ঠান হয়ে থাকে এবং বহু নরনারী ধর্মপ্রসঙ্গ শুনতে তথায় যান। জাগতিক কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ এবং ধর্মসাধনের জন্য কয়েকটা দিন নির্দিষ্ট রাখার প্রয়োজন অনুভব করে বিম্বিসার বুদ্ধের কাছে গেলেন এবং বললেন, "তীর্থিক সম্প্রদায়ের পরিব্রাজকগণ বহু শিষ্য ও শ্রোতা পেয়ে থাকেন। কারণ তাঁরা প্রত্যেক পক্ষের অষ্টম ও চতুর্দশ বা পঞ্চদশ দিবস ধর্মোৎসবের জন্য নির্দিষ্ট রেখেছেন। আপনার ভিক্ষুসংঘের পক্ষে উক্ত উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দিনে সমবেত হওয়া সম্ভব কি?"

তথাগত ভিক্ষুবৃন্দকে আদেশ দিলেন, "তোমরা প্রত্যেক অর্ধমাসের অষ্টম এবং চতুর্দশ বা পঞ্চদশ দিবসে মিলিত ভাবে ধর্মানুষ্ঠান কর।" ইহাকে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের উপবসথ বলে। ভিক্ষুগণ তথাগতের নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে বিহারে সমবেত হলেন। নিকট ও সুদূর স্থান থেকে ভক্তগণ বিহারে এলেন ধর্মালোচনা শুনতে। কিন্তু সকলে হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন। কারণ সভায় ভিক্ষুরা নীরব রইলেন এবং কোন ধর্মপ্রসঙ্গ করলেন না। তথাগত তা শুনে ভিক্ষুগণকে আদেশ দিলেন প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করতে। তদনুযায়ী ভিক্ষুগণ সংঘের মার্জনা লাভার্থ স্ব স্ব বিচ্যুতি বা অনুচিত আচরণ স্বীকার করতেন। কারণ, বুদ্ধমতে দোষ-স্বীকার দ্বারা দোষস্খালন সহজ। দোষ স্বীকৃত হলে লঘু ও নষ্ট হয়ে যায়। নিম্নোক্ত প্রাতিমোক্ষ বিধান বুদ্ধ-দত্ত।—"সুযোগ্য শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু সংঘের নিকট এই ঘোষণা করুক, 'সংঘ আমার কথা শুনুন। আজ উপবসথ দিবস। আজ অর্ধমাসের অষ্টম বা চতুর্দশ বা পঞ্চদশ দিবস। যদি সংঘ প্রস্তুত থাকেন তবে উপবসথ অনুষ্ঠান এবং প্রাতিমোক্ষ আরম্ভ হোক।' ভিক্ষুরা উত্তর দিবেন, 'আমরা সকলে বেশ শুনতে পাচ্ছি এবং কথিত

বিষয়ে মনোযোগ দিচ্ছি।' তখন সর্বাগ্রণী ভিক্ষু বলতে থাকবেন, 'যিনি কোন দোষ করেছেন তিনি তা স্বীকার করুন। যিনি নির্দোষ তিনি নীরব থাকবেন। যাঁকে নীরব দেখব তাঁকে নির্দোষ মনে করব। যেমন কোন একক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলে সে উত্তর দেয় তেমনি কোন সম্মিলনীর কাছে তিন বার ঘোষণা করলে উত্তর আশা করা যায়। যে ভিক্ষু তিন বার ঘোষণা শুনে স্বকৃত দোষ মনে রেখেও প্রকাশ করেন না তিনি মিথ্যা কথনের দোষী হন। কিন্তু মিথ্যা কথন ধর্মপথে দুলঙ্ঘ্য ব্যাঘাত। যিনি দোষমুক্ত হতে চান তিনি দোষ স্বীকার না করে থাকতে পারবেন না। দোষ স্বীকার দ্বারাই বোঝা যায়, দোষী নির্দোষ হতে চান।"

সংঘ দুই দলে বিভক্ত

বুদ্ধ যখন কৌশাম্বীতে অবস্থান করছিলেন তখন কোন ভিক্ষু কোন অন্যায় আচরণে অভিযুক্ত হন। তিনি দোষ স্বীকারে অসম্মত হওয়ায় সংঘ তাঁকে বহিষ্কৃতি-দণ্ডে দণ্ডিত করেন। কিন্তু ভিক্ষুটি ছিলেন সুপণ্ডিত। তিনি ধর্মতত্ত্বে ব্যুৎপন্ন, সংঘবিধিসমূহে সুবিজ্ঞ প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, বিনয়ী বিবেকী ও নীতিনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি মিত্র ভিক্ষুদের কাছে গিযে বললেন, "হে বন্ধুগণ, এই সামান্য অপরাধে আমি বহিষ্কৃতি-দণ্ড পেতে পারি না। আমি অপরাধী নই। সুতরাং এই দণ্ডাজ্ঞা অবৈধ ও অগ্রাহ্য। অতএব আমি নিজেকে এখনো সংঘভুক্ত বলে মনে করি। আমার বন্ধুগণ আমার অধিকার রক্ষায় সহায়ক হোন।" বহিষ্কৃত ভিক্ষুর পক্ষসমর্থনকারিগণ দণ্ডদাতাদের নিকট গিয়ে বললেন, "এতো গুরু দোষ নয়।" দণ্ডদাতাগণ উচ্চ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়ই এটা গুরু দোষ।' এইরূপে উভয় দলের মধ্যে বচসা ও বিবাদ সুরু হল এবং সংঘ দুই দলে বিভক্ত হল এবং একদল অন্যদলের নিন্দাবাদে রত হল। উক্ত ঘটনা বুদ্ধদেবের শ্রুতিগোচর হওয়া মাত্র তিনি যথাস্থানে গেলেন এবং বহিষ্কৃতি দণ্ডাজ্ঞাদাতা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করে বললেন, "তোমরা কোন ভিক্ষুকে সংঘত্যাগের আদেশ দিতে পার না, তার দোষ যাহাই হউক না কেন।

ভিক্ষু ধর্ম-রহস্য ও সংঘ-বিধি উত্তমরূপে অবগত, পণ্ডিত, প্রজ্ঞ, বুদ্ধিমান, বিনম্র, বিবেকী ও সমুচিত দণ্ডগ্রহণে প্রস্তুত তার বিরুদ্ধে যারা সংঘত্যাগের আদেশ দেয় তারা সংঘ-ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী। উক্ত ভিক্ষু নিজ দোষ দেখতে চায় না বলে তাকে তোমরা সংঘ-চ্যুত করতে পার না।"

আবার যে ভিক্ষুগণ সংঘ-চ্যুত ভিক্ষুর পক্ষ সমর্থন করেছিলেন তাঁদের কাছে গিয়ে তথাগত বললেন, "তোমরা যদি সত্যই দোষী হও তবে তার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। শুধু 'আমি দোষী নই' বললে প্রায়শ্চিত্ত হয় না। দোষী স্বদোষ দেখতে না পেলেও সংঘ যদি তাকে দোষী মনে করেন তাহলে তার ভাবা উচিত, এই সব প্রবীণ পণ্ডিত ভিক্ষুরা স্বার্থ, দ্বেষ, ভয় বা ভ্রান্তির বশীভূত হয়ে কাজ করবেন, এটা অসম্ভব। সে যেন সংঘে মতভেদ সৃষ্টি না করে। সংঘ-ভ্রাতাদের নির্দেশ মাথা পেতে নেওয়া ও দোষ স্বীকার করা তার উচিত।"

উভয় দল উপবসথ দিবস ও সংঘ-কর্মাদি স্বতন্ত্র ভাবে করতে লাগলেন। যখন বুদ্ধ উভয় পক্ষের কার্য্যধারা জানতে পেলেন তখন তিনি আদেশ দিলেন "উভয় দলের কার্য্য অবৈধ, আপত্তিজনক ও অন্যায্য নয়। উভয় দলে প্রবীণ ভিক্ষুগণ আছে। যখন তারা একমত হচ্ছে না তখন তাদের পক্ষে উপবসথাদি স্বতন্ত্র ভাবে করাই উচিত।" তথাগত বিবদমান ভিক্ষুবৃন্দকে লক্ষ্য করে বললেন, "ইতর লোকেরাই ঝগড়া করে থাকে। সংঘে যখন মতভেদ সৃষ্ট হয় তখন কাকেই বা দোষী করা যায়? যে ভাবে, অমুক আমাকে নির্য্যাতন করেছে, অমুক আমার প্রতি অন্যায় করেছে, অমুক আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে, তার বৈর ভাব কখনও প্রশমিত হয় না। অবৈর ভাব দ্বারাই বৈরভাব প্রশমিত হয়। বৈরভাব দ্বারা কখনো বৈরভাব দূরীভূত হয় না। ইহাই সনাতন ধর্মনীতি। যারা আত্মসংযমের প্রয়োজন বোধ করে না তারা যদি কলহপ্রিয় হয় তাদের ব্যবহার উপেক্ষা করা যায়। কিন্তু যারা বিবেকী ও ত্যাগী তাদের শেখা উচিত, কিরূপে সংঘ-জীবনে মৈত্রীবদ্ধ হতে হয়। ধর্মভাবে জীবন যাপনকারী জ্ঞানী ও চরিত্রবান্ বন্ধুর সাহচর্য্য পেলে মানুষ সুখী, বিবেকী ও বিপন্মুক্ত হতে পারে। কিন্তু সেরূপ জ্ঞানী মিত্র না পেলে জীবন-পথে সেই

রাজার মত চলা উচিত, যে রাজা রাজ্য ও রাজ্যের দুশ্চিন্তা ফেলে দিয়ে বনবাসী হয় এবং বনে একক হস্তীর মত বাস করে। নির্বোধের সাহচর্য্য কাম্য নহে। স্বার্থপর, একগুঁয়ে, কলহপ্রিয় ও অহঙ্কারী লোকের সঙ্গে বাস করা অপেক্ষা একা থাকাই শ্রেয়স্কর।”

তথাগত মনে মনে ভাবলেন, এই সব উগ্রচিত্ত হতবুদ্ধি ভিক্ষুদিগকে বোঝান খুবই শক্ত। তিনি আসন ত্যাগ করে স্বস্থানে চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অচিরে সংঘে ঐক্য ও সাম্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হল।

উভয় দলের মধ্যে বিবাদ মিটে না যাওয়ায় তথাগত কৌশাম্বী ছেড়ে নানা স্থানে ভ্রমণ করতে করতে অবশেষে শ্রাবস্তীতে এলেন। তথাগতের অনুপস্থিতিতে উক্ত বিবাদ আরও বেড়ে গেল। কৌশাম্বীর গৃহী ভক্তরা বিরক্ত হয়ে বলতে লাগলেন, “এই কলহপ্রিয় ভিক্ষুরা উপদ্রব করছে, এতে আমাদের অনিষ্ট হবে। এদের বিবাদে উত্যক্ত হয়ে তথাগত চলে গেলেন এবং অন্য স্থানে বাস মনোনীত করলেন। সুতরাং আমরা এই ভিক্ষুদিগকে অভিবাদন ব ভিক্ষ দান করব না। তারা গেরুয়া পরিধানের যোগ্য নয়। তারা তথাগতকে শান্ত করুক বা সংসারে ফিরে যাক।” কৌশাম্বীর ভিক্ষুগণ গৃহী ভক্তগণ দ্বার সম্মানিত ও প্রতিপালিত না হয়ে বিপদে পড়লেন, এবং বললেন, “আমরা তথাগতের কাছে গিয়ে আমাদের বিবাদ মিটিয়ে দিতে তাঁকে অনুরোধ করি।”

উভয় দল শ্রাবস্তীতে তথাগত-সমীপে গেলেন। শারিপুত্র তাঁদের আগমন সংবাদ পেয়ে তথাগতকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কৌশাম্বীর বিবাদপ্রিয় ভিক্ষুর শ্রাবস্তীতে এসেছে। ভগবন্! আমি তাঁদের সঙ্গে কিরূপে ব্যবহার করব।” তথাগত শারিপুত্রকে বললেন, তাহাদিগকে তিরস্কার কোরো না। কারণ কড় কথা কারও প্রিয় হয় না। উভয় দলকে পৃথক্ স্থানে থাকতে দাও এবং প্রত্যেক দলের সঙ্গে নিরপেক্ষ ব্যবহার কর। ধীরভাবে উভয়পক্ষের বক্তব্য শোন। উভয় পক্ষের বক্তব্য যিনি সমানভাবে বিচার করেন তিনিই মুনি। উভয় দল যখন তাদের বক্তব্য শেষ করবে তখন সংঘ বিচারান্তে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করুক।”

সংঘ-জননী প্রজাপতি তথাগতের পরামর্শ চাইলেন। তথাগত তাঁকে লেন, "গৃহী শিষ্যদের দান উভয় পক্ষ সমানভাবে উপভোগ করুক। পোষাক আহার যার যা প্রয়োজন সে যেন তা পায়। কারুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব ারো না।" উপালি তথাগতকে সংঘে পুনরায় ঐক্যপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা লেন, "ভগবন্! অতিরিক্ত বিবাদ এড়াবার জন্য সংঘ যদি কোন দলের ক্তব্য না শুনে শান্তি স্থাপন ঘোষণা করে, তা ঠিক হবে কি?" তথাগত ত্তর দিলেন, "বিবদমান পক্ষদ্বয়ের বক্তব্য না শুনে ঐক্য ঘোষণা যথার্থ বৈধ হবে না। দুই রকমে পুনরায় শান্তি স্থাপন হতে পারে—একটি পায় মৌখিক মৈত্রী এবং অন্য উপায় মৌখিক ও আন্তরিক প্রীতি। যদি ভয় পক্ষের বক্তব্য না শুনে ঐক্য ঘোষিত হয়, সে ঐক্য মৌখিক মাত্র। ন্তু যদি সংঘ উভয় দলের বক্তব্য বিচার করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত য় সেই সিদ্ধান্তে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই শান্তই মৌখিক ও আন্তরিক, তএব চিরস্থায়ী। যে শান্তি মৌখিক ও আন্তরিক একমাত্র তাহাই সত্য ও বধ।" তথাগত ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করে রাজপুত্র দীর্ঘায়ুর এই গল্পটি ললেন।

পুরাকালে কাশীধামে ব্রহ্মদত্ত নামে এক বিক্রান্ত রাজা বাস করতেন। তিনি াশলরাজ দীর্ঘেতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কারণ তিনি ভাবলেন, াশলরাজ্য ক্ষুদ্র এবং দীর্ঘেতি আমার সৈন্যবলকে প্রতিরোধ করতে পারবে দীর্ঘেতি কাশীরাজের সৈন্যদলকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব দেখে রাজ্য ড়ে পালালেন এবং নানা স্থান ভ্রমণ করে কাশীতে এলেন এবং সহরের হিরে তাঁর রাণীর সহিত এক কুমারের কুটিরে আশ্রয় নিলেন। ইতোমধ্যে শলরাজ্য ব্রহ্মদত্তের হস্তগত হল। কুমারের কুটিরে বাস করবার সময় র্ঘেতির রাণী একটি সন্তানের জননী হলেন। তাঁরা সেই সন্তানের নাম খলেন দীর্ঘায়ু। যখন দীর্ঘায়ু বড় হল রাজা ভাবলেন, "ব্রহ্মদত্ত আমাদের নাশ করেছে। তাই এখন সে আমাদের প্রতিশোধের ভয়ে ভীত। যদি আমাদের তিন জনকে হাতে পায় নিশ্চয়ই বধ করবে।" এই ভেবে তিনি

তাঁর পুত্রকে অন্য স্থানে পাঠিয়ে দিলেন এবং দীর্ঘায়ু পিতার কাছে সুশিক্ষা পে
নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। তখন রাজা দীর্ঘেতির নাপিত কাশী
বাস করত। সে তার পূর্ব প্রভুকে দেখতে পেল এবং ধনলোভে তা
ব্রহ্মদত্তের কাছে ধরিয়ে দিল। কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত যখন শুনলেন যে, পলাত
কোশলরাজ রাণীর সহিত ছদ্মবেশে কোন কুমারের কুটীরে বাস করছেন তি
তাদিগকে বেঁধে আনতে ও বধ করতে আদেশ দিলেন। যে জল্লাদ উভয়কে ব
করতে আদিষ্ট হয়েছিল সে রাজা ও রাণীকে বধ্য ভূমিতে নিয়ে গেল।

বন্দী রাজা যখন কাশীর রাস্তা দিয়ে বধ্যভূমিতে যাচ্ছিলেন তখন তৎপু
দীর্ঘায়ুকে হঠাৎ রাস্তায় দেখতে পেলেন। বুদ্ধিমান দীর্ঘেতি অতি সাবধা
পুত্রের পরিচয় গোপন রেখে ব্যগ্রভাবে পুত্রকে শেষ পরামর্শ দিলেন, "বা
দীর্ঘায়ু, খুব দূরে বা খুব নিকটে দৃষ্টিপাত কোরো না। কারণ হিংসা দ্বা
হিংসার নিবৃত্তি হয় না, প্রীতির দ্বারাই হিংসা বিনষ্ট হয়।" কোশলের রা
ও রাণী একত্রে নিহত হলেন। তাঁদের একমাত্র পুত্র দীর্ঘায়ু উগ্র মদ বি
এনে রক্ষীদিগকে খুব করে খাওয়ালেন। রাত্রি সমাগত হলে তিনি পিতামা
মৃতদেহ নিয়ে চিতায় চড়ালেন এবং যথাবিধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করলে
রাজা ব্রহ্মদত্ত এই সংবাদ পেয়ে ভীত হলেন ও ভাবলেন, রাজা দীর্ঘে
পুত্র দীর্ঘায়ু তার পিতৃমাতৃহন্তার প্রতি নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নেবে এবং সু
পেলেই আমাকে বধ করবে। তরুণ দীর্ঘায়ু বনে গিয়ে পিতামাতার
প্রাণভরে কাঁদলেন। তারপর তিনি চোখের জল মুছে কাশীতে ফিরে এলে
রাজকীয় হস্তীশালায় সহকারী আবশ্যক শুনে তিনি উক্ত পদের জন্য আবে
করলেন এবং প্রধান সহকারী কর্তৃক উক্ত পদে নিযুক্ত হলেন।

রাজা ব্রহ্মদত্ত শুনলেন, একজন সুমিষ্ট স্বরে সারারাত্রি বাঁশী বাজিয়ে গ
করছে। সেই সুমিষ্ট স্বর শুনে তাঁর চিত্ত উৎফুল্ল হল। সন্ধান নিয়ে তি
জানতে পারলেন, উক্ত গায়ক হস্তীশালার অন্যতম সহকারী এবং গায়কটি তর
নানা গুণে অলঙ্কৃত এবং সহকর্মীগণ কর্তৃক সমাদৃত। রাজার আদেশে দী
তৎসমীপে আনীত হলেন এবং রাজা তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিযুক্ত করলে

্বক বিচারপূর্বক কাজ করেন, নম্রভাবে ব্যবহার করেন এবং কর্তব্যপালনে তৎপর থাকেন দেখে রাজা তাঁকে একটী উচ্চ পদ দিলেন। একদা রাজা পশু শীকারে গিয়ে অনুচরবৃন্দ থেকে দূরে পড়ে গেলেন। একমাত্র তরুণ দীর্ঘায়ু তাঁর সঙ্গে ছিলেন। রাজা সুদীর্ঘ শীকারে পরিশ্রান্ত হয়ে দীর্ঘায়ুর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন দীর্ঘায়ু ভাবলেন, 'এই রাজা ব্রহ্মদত্ত আমাদের সর্বনাশ করেছে। সে আমাদের রাজ্য অপহরণ এবং পিতামাতাকে বধ করেছে। সে এখন আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।" এই ভেবে তিনি স্বীয় অসি কোষমুক্ত করলেন। তারপর পিতার শেষ কথাগুলি তাঁর মনে পড়ল এবং তা পালন করতে ইচ্ছা হল। তখন তিনি অসি কোষবদ্ধ করলেন। রাজা নিদ্রায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তিনি যখন জেগে উঠলেন, তখন যুবক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাজন্! আপনাকে এত ভীত দেখাচ্ছে কেন?' রাজা উত্তর দিলেন, 'আমার ঘুম সব সময়ই অস্থির। কারণ আমি ঘুমোলেই স্বপ্ন দেখি, যুবক দীর্ঘায়ু আমাকে অসি নিয়ে আক্রমণ করছে। আমি যখন তোমার কোলে মাথা রেখে নিদ্রিত ছিলাম, তখন আবার সেই স্বপ্ন দেখলাম। তখন আমি ভয়ে ও আতঙ্কে জেগে উঠলাম।' অনন্তর যুবক নিরস্ত্র রাজার মাথার উপর বাম হাত রেখে এবং ডান হাতে অসি কোষমুক্ত করে বললেন, "আমি রাজা দীর্ঘেতির পুত্র দীর্ঘায়ু। আপনি আমার পিতার রাজ্য অপহরণ এবং আমার মাতা-পিতাকে বধ করেছেন। প্রতিশোধের সময় সমুপস্থিত।" রাজা নিজেকে তরুণ দীর্ঘায়ুর করায়ত্ত দেখে দুই হাত তুলে কাতর কণ্ঠে মিনতি জানালেন, "প্রিয় দীর্ঘায়ু, আমার প্রাণ রক্ষা কর। প্রিয় দীর্ঘায়ু, আমার প্রাণ রক্ষা কর।"

তিক্ততা বা অপ্রীতি ব্যতীত দীর্ঘায়ু বললেন, 'রাজন্! আমি কিরূপে আপনার জীবন রক্ষা করতে পারি? আমার জীবন তো আপনার দ্বারা বিপন্ন। আপনিই আমার প্রাণ রক্ষা করতে পারেন?' তখন রাজা বললেন, "প্রিয় দীর্ঘায়ু, বেশ কথা। তুমি আমার প্রাণ রক্ষা কর। আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করব।" এইরূপে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত ও তরুণ দীর্ঘায়ু পরস্পরের জীবন

রক্ষা করতে প্রতিশ্রুত হলেন এবং পরস্পরের অনিষ্ট না করতে শপথ করলেন ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার পিতা অন্তিম সময়ে তোমাকে উক্তরূপ উপদেশ দিয়েছিলেন কেন? সেই উপদেশের গূঢ়ার্থই বা কি?' দীর্ঘায়ু উত্তর দিলেন, 'দূরে দৃষ্টিপাত না করার অর্থ এই যে, হিংসা যেন দীর্ঘস্থায়ী না হয় এবং অতি নিকটে দৃষ্টিপাতের অর্থ, বন্ধুবিচ্ছেদে ব্যস্ত হয়ো না।' তাঁর অবশিষ্ট উপদেশের ভাবার্থ এই—আপনি আমার পিতামাতাকে নিহত করেছেন। আর আমি যদি আপনার প্রাণ-নাশ করি তাহলে আপনার আত্মীয়-স্বজনরাও আমার জীবন-নাশ করবে। এইরূপে হিংসার আগুন জ্বলতে থাকবে, আর নিভবে না। অহিংসার অমৃতবারি সিঞ্চন না করলে হিংসানল নির্বাপিত হয় ন এখন আমরা পরস্পরকে ক্ষমা করেছি সুতরাং হিংসার অবসান হল।"

অনন্তর রাজা ব্রহ্মদত্ত ভাবলেন, 'তরুণ দীর্ঘায়ু কি বুদ্ধিমান্। তার পিতাকে যা সূত্রাকারে বলেছিলেন তার বিশদার্থ সে বুঝতে পারল।' ব্রহ্মদ দীর্ঘায়ুকে তার পিতৃরাজ্য ফিরিয়ে দিলেন এবং স্বীয় কন্যার সহিত তাে পরিণীত করলেন। এই গল্পটি বলেই তথাগত মন্তব্য করলেন, "ভিক্ষুগ তোমরাই আমার ধর্মের উত্তরাধিকারী, তোমরাই তথাগতের বংশধর। পিতার উপদেশ লঙ্ঘন করা পুত্রের অনুচিত। সুতরাং তোমরা আমার সতর্কবাণী মেনে চল।" তখন ভিক্ষুগণ সভা করে সংঘে মৈত্রী স্থাপনে বদ্ধ-পরিকর হলেন। সংঘে পুনরায় পূর্ব ঐক্য স্থাপিত হল।

একদিন এইরূপ ঘটল যে, তথাগত খালি পায়ে খোলা বাতাসে পাদচারণ করছিলেন। তথাগতকে অনাবৃত পদে বেড়াতে দেখে প্রবীণ ভিক্ষুরা তাঁর অনুকরণ করলেন। কিন্তু নবীন ভিক্ষুরা প্রবীণদের দৃষ্টান্ত অগ্রাহ্য করলেন এবং আবৃত পদেই রইলেন। কয়েকজন প্রবীণ ভিক্ষু নবীনদের এই অশ্রদ্ধ আচরণ তথাগতের কর্ণগোচর করলেন। তথাগত সব কথা শুনে নবীন ভিক্ষুদিগকে তিরস্কার করে বললেন, "আমি জীবিত থাকতে থাকতে যদি ভিক্ষুরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন না করে তাহলে আমি চলে গেলে তারা কি করবে?

াগত সংঘের ভবিষ্যৎ কল্যাণ সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি ভিক্ষু-
গকে উপদেশ দিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, এমন কি, যে শিষ্যরা সংসারে থাকে এবং
য়-ক্লেশে জীবিকা অর্জন করে তারাও তাদের গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন,
বাপরায়ণ ও অনুগত হয়। তোমরা সংসার ছেড়ে ধর্মসাধনায় সমগ্র জীবন
সর্গ করেছ। তোমরা তোমাদের গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সেবাপরায়ণ
অনুগত হবে। যদি তোমরা সেরূপ না কর তাহলে এই ধর্ম সাধারণ লোকে
ার গ্রহণ করবে না। তারা আমার ধর্ম ও সংঘের প্রতি শ্রদ্ধা হারাবে।"

বুদ্ধ যখন মল্লনগর অনুপিয়াতে ছিলেন তখন মহানাম, অনুরুদ্ধ, আনন্দ,
বদত্ত, ভদ্দিয় এবং কিম্বিল ও রাজনাপিত উপালি তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হন।
ানাম ও অনুরুদ্ধ দুই ভাই ছিলেন। তন্মধ্যে মহানাম ভাবলেন, 'আমাদের
শ থেকে কেউই সংঘে যোগ দেয় নি। সুতরাং আমি ও অনুরুদ্ধ সংঘভুক্ত
ল ভাল হয়।' তিনি অনুরুদ্ধের কাছে গিয়ে বললেন, 'তুমি সংঘে যোগ
ও, না হয় আমি দিই।' অনুরুদ্ধ বললেন, 'আমি রোগা লোক। আমার
ক্ষ গৃহহীন সন্ন্যাসীর জীবন আদৌ উপযোগী নয়। তুমিই সন্ন্যাসী হও।'
থন মহানাম প্রিয় ভাই অনুরুদ্ধকে এইভাবে বুঝাতে লাগলেন, "গৃহীর জীবনে
ত ভাবনা চিন্তা থাকে তা স্মরণ কর। প্রথমে তোমাকে ক্ষেত্রকর্ষণ করতে
বে। তৎপরে বীজবপন ও জলসেচন। বীজ অঙ্কুরিত হবার পূর্বেই ক্ষেত্র থেকে
াগাছা তুলে ফেলতে হবে। পরে ফসল পাকলে কাটতে ও ঘরে নিয়ে যেতে
ব। তারপর শস্য সংগ্রহ ও তৃণ পৃথক্ করা ও শস্যকে মরাইতে রাখা।
ইরূপে বৎসরের পর বৎসর করতে হয় জীবন ধারণের জন্য। যেমন কৃষিকর্মের
ষ নেই তেমনি আমাদের জীবন-শ্রমেরও অন্ত নেই। যতক্ষণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের
খভোগ আমাদের কাম্য হবে ততক্ষণ আমরা শান্তি পাব না।" মহানামের
থা শুনে অনুরুদ্ধের মনে বৈরাগ্য এল। অনুরুদ্ধ ছিলেন শুদ্ধোদনের ভ্রাতা
মৃতোদনের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি স্বীয় জননীর কাছে গিয়ে বললেন, 'মা,
মি গৃহত্যাগ করে ভিক্ষু হতে চাই। আমাকে সংসারত্যাগের অনুমতি
াও।' পুত্রের কথা শুনে মাতা বললেন, "প্রাণাধিক অনুরুদ্ধ! তোমরা দুটি

পুত্র আমার প্রাণতুল্য, প্রিয়তম, নিকটতম। মৃত্যুতে নিশ্চয়ই আমি তোমা থেকে আলাদা হয়ে যাব, কিন্তু তাও অনিচ্ছা-সত্বে। কিন্তু জীবিত থাক থাকতে কিরূপে বাবা! আমি তোমাদের ছেড়ে থাকব।"

তখন ভদ্দিয় (ভদ্রক) নামে এক শাক্যরাজ অনুরুদ্ধের বন্ধু ছিলে মাতা ভাবলেন, ভদ্দিয় সংসার ছাড়তে পারবে না। তাই তিনি ত ছেলেকে বললেন, বাবা অনুরুদ্ধ! যদি তোমার বন্ধু ভদ্দিয় সংসার ত্য করতে পারে তাহলে তুমিও শ্রমণ হতে পারবে। অনুরুদ্ধ ভদ্দিয়র কা গিয়ে বললেন, "বন্ধুবর! আমার সংসারত্যাগ তোমার দ্বারা বাধিত হচ্ছে তুমি আমার সেই বাধা অচিরে দূর কর। আমি এমন কি তোমার সঙ্গে সংসারত্যাগ করব। এস, আমরা দুজনে এই শুভকর্ম শীঘ্র করি।" ভ বললেন, 'বন্ধুবর! সাত বৎসর পরে আমরা একত্রে সংসার ত্যাগ করব

অনুরুদ্ধ—সাত বৎসর অতি দীর্ঘ কাল।

ভদ্দিয়—তাহলে ছয় বৎসর। অনুরুদ্ধ—এও অতি দীর্ঘকাল।

ভদ্দিয়—তাহলে দুই বৎসর। অনুরুদ্ধ—তাও কম দীর্ঘ নয়। ভদ্দিয়-তবে একবৎসর। অনুরুদ্ধ—তাও আমার কাছে দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছে ভদ্দিয়—তবে সাত মাস। অনুরুদ্ধ—তুমি আরও নেমে এস না কেন ভদ্দিয়—তাহলে একমাস। অনুরুদ্ধ—তুমি কি আর নেমে আসতে পারছ না তখন ভদ্দিয় বললেন, 'তবে বন্ধু আর সাত দিন অপেক্ষা কর। আ আমার রাজ্যভার আমার পুত্র ও ভ্রাতৃবৃন্দের উপর অর্পণ করি। ত অনুরুদ্ধ বললেন, 'বেশ তাহলে আমি অপেক্ষা করব।'

উপালি

এইরূপে ভদ্দিয়, আনন্দ, মহানাম, অনিরুদ্ধ, কিম্বিল ও দেবদত্ত এই জন যেমন পূর্বে প্রমোদ-উদ্যানে যেতেন তেমনি ঘর থেকে বেরিয়ে বুদ্ধে কাছে গেলেন। রাজনাপিত উপালি তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কিছু যাবার পর তাঁরা তাঁদের রাজপোষাকাদি একটী পুঁটলিতে বেঁধে উপালি

:য় বললেন, "প্রিয় উপালি, তুমি বাড়ীতে ফিরে যাও এই পুঁটুলি :য়। এতে যা বহুমূল্য দ্রব্য আছে তার দ্বারা তোমার সারা জীবন চলে ব।" উপালি পুঁটলি নিয়ে ফিরে যেতে যেতে ভাবলেন, "এই শাক্যরা খুব র্ঘ ও ভীষণ। তাঁরা ভাববেন, এই ছয় জনের সর্বনাশ আমিই করেছি ং তারা আমাকে বধ করবে। এঁরা যদি ভিক্ষু হতে পারেন তবে আমি ন পারব না?" তিনি পুঁটুলিটী একটী গাছে ঝুলিয়ে উপরোক্ত ছয় জনের ছে ফিরে গেলেন। শাক্যরা তাঁকে ফিরে আসতে দেখে বললেন, "প্রিয় ালি, তুমি কেন ফিরে এলে? উপালি তখন নিজ মনের কথা তাঁহাদিগকে ল বললেন এবং তা শুনে তাঁরা সন্তুষ্ট হলেন। এই সাতজন বুদ্ধের কাছে য়ে উপস্থিত হলেন। শাক্যরা বুদ্ধকে নিবেদন করলেন, "আমরা শাক্যরা, হঠকারী। উপালি দীর্ঘকাল আমাদের পরিচারক ছিল। তথাগত মাদের পূর্বে তাকে সংঘভুক্ত করুন। তাহলে আমরা তাঁকে গুরুজন বলে াভক্তি করব অবনত মস্তকে ও প্রসারিত হস্তে। তাতে আমাদের মধ্যে শাক্যবংশীয় আভিজাত্য আছে তা নষ্ট হবে।" অনন্তর তথাগত প্রথমে ালিকে সংঘভুক্ত করলেন, তার পর বাকী ছয়জনকে। বর্ষাকাল শেষ র পূর্বেই ভদ্দিয় ত্রিবিধ প্রজ্ঞা, অনুরুদ্ধ দিব্য দর্শন, আনন্দ মোহমুক্তি : দেবদত্ত ঋদ্ধি লাভ করলেন।

প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে উপালি পৃচ্ছ নামে একটি আখ্যায়িকা ছিল। কিন্তু এখন আর পাওয়া যায় না। বিনয় পিটকে উহার উল্লেখ পাওয়া তা থেকে উহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। উক্ত ঘটনা থেকে জানা উপালি তথাগতের কৃপালাভ করে কত আনন্দিত হয়েছিলেন। ্যায়িকাটির সারাংশ স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে ইংরাজীতে প বলেছিলেন তার অনুবাদ এখানে দেওয়া হল।—উপালি ভাবছেন, গত আমার বাড়ীর পাশ দিয়ে গিয়েছিলেন। নাপিতের বাড়ীর পাশ দিয়ে ন গিয়েছিলেন! আমি ছুটে গেলাম তাঁর কাছে। তিনি আমাকে ছুটতে ধ ফিরে দাঁড়ালেন এবং অপেক্ষা করলেন। আহা! এই নাপিতের জন্য তিনি

অপেক্ষা করেছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভগবন্, আমি কি আপ॰ সঙ্গে একটি কথা বলতে পারি?' তিনি উত্তর দিলেন হাঁ। আহা! এই নাপিে সঙ্গে তিনি কথা বলতে সম্মত হলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আম পক্ষে কি নির্বাণলাভ সম্ভব? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ। আমার ম নাপিতের পক্ষেও নির্বাণলাভ সম্ভব! আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হাঁ, নিশ্চয় আহা! আমার মত নাপিতও তথাগতের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পা আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে ভগবন্, আমি কি আপনার সঙ্গে থাকতে পা। তিনি উত্তর দিলেন, 'হাঁ, তুমি পার।' আমার মত দীন হীন নাপিতের পে তথাগতের সহবাস সম্ভব। আহা! তথাগতের কি করুণা!"

দেবদত্ত ছিলেন সিদ্ধার্থের শ্বশুর সুপ্রবুদ্ধের সন্তান এবং যশোধরার ভ সংঘে যোগদানের পর তথাগতের মত শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভের জন্য বি অধীর হন। তাঁহার আকাঙ্খা ব্যাহত হওয়ায় তিনি ঈর্ষানলে জ্ব থাকেন এবং তথাগতের দোষ-দর্শনে প্রবৃত্ত হন। তিনি রাজগৃহে গি রাজা বিম্বিসারের পুত্র কুমার অজাতশত্রুর শ্রদ্ধালাভে সমর্থ হন। অজাত তাঁর জন্য গয়াশীষ নামক একটি বিহার নির্মাণ করিয়ে দেন। তথায় দেবদত্ত শিষ্যবৃন্দ নিয়ে বাস করতেন। তাঁর জন্য পুষ্টিকর আহার্য্য অজাতশত্রু পাঠাতেন। তা দেখে তাঁর অনেক শিষ্য জুটল। তিনি নিজ বিহারে সপ্ত ছুইটি উপবসথ প্রচলিত করেন। একদিন তথাগত ধর্মপ্রচারে উপ আছেন এবং রাজা বিম্বিসার প্রমুখ শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁকে ঘিরে বসে আছে দেবদত্ত তন্মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আসন ছেড়ে উঠে প্রসা যুক্তকরে তথাগতকে বললেন, "ভগবন্, আপনি এখন বয়োবৃদ্ধ হয়েছে আপনি সুদীর্ঘ জীবন পথ-অতিক্রম করেছেন এবং আপনার আয় সমাপ্তপ্রায়। আপনি এখন নির্বাণজাত পরম সুখ উপভোগে নিমগ্ন থা এবং আমাকে ভিক্ষুসংঘের নেতৃত্ব দিন।" তথাগত উত্তর দিলেন, "দেব ভিক্ষুসংঘের নায়ক হতে চেয়ো না। আমি সংঘনায়কত্ব ।।॰পুণ

মৌদ্‌গল্যায়নকেও দেব না।” বুদ্ধ-প্রবর্তিত নিয়মাবলী অতি সহজ মনে করে দেবদত্ত স্বীয় বিহারে পাঁচ শত শিষ্যের মধ্যে এই পাঁচটি কঠোর নিয়ম প্রবর্তন করেন।—(১) ভিক্ষুরা বনে বাস করবে। (২) তারা গাছের তলায় থাকবে। (৩) ভিক্ষান্নে তারা জীবনধারণ করবে এবং কোন প্রকার দান গ্রহণ করবে না। (৪) আবর্জনা স্তূপে যে ছিন্ন বস্ত্র কুড়িয়ে পাওয়া যায় তাই তাদের পরিধেয় বস্ত্র হবে। (৫) তারা মাছ-মাংস খাবে না। যখন বুদ্ধ এই পাঁচটি নিয়ম সংঘে প্রবর্তন করতে অনিচ্ছুক হলেন তখন দেবদত্ত সংঘত্যাগ করে রাজকুমার অজাতশত্রুর সাহায্যে স্বতন্ত্র বিহার প্রতিষ্ঠা করলেন।

পিতা বিম্বিসার বৌদ্ধ ছিলেন বলে দেবদত্তের পরামর্শে অজাতশত্রু পিতৃবধে অগ্রসর হলেন। একদিন তিনি কোমরে ছোরা ঝুলিয়ে অসময়ে ভীমবেগে উত্তেজিত হয়ে রাজদরবারে প্রবেশ করলেন। তাঁর ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে মন্ত্রীরা তাঁকে ধরে ফেল্‌লেন এবং তাঁর পোষাকের নীচে ঝোলান ছোরা দেখতে পেলেন। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘রাজকুমার। আপনি কি করতে যাচ্ছিলেন? অজাতশত্রু উত্তর দিলেন, ‘আমি আমার পিতাকে বধ করতে চাই।’ চমৎকৃত অমাত্যবর্গ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কে আপনাকে এই কার্য্যে উৎসাহিত করেছে?’ রাজকুমার উত্তর দিলেন, ‘সুযোগ্য দেবদত্ত।’ মন্ত্রীরা রাজকুমারকে মগধরাজ বিম্বিসারের কাছে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর অভিসন্ধি জানালেন। রাজা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি আমাকে বধ করতে চাও কেন? যদি তুমি রাজ্য চাও এই রাজ্য এখনই নাও।’ এই বলে পিতা পুত্রকে রাজ্যভার দিলেন। কিন্তু দেবদত্ত অজাতশত্রুকে বল্‌লেন, ‘যদি বিম্বিসার বেঁচে থাকেন তাহলে তিনি আবার সিংহাসন ও রাজশক্তি পুনর্লাভে চেষ্টিত হবেন। সুতরাং তাঁকে শেষ করে ফেলাই ভাল।’ কিন্তু অজাতশত্রু পিতৃহন্তা হতে ইতস্ততঃ করলেন এই ভেবে যে, তাহলে তাঁকে কারারুদ্ধ হতে ও অনাহারে মরতে হবে। সেইজন্য বিভ্রান্ত অজাতশত্রু নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করলেন।

কোশলের রাজকুমারী ক্ষেমা ব্যতীত অন্য কেউ রাজকীয় কারাগারে যেতে

পারতেন না। রাণী গোপনে আহার নিয়ে যেতেন, যা খেয়ে বিম্বিসার বেঁচে থাকতেন। যখন তা নিষিদ্ধ হল তখন রাণী তাঁর কেশ-পাশের মধ্যে খাদ্য লুকিয়ে নিয়ে যেতেন। যখন তা ধরা পড়ল তাঁকে মুক্তবেণীতে কারাগারে যেতে আদেশ দেওয়া হল। তখন তিনি নিজ জুতার মধ্যে খাদ্য নিয়ে যেতেন। যখন এই ঘটনা আবিষ্কৃত হল তখন তিনি খালি পায়ে যেতে আদিষ্ট হলেন। তখন রাণী নিজ গাত্রে মধু মেখে কারাগারে যেতেন এবং সেই মধু চেটে খেয়েই বিম্বিসার বেঁচে থাকতেন। যখন ইহা জানা গেল তখন রাণীকে রাজার নিকট আর যেতে দেওয়া হল না। অঙ্গ-বিজেতা মগধরাজ বিম্বিসার এইভাবে অনাহারে কারাগারে মারা যান পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে ৪৯২ খ্রীষ্ট-পূর্ব অব্দে। যেদিন বিম্বিসার মারা যান সেদিন অজাতশত্রুর একটি পুত্রসন্তান লাভ হয়। তা দেখে অজাতশত্রু অপার আনন্দে নিমগ্ন হন। বিদেহী রাজকুমারী তাঁকে বললেন, 'শৈশবে আমার আঙ্গুলে একটি ক্ষত হয়েছিল। ইহা খুব যন্ত্রণাদায়ক ছিল। কোন ঔষধে সেই ক্ষতের উপশম হল না। আমার পিতা বিম্বিসার ক্ষতস্থান চুষে ও চেটে যন্ত্রণার উপশম করতেন। তারপর তিনি হেসে হেসে আমার সঙ্গে খেলা করতেন।' এই এই ঘটনা শুনে অজাতশত্রু অত্যন্ত মনস্তাপ পেলেন এবং পিতাকে কারামুক্ত করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু কারামুক্তি লাভের পূর্বেই রাজা বিম্বিসার দেহত্যাগ করেন।

দেবদত্ত বুদ্ধের জীবননাশে তিন বার চেষ্টা করেন, কিন্তু কোন বারে কৃতকার্য্য হন নি। একদা তথাগত গৃধ্রকূট পর্বতের নীচে ছায়ায় পাদচারণ করতে ছিলেন। দেবদত্ত পাহাড়ের উপরে উঠে একখণ্ড বিশাল প্রস্তর বুদ্ধের দিকে ঠেলিয়া ফেলেন। কিন্তু উক্ত প্রস্তরখণ্ড অন্য পাহাড়ের উপর পড়িয়া যায়। এক টুকরা পাথর বুদ্ধের পায়ে লাগে এবং তা থেকে রক্তপাত হয়। দেবদত্ত অজাতশত্রুর কাছে গিয়ে বলেন, 'আমাকে কতকগুলি লোক দিন।' অজাতশত্রু তাঁর প্রজাদিগকে আদেশ দিলেন, 'সুযোগ্য দেবদত্ত যে আদেশ দেন তোমরা তা তৎক্ষণাৎ পালন করবে।' তখন দেবদত্ত একজনকে আদেশ

দিলেন, 'বন্ধু, তুমি শীঘ্র যাও এবং শ্রমণ গৌতমকে অমুক স্থানে বধ কর।' সেই লোকটি উক্ত স্থান থেকে ফিরে এসে বললেন, 'আমি তথাগতের প্রাণনাশ করতে পারব না।' তখন রাজগৃহে নলগিরি নামে একটি দুর্দমনীয় ও নরনাশক হাতী ছিল। দেবদত্ত রাজগৃহের হস্তীশালায় গিয়ে হস্তীরক্ষকদের বললেন, "হে বন্ধুবর্গ, আমি রাজাদের আত্মীয়। আমি নিম্নপদস্থ ব্যক্তিকে উচ্চপদস্থ করতে পারি। আমি তোমাদের বেতন বৃদ্ধির ক্ষমতাও রাখি। যখন গৌতম গাড়ীর রাস্তায় আসবেন তখন তোমরা মত্তহস্তী নলগিরিকে রাস্তায় ছেড়ে দিও।" তদনুযায়ী রাজপথে মত্তহস্তী নলগিরিকে ছেড়ে দেওয়া হল। বুদ্ধবধের জন্য দেবদত্ত সুদক্ষ ধনুর্ধরও নিযুক্ত করেছিলেন। যখন এসব ঘটনা লোকে জানতে পারলেন সকলে তাঁর দুর্নাম করতে লাগলেন। রাজা অজাতশত্রুও তাঁকে কোন সাহায্য দিলেন না এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার বন্ধ করে দিলেন। তখন দেবদত্ত বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করতেন।

দেবদত্ত স্বকর্মদোষে সকলের অপ্রিয় হয়ে পড়লেন। তিনি মগধ ছেড়ে কোশলে গেলেন রাজা প্রসেনজিতের অনুগ্রহ লাভার্থ। প্রসেনজিৎও ঘৃণাভরে তাঁকে বিতাড়িত করেন। শ্রাবস্তী থেকে দেবদত্ত কপিলবাস্তু যাত্রা করেন এবং সন্ধ্যায় তথায় উপস্থিত হন। যখন যশোধরা বিশ্রামার্থ অন্দর মহলে যেতে প্রস্তুত ছিলেন তখন দেবদত্ত পূর্বে সংবাদ না পাঠিয়ে সোজা যশোধরার কক্ষে উপস্থিত হন। যশোধরা জিজ্ঞাসা করেন, 'ভিক্ষু! তুমি কি চাও? আমার পতির কাছ থেকে কোন সংবাদ এনেছ কি?' দেবদত্ত উত্তর দিলেন, 'তোমার পতি? সে তোমার কথা মনে করে না। সে তোমার সুদিনে নিষ্ঠুর নির্দয় ভাবে তোমাকে পরিহার করেছে।

যশোধরা—কিন্তু তিনি বহু জনের কল্যাণার্থ তা করেছিলেন।

দেবদত্ত—সে যা হোক, এখন তার নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিশোধ নাও।

যশোধরা—থামো, ভিক্ষু থামো। তোমার কথাও চিন্তা অত্যন্ত অশুদ্ধ।

দেবদত্ত—আমাকে চিনতে পারছ না, যশোধরা? আমি দেবদত্ত, যে তোমাকে ভালবাসে।

যশোধরা—দেবদত্ত, আমি জানি তুমি মিথ্যুক ও হিংসুক, নীচ ও ঘৃণ্য আমি ভেবেছিলাম, তুমি অসৎ সাধু হবে। কিন্তু তুমি যে এত হীনবুদ্ধি ও নরাধম তা জানতাম না।

দেবদত্ত—যশোধরা! যশোধরা! আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমা পতি তোমাকে অবহেলা ও অবজ্ঞাই দেখিয়েছে। আমাকে ভালবেসে তা নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ নাও।

যশোধরার শুষ্ক ও শীর্ণ মুখ দিব্য প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অশ্রু তাঁর গা বেয়ে পড়তে লাগল। তিনি উত্তেজিত স্বরে বললেন, "দেবদত্ত, তুমিই আমা প্রতি নিষ্ঠুর হয়েছ। তোমার প্রেম আন্তরিক হলেও আমার নিকট অপমা জনক। যখন তুমি বলছ, তুমি আমায় ভালবাস, তুমি মিথ্যা কথাই বলছ যখন আমি তরুণী ও সুন্দরী ছিলাম, তুমি আমার দিকে তাকাওনি। এখ আমি শোকেদুঃখে ভগ্ন ও বৃদ্ধ হয়েছি। এখন তুমি কাপুরুষ ও পাপমতি। এই বলে যশোধরা চীৎকার করে বললেন, "এখান থেকে বেরোও, দেবদত্ত এখান থেকে বেরোও।" দেবদত্ত লজ্জিত হযে স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন।

কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগিনী ও বিম্বিসারের রাণী ক্ষেমা এই সক ব্যাপারে নির্বিন্ন হয়ে ভিক্ষুণীরূপে বৌদ্ধ সংঘে যোগ দিলেন। কিন্তু তি শোকে দুঃখে অল্প দিন পরে মারা যান। প্রসেনজিতের পিতা মহাকোশ স্বীয় কন্যা ক্ষেমাকে বিম্বিসারের সহিত বিবাহ দেবার সময় কাশীরাজ্যের আ লক্ষমুদ্রা যৌতুকস্বরূপ দেন বেশভুষা প্রসাধনের জন্য। মাতার মৃত্যুর পরে অজাতশত্রু পূর্ববৎ কাশীর আয় পেতেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রসেনজিৎ ঘো করলেন, "রাজ্যাপহারক পিতৃহন্তা অজাতশত্রুকে আমি আমার পৈতৃ রাজ্যকর ভোগ করতে দেব না।" খ্রীষ্টপূর্ব ৪৯০ অব্দে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বা এবং অজাতশত্রু পরাজিত ও বন্দী হন।

অবশেষে দেবদত্ত বহু শিষ্য কর্তৃক পরিত্যক্ত, রোগাক্রান্ত ও অনুত হন। তিনি বাকী শিষ্যদিগকে অনুরোধ করে বললেন, "বৎসগণ তোম আমাকে শিবিকায় বুদ্ধের কাছে নিয়ে চল। যদিও আমি তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যব

:রেছি আমি তাঁর শ্যালক। এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্যও অন্ততঃ তিনি-আমায় ;মাও রক্ষা করবেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিষ্যগণ তাঁকে বুদ্ধের কাছে নিয়ে :লন। বাহকগণ যখন হাত ধুতে ছিলেন তখন দেবদত্ত বুদ্ধ-দর্শনের আগ্রহে বিকা থেকে উঠে পড়লেন। তখন তাঁর মাথা ঘুরতে ও পা টল্‌তে লাগল। নি মুর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন এবং বুদ্ধের নাম করতে করতে প্রাণত্যাগ ;লেন।

অলৌকিক কার্য্য নিষিদ্ধ*

সুভদ্রের পুত্র জ্যোতিষ্ক রাজগৃহের এক ধনী গৃহস্থ ছিলেন। তিনি একটি মূল্য রত্নখচিত চন্দনপাত্র পেয়ে স্বগৃহের প্রাঙ্গণে একটি লম্বা বাঁশ পুঁতে র মাথায় রেখে দিলেন এবং এই ঘোষণা করলেন, যদি কোন শ্রমণ এই ত্রটি কোন সিঁড়ি বা লাঠির সাহায্য ব্যতীত কেবল অলৌকিক শক্তি ভাবে নামিয়ে আনতে পারেন তিনি পুরস্কৃত হবেন। লোকেরা তথাগতের কট আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে এলেন, এবং পঞ্চমুখে তাঁর শিষ্যদের প্রশংসা করতে গলেন। তাঁরা বললেন, 'তথাগত মহাদেব। তাঁর শিষ্যরা অলৌকিক কার্য্য ;তে পারেন।' বুদ্ধ-শিষ্য কাশ্যপ জ্যোতিষ্কের পাত্রটী বাঁশের মাথা থেকে :হাত বাড়িয়েই নামিয়ে আনলেন এবং সমবেত দর্শকমণ্ডলীর জয়ধ্বনির ধ্য বিহারে নিয়ে গেলেন।'

তথাগত এই অদ্ভুত ঘটনাটি জানতে পেরে কাশ্যপের কাছে গেলেন এবং ন কাঠের পাত্রটি টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলে শিষ্যবৃন্দকে অলৌকিক । করতে নিষেধ করলেন। ইহার কিছু কাল পরে এক বর্ষা ঋতুতে অনেক ক্ষু বৃজি রাজ্যে দুর্ভিক্ষ সময়ে বাস করতেছিলেন। একজন ভিক্ষু অন্য এক ক্ষুর কাছে প্রস্তাব করলেন যে, গ্রামবাসী গৃহস্থদের নিকট তারা পরকে প্রশংসা করবেন এই বলে, 'এই ভিক্ষু খুব বড় সাধু। তিনি নানা দর্শন পেয়েছেন এবং তাঁর অনেক অলৌকিক শক্তি আছে। তিনি

* Life of Gautama by R. P. Bigandet দ্রষ্টব্য

অলৌকিক কার্য্য করতে পারেন।' এইরূপ প্রশংসাবাদ শুনে গ্রামবা বলতে লাগল, 'বড ভাগ্যের কথা। এইরূপ বড় বড সাধুরা আমাদের বর্ষাবাস করছেন।' তাঁরা স্বেচ্ছায় প্রচুর খাদ্য ভিক্ষুদিগকে দান করলে দুর্ভিক্ষ সত্বেও ভিক্ষুদের পানাহারের কোন অসুবিধা হল না। এই কথা তথাগতের কাণে গেল তখন তিনি আনন্দকে আদেশ দিলেন ভিক্ষুদিগ সমবেত করতে। ভিক্ষুগণ সমবেত হলে বুদ্ধদেব তাদিগকে জিজ্ঞাসা কর 'হে ভিক্ষুগণ, তোমরা বল, 'কখন ভিক্ষু ভিক্ষুত্বের অযোগ্য হয়?' শাবি উত্তর দিলেন, 'দীক্ষিত ভিক্ষু কোন অসৎ কার্য্য করবেন না। যে শিষ্য আচরণে লিপ্ত হয় সে শাক্য মুনির শিষ্যত্ব হারায। কোন দীক্ষিত শিষ তাঁকে দেওয়া হয়েছে ততোধিক গ্রহণ করবেন না। যদি তা অতি স ভাবেও করেন তিনি আর শাক্য মুনির শিষ্য থাকেন না। অবশেষে দীক্ষিত একটি পিঁপডা বা কেঁচো প্রভৃতি কোন নিরীহ প্রাণীর প্রাণনাশ করে হিংসা সে আর শাক্য মুনির শিষ্য থাকে না। ভগবন্, এই তিনটিই আপনার প্র নিষেধ।"

তথাগত ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করে বললেন, "ভিক্ষুগণ, আজ তোম কাছে আর একটি নিষেধ ঘোষণা করছি। কোন দীক্ষিত শিষ্য কোন অমানু শক্তির গর্ব করবে না। যে শিষ্য অসৎ অভিপ্রায়ে এবং লোভবশে অমানু শক্তি, দিব্য দর্শন বা অলৌকিক কার্যের গর্ব করে সে শাক্য মুনির শিষ্য ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে মন্ত্রাদি প্রয়োগ করতে নিষেধ করেছি। ক তা নিরর্থক এবং কর্মফলই প্রবল। যে অলৌকিক কার্য করতে অগ্রসর হ বুদ্ধ-ধর্মের তাৎপর্য বোঝেনি।"

চী নামে এক কবি নিষ্কলঙ্ক প্রজ্ঞানেত্র লাভ করেছিলেন। তিনি বুদ্ধে বি ছিলেন, ধর্ম তাঁকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিয়েছিল দুঃখকষ্টের সময়। তিনি দেশে বাস করতেন সেখানে মহামারী প্রাদুর্ভূত হল, তাতে বহু লোক গেল, বহু লোক ভয় পেল। কেউ কেউ মৃত্যুভয়ে কাঁপতে লাগল এবং মৃ পূর্বেই মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগল। অন্যেরা আনন্দিত হলেন এবং চী

া বলতে লাগলেন, 'এস, আজ খুব ভোগ করে নিই, কারণ কাল বাঁচব কিনা :ত পারি না।' তথাপি তাদের হাসিতে আসল আনন্দ ছিল না, নিছক ।াসি ও কৃত্রিম আনন্দ ছিল। যে সংসারী নরনারীরা ভয়ে কাঁপতেছিল দর মধ্যেই উক্ত বৌদ্ধ কবি চী পূর্ববৎ অবিচলিত ও প্রশান্ত ভাবে বাস করতে ।লেন। তিনি রোগীকে ঔষধ-পথ্য দান এবং ধর্ম-পিপাসুর নিকট ধর্মচর্চা া কাল কাটাতেন। তাঁর কাছে একজন এসে বললেন, "আমার হৃদয় দুর্বল উত্তেজিত। বহু লোককে মরতে দেখে আমার এই অবস্থা হয়েছে। আমি জর জন্যই চিন্তিত হয়েছি, অন্যের জন্য নয়। আমাকে সাহায্য করুন, আমার দূর করুন।" কবি উত্তর দিলেন, "অপরের প্রতি যার দয়া আছে সেই ায্য পাবে। যে নিজের জন্য ভেবে মরে, তাকে কেউ সাহায্য করে না। ময় আসে মানুষকে পরীক্ষা করতে এবং ধর্ম ও দানাদি মানুষকে শিক্ষা ত। তুমি কি চার দিকে এই সমস্ত শোচনীয় দৃশ্য দেখছ না? তা সত্ত্বেও স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ আছ কি করে? তোমার ভাই-ভগ্নী ও বন্ধুগণকে ভুগতে দেখেও নিজের কষ্ট মোচনে এত ব্যস্ত হয়েছ কেন?"

সুখকামী মানুষটির মনে বিষাদ লক্ষ্য করে বৌদ্ধ কবি একটি গান রচনা বিহারের ভিক্ষুবৃন্দকে শোনালেন। গানটির সারমর্ম এই।—"যতক্ষণ তুমি র শরণ না নিচ্ছ এবং নির্বাণের শান্তি না পাচ্ছ ততক্ষণ জীবন বৃথা জানবে। পৃথিবী অপচ্ছায়া মাত্র এবং স্বর্গের আশা মরীচিকার তুল্য। পিঞ্জরাবদ্ধ র মত সংসারী লোক সুখের সন্ধান করে। কিন্তু বৌদ্ধ সাধু বন্য সারসের স্বর্গের দিকে উড়ে যায়। মুরগীর জন্য পিঞ্জরে খাবার থাকে। কিন্তু সে রন্ধন-পাত্রে পড়বে ও সিদ্ধ হবে। বন্য সারসের জন্য কোন আহার্য্য ত নাই। কিন্তু স্বর্গে ও মর্ত্যে সে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে। ইন্দ্রিয়-সুখে নাই এবং ধনসম্পদও স্থায়ী সুখ দিতে পারে না। মৃত্যুর কাছে ধনী-নির্ধন নীচ সকলেই সমান। সূর্য যেমন সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কর্মরত থাকে ন তুমিও জীবনের উৎকর্ষ সাধনে নিরন্তর অগ্রসর হও। তোমার প্রতিভা শ পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে, তুমি অমিত ধন-সম্পদও অর্জন

করতে পার। কিন্তু নির্বাণের শান্তি লাভ করতে না পারলে জী
বৃথা।

একদিন তথাগত প্রচারকের কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর শিষ্যবৃন্দকে এই ভা
উপদেশ দিয়েছিলেন, "আমি যখন দেহরক্ষা করব এবং তোমাদের অ
উপদেশ দিতে পারব না তখন তোমরা সদ্বংশজাত ও সুশিক্ষিত ভিক্ষুদিগ
তোমাদের মধ্য থেকে মনোনীত কর আমার পরিবর্তে ধর্ম-প্রচারার্থ। তা
তথাগতের পোষাকে সমাবৃত হোক। তারা তথাগতের আবাসে প্রবেশ করু
তারা তথাগতের বেদী অধিকার করুক। অসীম ক্ষমা ও অনন্ত ধৈর্যই তথাগত
পোষাক। দান ও প্রীতিই তথাগতের আবাস, ধর্মবোধই তথাগতের বেদী
প্রচারক নিঃসঙ্কোচে ধর্মপ্রচার করবে, ধর্মব্যাখ্যা চালাবে। সে যদি ব্রত
ও ধর্মপ্রাণ হয় তাহলে তার কথা নিশ্চয়ই শ্রোতার মর্মস্পর্শ করবে। বড
লোকের সঙ্গ সে চাইবে না, বা কাউকে সে খোসামোদও করবে না। য
অনৈতিক বা ধর্মহীন তাদের সঙ্গ সে পরিহার করবে। প্রলোভনের সম্মু
হলে সে সতত বুদ্ধের স্মরণ করবে। সে যদি তা করে, তবে সে নিশ
প্রলোভন অতিক্রম করবে। সকল ধর্মপিপাসুকে প্রচারক সমানভ
ধর্মোপদেশ দেবে। প্রচারক কোন ব্যক্তির নিন্দা বা অন্য প্রচারকের সমালো
বা কুৎসা রটনা বা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করবে না। কারুর নাম উল্লেখ ক
সে প্রশংসা বা নিন্দা করবে না। ভালভাবে গেরুয়া রঙের পরিষ্কার বহি
ও যথাযোগ্য অন্তর্বাস পরে সে বেদীতে উঠবে এবং নিন্দাশূন্য শা
মনে ধর্মোপদেশ দেবে। স্বীয় মনীষার প্রাধান্য প্রদর্শন ও বিতর্ক
আলোচনা হতে সে বিরত থাকবে এবং প্রশান্ত ও সমাহিত চিত্তে ধর্মব
করবে। তাঁর মূল লক্ষ্য হবে, ধর্মসাধন করে প্রত্যেকে বুদ্ধত্ব লাভে ধন্য হো

আনন্দ

বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য আনন্দ ছিলেন তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। যে বি
প্রজাপতি বুদ্ধকে লালন পালন করেন এবং পরে ভিক্ষুণীরূপে সংঘ-জননী

়ানন্দ ছিলেন তাঁরই পুত্র। বুদ্ধ যখন কপিলবাস্তুতে আসেন তখন আনন্দ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বুদ্ধ বিংশ বর্ষা শ্রাবস্তীতে অতিবাহিত করেন। তথায় তিনি একদিন সমবেত শিষ্যগণকে সম্বোধন করে বলেন, "আমার বয়স এখন ৫৫ বৎসর। বার্ধক্য এখন না এলেও আমার একজন সেবক (উপস্থায়ক) দরকার। এতদিন নাগাসমল, নাগিত, উপগণ, সুনক্ষত্রী, চুণ্ডসগল ও মেঘি আমাকে সেবা করেছে। একজন নির্দিষ্ট উপস্থায়কের অভাবে আমি অনেক অসুবিধা ভোগ করছি।" শারিপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন প্রভৃতি শিষ্যবৃন্দ উক্ত পদ লাভের জন্য ব্যগ্র হলেন। কিন্তু বুদ্ধ আনন্দকে নিজ সেবার জন্য মনোনীত করলেন। আনন্দ নিম্নোক্ত আটটি সর্তে উপস্থায়ক হতে সম্মত হলেন।—(১) বুদ্ধের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি আমি পরিধান করব না। (২) বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রে যে অন্ন অবশিষ্ট থাকবে তা আমি খাব না। (৩) বুদ্ধ ভিক্ষা গ্রহণার্থ কোথাও আমন্ত্রিত হলে আমি সেখানে যাব না। (৪) আমার ভিক্ষা-পাত্রে আমি যে আহার্য্য ভিক্ষা করে আনবো বুদ্ধ তাহাই গ্রহণ করবেন। (৫) বুদ্ধ যাঁর সঙ্গেই কথাবার্তা বলুন না কেন আমি যেন সেখানে থাকতে অনুমতি পাই। (৬) ধর্ম সম্বন্ধে কোন সন্দেহ আমার মনে উঠলে তার সমাধানের জন্য আমি যেন যে কোন সময়ে বুদ্ধের কাছে যেতে পারি। (৭) আমি যেন পৃথক গৃহে থাকতে অনুমতি পাই। (৮) আমার অনুপস্থিতিতে বুদ্ধ যদি কোন ধর্মোপদেশ দেন আমি যেন তা শুনতে পাই বুদ্ধের মুখ থেকে।

আনন্দ প্রায় পঁচিশ বছর প্রাণ দিয়ে ভগবান্ বুদ্ধের সেবা করেন। তিনি ছায়ার মত তাঁর সঙ্গে থাকতেন। সুত্তপিটকে ভগবান্ বুদ্ধের যে সকল উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে সেগুলি আনন্দকেই লক্ষ্য করে বুদ্ধ বলেছেন। একদিন বুদ্ধ আনন্দের সঙ্গে কোন বিহার পরিদর্শনে যান এবং তথায় কোন ভিক্ষুকে শয্যাশায়ী দেখেন। বুদ্ধ শায়িত ভিক্ষুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি হয়েছে?" ভিক্ষু—ভগবন্, আমার শূলব্যথা হয়েছে। বুদ্ধ—তোমাকে সেবা-শুশ্রূষা করবার কেউ নাই? ভিক্ষু—আজ্ঞে, না। বুদ্ধ—না কেন? ভিক্ষু—কারণ ভিক্ষুরা মনে করেন, আমি আর তাঁদের কোন কাজে আসব না। তখন বুদ্ধ

রুগ্ন ভিক্ষুকে স্নান করাবার জন্য আনন্দকে স্নানীয় আনতে বললেন। যখ
স্নানীয় আনা হল তখন বুদ্ধ স্বহস্তে ভিক্ষুটিকে স্নান করাতে চাইলেন কি
আনন্দ তাতে আপত্তি করলেন। এইজন্য বুদ্ধ তাঁর মাথা ও দেহ এবং আনন
তাঁর পা দুটি ধুয়ে দিলেন। অনন্তর বুদ্ধ উক্ত বিহারস্থ ভিক্ষুবৃন্দকে জিজ্ঞাস
করলেন, "তোমরা তোমাদের এই অসুস্থ ভ্রাতার সেবা-শুশ্রূষা করনি কেন ?'
ভিক্ষুরা উত্তর দিলেন, 'ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে।' তখন বুদ্ধ দুঃখিত হ
বললেন, "কিন্তু তার তো বাপ মা কিংবা আর কেউ নেই তার শুশ্রূষা করবার
যদি তোমরা পরস্পরকে সেবা না কর তবে কে করবে। যদি তোমরা আমাকে
ভালবাসতে, শ্রদ্ধা দিতে ও সেবা করতে চাও তবে তোমরা প্রাণপণে বুদ্ধ রু
গুরু-ভাইকে সেবা কর।" পালি পুস্তক মহাবগ্‌গে এই ঘটনাটি উল্লিখিত।

একদিন তথাগত আনন্দের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে তি
তাঁর প্রিয়তম পার্শ্বচরকে বললেন, "আনন্দ, আমি আর এগোতে পারছি না
কে যেন আমার পা টেনে ধরছে।" তখন আনন্দ রাস্তার দিকে তাকি
দেখলেন, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। তথাপি তথাগত যখন পুনঃ পুন
একই কথা বললেন তখন আনন্দ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে রাস্তার ধারে একট
চকচকে কিছু দেখতে পেলেন, জিনিষটার একটু খানি দেখা যাচ্ছিল এব
অধিকাংশ মাটির ভিতরে ছিল। আনন্দ লাঠি দিয়ে সেই জিনিষটা খুঁড়ে বা
করলেন এবং তার ধুলো মাটি ঝেড়ে দিয়ে জানতে পারলেন, সেটি বুদ্ধ কর্তৃ
ব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত, মহামূল্য অলংকার। তিনি সেটি বুদ্ধকে দেখি
বললেন, এটি কোন বিহারে সযত্নে রক্ষা করব' তা শুনে বুদ্ধ বললেন
পরিত্যক্ত নিষ্ঠীবনবৎ এটি দূরে ছুঁড়ে ফেল, আর হাতে রেখো না। শি
গুরুর আদেশ পালন করলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেটি আবার শিষ্যের হাতে
ফিরে এল। তখন বুদ্ধ বললেন, 'আনন্দ তুমি আসক্তি-সূত্রে এটি বেঁধে রেখো
বলে তোমার হাতে এটা ফিরে এল। তুমি সেই সূত্র ছিন্ন করে এটি ছুঁ
ফেল, আর এটি হাতে ফিরে আসবে না।" আনন্দ আসক্তিশূন্য হয়ে যখন সে
ছুঁড়ে ফেললেন তখন আর সেটি হাতে ফিরে এল না।

আনন্দের অনুরোধেই বৌদ্ধ সংঘে ভিক্ষুণীরা স্থান পেলেন। তথাগত
নির্বাণের সময়ও আনন্দ তাঁর কাছে ছিলেন। বুদ্ধ তখন তাঁর প্রিয় শিষ্যকে
ছিলেন, "আনন্দ, রাজগৃহ, গৃধ্রকূট, চৌর পর্বত, বেভার পর্বতের উপত্যকায়
পর্ণী গুহা, ইশিগিলি পাহাড়ের উপত্যকায় কৃষ্ণ পর্বত, বেনুবনে কাঠবেড়ালীর
জন ক্ষেত্র, জীবকের আম্রবন এবং মস্কুচিতে মৃগদাব কি সুন্দর! আনন্দ,
ালী, উদেনচৈত্য, গোতমকচৈত্য, বহুপুত্রচৈত্য, এবং স্বর্ণদদচৈত্য কি
র!" অন্তিম শয্যায় বুদ্ধ যখন সুভদ্রকে দীক্ষা দিলেন ও সংঘভুক্ত করলেন
ন বুদ্ধের নির্দেশ অনুসারে আনন্দই সুভদ্রের মস্তক মুণ্ডন ও তাঁকে কাষায়
পরিয়ে ও ত্রিশরণ মন্ত্র দিয়ে সংঘে গ্রহণ করলেন। তথাগতের
নির্বাণের সময় একমাত্র আনন্দই অশ্রুবিসর্জন করেছিলেন। সেইজন্য
প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গিতি হল তখন আনন্দকে উহার সভাপতি করা হল না।
জন প্রবীণ ভিক্ষু বললেন, 'আনন্দই সভাপতি হবার যোগ্য। কারণ তিনি
াগতকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসতেন।' কিন্তু অন্য এক ভিক্ষু অগ্রসর হয়ে
প্রতিবাদ করলেন, 'না, আনন্দ সভাপতি হতে পারেন না। কারণ তিনি
াগতের মৃত্যুশয্যায় ক্রন্দনের অপরাধে অপরাধী।' সেইজন্য আনন্দ প্রথম
তির পৌরোহিত্য করতে পারলেন না।

সুন্দরী ও চিঞ্চা

চাঁদের যেমন কলঙ্ক আছে তেমনি মৈত্রী-মূর্তি তথাগতেরও শত্রুও ছিল।
ত্ত, সুপ্রবুদ্ধ প্রভৃতি পুরুষ শত্রু ব্যতীত বুদ্ধের নারী শত্রু ও ছিল।
নে সুন্দরী ও চিঞ্চা নাম্নী দুই নারী শত্রুর অসৎ আচরণ বিবৃত করব।
উদিত হলে যেমন জোনাকী পোকাগুলি লুক্কায়িত হয় তেমনি বুদ্ধের
র্ভাবে তীর্থিকগণ নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন। লোকে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও
ার দিতে বিরত হল। রাজপথে দাঁড়িয়ে তাঁরা এই ভাবে বুদ্ধের নিন্দাবাদ
ত লাগলেন, "যদি শ্রমণ গৌতম বুদ্ধ হয় তবে আমরাও বুদ্ধ! যদি বুদ্ধকে
ার দিলে পুণ্য হয় তবে আমাদিগকে উপহার দিলেও তার সমান বা

তাৎর্থিক পুণ্য হবে। সুতরাং আমাদিগকে উপহারাদি তোমরা দাও না কেন যখন লোকে তাঁদের কথায় কান দিল না তখন তাঁরা গোপনে শ্রমণ গৌতমে চরিত্রে দোষারোপের চক্রান্ত করলেন। বৌদ্ধ সংঘকে জনসাধারণের কাছে হী প্রতিপন্ন করাই ছিল তাঁদের দুরভিসন্ধি।

রমণী সুন্দরীর নন্দের সাথে বিবাহিতা হবার কথা ছিল। কিন্তু বুদ্ধে শিষ্যত্ব গ্রহণান্তে নন্দ সন্ন্যাসী হয়ে যান। তাই সুন্দরী বুদ্ধের প্রতি বিদ্বে ছিলেন। তা জানতে পেরে তীর্থিকগণ ভাবলেন, "হয়ত সুন্দরীর সাহায় আমরা আমাদের ষড়যন্ত্রের সাফল্য পাবো।" তাঁরা সুন্দরীর কাছে গি বললেন, "তুমি অতিশয় সুন্দরী ও রমণীয়া। তোমার যেমন নাম, তেম রূপ। তুমি যদি শ্রমণ বুদ্ধের একটী কুৎসা রটিয়ে দাও তাহলে লোকে বিশ্বাস করতে পারে। তাতে তার প্রভাবও কমে যাবে। মালা, কর্পূর সুগন্ধি দ্রব্যাদি দিয়ে রোজ সন্ধ্যায় সুন্দরী জেতবনের দিকে যেত, যখ নাগরিকগণ নগরে ফিরে আসতেন। যদি তাকে কেউ জিজ্ঞাসা কর "সুন্দরী! কোথায় যাচ্ছ?" সে উত্তর দিত, আমি শ্রমণ বুদ্ধের কাছে যা গন্ধ কুটীরে তাঁর সঙ্গে রাত্রিবাস করতে। তীর্থিকদের কোন বাগানে রাত্রিব করে সে যখন সকালে ফিরে আসত তখন যদি কেউ জিজ্ঞাসা করত, "রা কোথায় ছিলে?" সে মৃদু হাস্যে বলত, গৌতমের কাছেই ছিলাম কয়েক দিন পর তীর্থিকগণ কতিপয় গুপ্ত ঘাতক ভাড়া করে আনে এবং তাদিগকে বললেন, "সুন্দরীকে মেরে তার মৃতদেহ গৌতমে গন্ধকুটীরের পাশে আবর্জনা-স্তূপে ফেলে দাও।" গুপ্ত ঘাতকরা অর্থ-লো তীর্থিকদের কথামত কাজ করল। অনন্তর তীর্থিকদের শান্তি ও ন্যায় সংরক্ষ কর্মচারীদের নজরে এই ঘটনাটি আনলেন এবং অভিযোগ করলেন যে, সুন্দ জেতবনে যাতায়াত করত এবং তাকে এখন পাওয়া যাচ্ছে না। সরকা কর্মচারীদের অনুসন্ধানের ফলে সুন্দরীর মৃতদেহ আবর্জনা-স্তূপে পাওয়া গে গৌতমের শিষ্যদিগকে দোষী সাব্যস্ত করবার জন্য প্রচার করলেন, তারা সুন্দরীকে মেরেছে তাদের গুরুর অপবাদ ঢাকবার জন্য। কিন্তু পাপ ও পা

খনও চাপা থাকে না এবং সাগর কখনও শুকায় না। সুন্দরীকে হত্যা করবার ন্য ঘাতকরা যে প্রচুর অর্থ পেয়েছিল সেগুলি নিজেদের মধ্যে বণ্টন ্যাপারে মতভেদ হল। মদের দোকানে বসে তারা এই বিষয়ে ঝগড়া করতে াগল। কর্মচারীরা তৎক্ষণাৎ তাদিগকে গ্রেপ্তার করল এবং তাদের কাছ থকে গুপ্ত সংবাদ জেনে নিল। ঘাতকরা তাদের দোষ স্বীকার করল এবং ্রকাশ করে দিল যে, তীর্থিকদের প্ররোচনায় তারা এই গুপ্ত হত্যা করেছিল। যেটুকু প্রভাব তীর্থিকদের ছিল এই ঘটনায় তা নষ্ট হল এবং লাকে তাদের নিন্দা করতে লাগল।

তীর্থিকরা চিঞ্চা দ্বারা গৌতম বুদ্ধের বিরুদ্ধে যে অপবাদ রটিয়েছিলেন তা আমরা এখন বিবৃত করব। তখন শ্রাবস্তীতে চিঞ্চা নামে এক ব্রাহ্মণী বনিতা ছিল। দৈহিক সৌষ্ঠবে এবং সৌন্দর্যে তার তুলনা ছিল না। তার মনোহর চহারা দেখবার লোভে বহু লোক তার কাছে যেত। চালচলনে, কথাবার্তায় তার সুষমা যেন ছড়িয়ে পড়ত এবং লোককে মোহিত করত। কোন ্রক্রান্তকারী বিদ্বেষপরায়ণ তীর্থিক ভাবলেন, চিঞ্চার সাহায্যে গৌতমের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে পারলে তাঁর অপূর্ব প্রতিষ্ঠা কমে যাবে। তীর্থিকগণ তাঁর কথায় সম্মতি দিলেন। একদিন চিঞ্চা তীর্থিকদের প্রমোদ-কাননে উপস্থিত হল এবং তাদিগকে অভিবাদনান্তে উপবেশন করল। কিন্তু কোন তীর্থিকই তার সঙ্গে কথা বললেন না। এতে বিস্মিত হয়ে চিঞ্চা বলল, "আমি কি কোন অপরাধ করেছি আপনাদের কাছে? আমি আপনাদিগকে তিন বার অভিবাদন করা সত্ত্বেও আপনারা আমার সঙ্গে একটি কথাও বললেন না।" তীর্থিকগণ বললেন, 'ভগিনী! তুমি কি জান না যে, শ্রমণ গৌতম জনপ্রিয় হওয়ায় আমাদের খুব অনিষ্ট ও ক্ষতি হচ্ছে?' চিঞ্চা বলল, 'আমি তা জানি না। এই সমস্যার সমাধানার্থে আমার কোন করনীয় আছে কি?' তীর্থিকগণ চিঞ্চাকে অনুরোধ জানালেন, "যদি তুমি আমাদের কোন উপকার করতে চাও তাহলে স্বীয় চেষ্টায় গৌতমের বিরুদ্ধে দুর্নাম রটাও এবং তাঁকে সমাজে হেয় কর।" চিঞ্চা বললে, 'বেশ কথা। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন এবং এইজন্য

আমার উপর নির্ভর করুন।' এই বলে চিঞ্চা চলে গেল এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করতে লাগল। নারীসুলভ সৌন্দর্য্য প্রকাশে সে অভিজ্ঞা ছিল। যখন নাগরিকগণ শ্রাবস্তী থেকে ফিরতেন জেতবনে বুদ্ধের উপদেশ শুনে তখন চিঞ্চা গোলাপী রঙের পোষাক পরে ও হাতে ফুলের মালা ও সুগন্ধি দ্রব্য নিয়ে জেতবনের দিকে যেত। যদি কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করত, 'এখন কোথা যাচ্ছ?' সে উত্তর দিত, 'তাতে তোমার কি?' জেত বনের পাশে তীর্থিকারামে রাত কাটিয়ে সে যখন সকালে সহরে ফিরত তখন নাগরিকগণ জেতবনে যেতেন বুদ্ধকে শ্রদ্ধা নিবেদনার্থ। যদি কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করত 'কোথায় রাত কাটালে?' সে হাসতে হাসতে বলত, "তাতে তোমাদের কি? আমি জেতবনে গন্ধকুটীরে শ্রমণ গৌতমের কাছে রাত কাটিয়েছি।" এই মন্তব্য কারো কারো মনে সন্দেহ সৃষ্টি করল। চার মাস পরে চিঞ্চা তার পেটে পুরাণো কাপড় জড়িয়ে পেঠ মোটা করল এবং নিজেকে গর্ভবতী বলে বেড়াল। সে রটিয়ে দিল যে, শ্রমণ গৌতমের দ্বারা সে গর্ভবতী হয়েছে। কুৎসা-বিশ্বাসীর অভাব জগতে কখনও হয় না। মনে যখন পাপ বাসা বাঁধে তখন লোকে অপরের দোষ শুনেই বিশ্বাস করে, চাক্ষুষ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কেউ কেউ উক্ত কুৎসায় বিশ্বাসী হল। নবম মাসে চিঞ্চা একটি মোটা কাঠ তলপেটে বেঁধে এবং পোকার দংশনে স্বীয় বাহুদ্বয় স্ফাত করে বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হল। তখন বুদ্ধ ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যদিগকে ধর্মোপদেশ দিতেছিলেন। চিঞ্চা গিয়ে সকলের সম্মুখে বুদ্ধকে বলল, "হে মহাগুরো, আপনি অনেককে ধর্মশিক্ষা দেন। আপনার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট এবং আপনার ওষ্ঠদ্বয় সুকোমল। আপনার সঙ্গে সহবাস করে আমি সন্তান-সম্ভবা হয়েছি এবং আমার প্রসূতিকাল আসন্ন। আপনি আমার জন্য কোন প্রসবাগার ও ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করেন নি। আপনি যদি নিজে তা না করতে পারেন তার জন্য আপনার কোন শিষ্য কোশলরাজ, অনাথপিণ্ডদ বা বিশাখাকে নিযুক্ত করেন না কেন? আমার মনে হয়, আপনি রমণীকে প্রলোভিত করতে জানেন, কিন্তু ঔরসজাত নবশিশুর জন্য সুব্যবস্থা করতে পারেন না।" এই সকল কথা শুনে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী

নির্বাক্ রইলেন! বুদ্ধ উপদেশ বন্ধ রেখে স্তব্ধ গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, 'ভগিনী, তুমি যা বলেছ তা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক আমরা উভয়ে জানি।" চিঞ্চা চীৎকার করে কাশ্‌তে কাশ্‌তে বললে, "হাঁ গুরো! এই গুপ্ত তথ্য আমরা দুই জনে ছাড়া আর কে জানতে পারে?" জোরে কাশ্‌তে কাশ্‌তে তার তলপেট থেকে মোটা কাঠের আবরণটা খুলে পড়ে গেল তার পায়ের উপর। তখন সমবেত শ্রোতৃমণ্ডল তাকে পাথর ছুঁড়ে ও লাঠি মেরে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিল। এইরূপে সঙ্গে সঙ্গেই তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল। কঠোর পাপের শাস্তি অচিরেই হয়।

পূরণ কাশ্যপ, মস্করী গোশাল, অজিত কেশ-কম্বল, ককুধ কাত্যায়ন, সঞ্জয় বেলাস্থিপুত্র ও নির্গ্রন্থ নাথপুত্র—এই ছয় জন উপাধ্যায় তীর্থিক তৎকালীন ধর্মসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। তাঁরা ষট্‌তীর্থকর বলে পরিচিত। সঞ্জয়ের দুই প্রধান শিষ্য শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এরা মগধরাজ বিম্বিসার ও কোশলরাজ প্রসেনজিতের কাছে বুদ্ধের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনেছিলেন, কিন্তু তাতে কোন ফলোদয় হয় নি। বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তিতে ছিলেন তখন তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র করেন ও অপবাদ রটান। ক্রমে সব ষড়যন্ত্র বেরিয়ে পড়ে ও অপবাদ সর্বৈব মিথ্যা বলে স্বতঃই প্রমাণিত হয়। এতে তাঁরা সমাজে হেয় বলে প্রতিপন্ন হন। অবশেষে তাঁরা অগত্যা হার মেনে নিতান্ত দীন হীন ভাবে কাল কাটাতে লাগলেন। প্রবাদ আছে, তাঁদের অগ্রণী পূরণ কাশ্যপ জলে ডুবে আত্মহত্যা করেন।

ধর্মগুরু বুদ্ধদেব

বশিষ্ট ও ভরদ্বাজ

একদা তথাগত বহু শিষ্য সহ কোশলরাজ্য ভ্রমণ করতে করতে মনসাকৃত গ্রামে উপনীত হলেন। সে গ্রামে পুষ্করসাতী, তারুখ্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ বাস করতেন। তথায় তিনি অচিরাবতী নদীতীরে এক আম্রবনে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করেন।

তখন দুটী ব্রাহ্মণ যুবক বশিষ্ট ও ভরদ্বাজ তাঁর কাছে এলেন। তাঁরা উভয়ে সত্যান্বেষী; কিন্তু ধর্মচর্চায় উভয়ের মধ্যে মতভেদ ঘটেছে। তন্মধ্যে বশিষ্ট তথাগতের চরণে প্রণত হয়ে নিবেদন করলেন, "হে মহাত্মন্, কোন্ ধর্মপথটি ঠিক এই সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে ঘোর তর্ক হয়েছে, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারি নি। ব্রাহ্মণ পুষ্করসাতী আমাকে উপদেশ দিয়েছেন, ব্রহ্মের সাথে মিলিত হওয়াই আমাদের চরম লক্ষ্য। আমার মতে সেইটি মুক্তি-মার্গ, সত্যপথ। আর ভরদ্বাজ বলেন, ব্রহ্মবাদী তারুখ্য যে ধর্মপথ নির্দেশ করেছেন তাহাই সত্যমার্গ। হে সুগত। লোকে আপনাকে জগদ্‌গুরু তথাগত বলে জানে। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, এই উভয় পথের মধ্যে কোন্‌টী সত্য? এই ভিন্ন ভিন্ন পথ কি সবই সত্য? এই মনসাকৃত গ্রামে নানা দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা এসে মিলেছে। তদ্রূপ বিভিন্ন ধর্মপথ কি আমাদিগকে একই গম্য স্থানে নিয়ে যায়? সকল পথ কি সরল ও সত্য?"

তথাগত দুই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের বিবেচনায় এই সব পথ কি সরল ও সত্য? দুইজনে উত্তর দিলেন, 'হাঁ, আমরা তাই মনে করি।' বুদ্ধদেব পুনরায় প্রশ্ন করলেন. 'আচ্ছা, বলত সেই দেবজ্ঞ ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেউ

ব্রহ্মকে দেখেছেন?" উত্তর—না। প্রশ্ন—তাঁদের গুরুদের মধ্যে কি উ ব্রহ্মলাভ করেছেন? উত্তর—না। প্রশ্ন—অষ্টক, বামক, বামদেব, বামিত্র, জমদগ্নি, অঙ্গিরস, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু প্রভৃতি অনেক দিক ঋষির নাম শুনা যায়! তাঁদের মধ্যে কেউ কি স্বীকার করেছেন, আমি জ্ঞ?

ব্রাহ্মণদ্বয় ইহার উত্তরে পুনরায় না বলায় তথাগত দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁদিগকে ঝালেন।—মনে কর, এই চৌরাস্তার মধ্যে কোন ব্যক্তি একটি সিঁড়ি নির্মাণ রছে। কোন বাড়ীতে উঠবার জন্যই সেই সিঁড়ি তৈয়ার হচ্ছে। লোকে কে জিজ্ঞাসা করল, "সেই বাড়ী কোথায়, যাতে ওঠবার জন্য এই সিঁড়ি র্মাণ করছ? সেই বাড়ী পূর্বে, পশ্চিমে, দক্ষিণে না উত্তরে? ইহা ছোট কি ? ইহা প্রাসাদ, না কুটীর?" ইহার উত্তরে যদি নির্মাতা বলেন, আমি সেই ড়ী জানি না তাহলে লোকে তাকে উপহাস করে বলবে, যে বাড়ীতে উঠতে ও সে বাড়ী কোথায় জান না, অথচ তার জন্য সিঁড়ি নির্মাণে ব্যস্ত হয়েছ। া কি পাগলের প্রলাপ নয়?

দুই ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, তার সে কার্য প্রলাপ বলেই গণ্য হবে। তখন বললেন, "ব্রহ্ম বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাঁদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ই সেই ব্রহ্মলাভের পথ তাঁরা কি করে দেখাতে পারে? তাঁদের ব্রহ্মোপদেশের কোন সার্থকতা আছে? অন্ধ দ্বারা যেমন অন্ধ নীয়মান হয় তেমনি তাঁদের রা অজ্ঞ লোকে চালিত হচ্ছে। অগ্রগামী গুরুও অন্ধ এবং পশ্চাদ্‌গামী শিষ্যও ন্ধ। ধর্মপথে এইরূপ অন্ধ দলই সাধারণতঃ চলে থাকে। যখন বক্তাও অন্ধ বং শ্রোতাও অন্ধ তখন সত্যলাভ অসম্ভব। সুতরাং অতত্ত্বজ্ঞ বেদবিৎ ব্রাহ্মণের পদেশ সারহীন ও প্রেরণাশূন্য।"

"শোন বশিষ্ঠ, শোন ভরদ্বাজ, তোমাদিগকে আর একটি গল্প বলি। কেউ দি বলে, এই নগরের মধ্যে একটি পরমা সুন্দরী নারীর জন্য আমার চিত্ত চঞ্চল য়েছে, তার প্রতি আমার প্রেম ও প্রীতি প্রগাঢ়। লোকে তাকে জিজ্ঞাসা রবে, "যে সুন্দরী রমণীর জন্য তোমার হৃদয় এত উতলা হয়েছে সে ব্রাহ্মণ,

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কি শূদ্র? সে কৃষ্ণকায়, কি গৌরবর্ণ? তার নাম কি ও নি কোথায়?" তদুত্তরে যদি সে বলে, আমি তার সম্বন্ধে কিছুই জানি না তা লোকে কি তাকে উন্মাদ ভাবে না? তার কথা লোকে আদৌ বিশ্বাস ক না। পুনরায় মনে কর, এই অচিরাবতী নদী বন্যার জলে ভরে গেছে, তীরের উপর জল উঠছে। এমন সময় একজন কোন কার্যবশতঃ যদি পরপ যাবার ইচ্ছা করে, সে যদি নদীকে ডেকে বলে, 'হে নদী, তোমার ওপারটা আ কাছে তুলে নিয়ে এস, তাহলে তার কামনা কি সিদ্ধ হবে? ব্রাহ্মণেরা উ দিলেন, হে গৌতম, তা কখনই হতে পারে না।

তখন বুদ্ধ বললেন, "তোমাদের উপদেষ্টা ব্রাহ্মণদের অবস্থাও তদ্রূপ। সকল সদ্‌গুণে যথার্থ ব্রাহ্মণ ভূষিত হয় তা তাঁদেয় মধ্যে নেই। যে স আচরণে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষিত হয় তা হতে তারা বিরত। অথচ তারা ই সোম, বরুণাদি দেবতাকে চীৎকার করে ডাকে। এইরূপ প্রার্থনার কি ফ ধর্মসাধন না করলে ইহলোকে বা পরলোকে ব্রহ্মলাভ হবে না। আ যে ব্যক্তি প্লাবিত নদী পার হতে চায তার কথাই ধর। যদি হাত-পা কঠোর শৃঙ্খলে বাধা থাকে সে যদি নদী পার হতে চায় তার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে?" ব্রাহ্মণরা উত্তর দিলেন, হে বুদ্ধ, তা কখনো হ পারে না।

তখন বুদ্ধদেব কহিলেন, 'আমাদের ধর্মশাস্ত্রে কাম, হিংসা, অহঙ্কার, আ ও ধর্মে সংশয়—এই পাঁচটিকে পঞ্চ পাশ বলেছে। এই পঞ্চ পাশে বে ব্রাহ্মণরা আবদ্ধ। তাদের ব্রাহ্মণত্ব না থাকায় তারা নামে মাত্র ব্রাহ্মণ; কিন্তু ও কর্মে অব্রাহ্মণ। তাই তাঁরা মৃত্যুর পুর্বে বা পরে ব্রহ্মলাভে সমর্থ হবে না। বশিষ্ঠ, হে ভরদ্বাজ, বয়স্ক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের মুখে তোমরা ব্রহ্মের স্বরূপ কি শুনেছ ব্রহ্মের কি ধন-সম্পদ বা স্ত্রী পুত্রাদি আছে? উত্তর—না। প্রশ্ন—ব্রহ্ম কি ক ক্রোধে বিচলিত হন। উত্তর—না। প্রশ্ন—তিনি কি দ্বেষ-হিংসার বশীভূত তিনি কি মদ মাৎসর্য বা আলস্যের অধীন? উত্তর—না। প্রশ্ন—তিনি সংয না ব্যসনী? উত্তর—সংযমী।

তিনি বিশুদ্ধ-স্বরূপ, না অশুদ্ধস্বভাব? উত্তর—তিনি বিশুদ্ধস্বরূপ। তখন বললেন, 'ব্রাহ্মণ চরিত্র কি ব্রহ্মস্বরূপের বিপরীত নয়? যদি তাই উভয়ের মধ্যে ঐক্যলাভ কিরূপে সম্ভব? প্রশ্ন—ব্রাহ্মণরা কি ধনসম্পদ পুত্রপৌত্রাদি নিয়ে থাকেন না? উত্তর—হাঁ। প্রশ্ন—তাঁরা কি কামাসক্ত ক্রোধাধীন নহেন? উত্তর—হাঁ। প্রশ্ন—তাঁরা কি দ্বেষ-হিংসা-বর্জিত? ত্তর—না। প্রশ্ন—তাঁরা সংযমী না বিলাসী? উত্তর—বিলাসী। প্রশ্ন—দের হৃদয় পবিত্র না কলুষিত? উত্তর—কলুষিত। বুদ্ধদেব বললেন, যখন হ্মণরা এই সকল অসদ্‌গুণে সম্পন্ন আর ব্রহ্ম ইহার বিপরীত-ধর্মা তখন ভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়? আমি সত্য বলছি, এই সকল ব্রাহ্মণের পদেশ ব্যর্থ এবং তাদের ত্রয়ী বিদ্যা পথশূন্য অরণ্য বা নির্জলা মরুভূমিতুল্য। দের লক্ষ্য এক, কিন্তু কার্য ভিন্ন। তারা যে উপদেশ দেয় তাহা স্বয়ং াচরণ করে না; সেইজন্য পথহারা পথিকের ন্যায় দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায়, লক্ষ্য স্ল পৌঁছিতে পারে না।"

বুদ্ধদেবের উপদেশ শুনে বশিষ্ঠ বল্‌লেন, "হে ভগবন্! আমরা শুনেছি, ক্যমুনি ব্রহ্মলাভের পথ সম্যক্ অবগত। আমরা আপনার নিকট ব্রহ্ম-লনের উপদেশ শুনতে চাই। কৃপাপূর্বক আমাদিগকে মুক্তিমার্গ প্রদর্শন ন, ব্রহ্মকে ব্যাখ্যা করুন। বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করলেন, যে এই মনসাকৃত মে জন্মেছে ও এখানে সারা জীবন বাস করেছে সে কি এই গ্রামের সব ঘাট বলে দিতে পারে না? উত্তর—অবশ্যই পারে। বুদ্ধ বশিষ্ঠ ও দ্বাজকে এই উপদেশ দিলেন, "ইহলোকে বুদ্ধ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। তিনি াগত, মঙ্গল-নিকেতন। তিনি সর্বজ্ঞ, জগদ্‌গুরু। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল, া, নর, ভূত ও প্রেত এবং চরাচর প্রাণিজগৎ তিনি অবগত আছেন। নিই সত্য ধর্মবেত্তা ও সত্য ধর্মবক্তা। তিনি যে ধর্ম উপদেশ দেন তাহা দিতে মধুর, মধ্যে মধুর ও অন্তে মধুর। যখন কোন গৃহস্থ, উচ্চবংশীয় হোক বা কুলজাত হোক, বুদ্ধ-বাণী শোনে ও বিশ্বাস করে সে মুক্তিপথের পথিক হতে সে মস্তক মুণ্ডন করে ও গৈরিক বসন পরে সন্ন্যাস-ধর্মে দীক্ষিত হয়

সাধু বায়ুবৎ মুক্ত জীবন যাপন করেন। মুমুক্ষু সন্ন্যাসীর সঙ্কল্প শুভ, চরিত্র ও ইন্দ্রিয় সংযত। আত্মনির্ভরই তার প্রধান যষ্টি। সুগভীর ভেরীনি আকাশে উঠে যেমন সহজে দশ দিক প্রতিধ্বনিত করে সাধুর মৈত্রীও তে বিশ্বব্যাপ্ত হয়। ছোট-বড, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র সকলের প্রতি তার স প্রীতি। সর্বভূতে তার মমতা সমভাবে বিস্তৃত। ব্রহ্মলাভের, বোধিপ্রা ইহাই একমাত্র পথ। বৈদিক ব্রহ্ম ও বৌদ্ধ বোধি অভিন্ন বস্তু। যিনি অ মুক্তিমার্গে চলেন তিনি দেহান্তে ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। ইহা সর্বতোভ সম্ভব।

তথাগতের উপদেশ সমাপ্ত হলে ব্রাহ্মণদ্বয় তাঁর চরণে প্রণত হয়ে নি কবলেন, "হে প্রভো! আপনার কাছে এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পেয়ে আ ধন্য হলাম। যাহা অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল তাহা আলোকে প্রকাশিত হ আপনি বিপথগামী আমাদিগকে সৎপথ দেখালেন, অন্ধকারে প্রদীপ দে অন্ধদিগকে চক্ষুদান করলেন। আমরা আজ হতে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের নিলাম।"

ব্রাহ্মণ শৃগাল

যখন তথাগত রাজগৃহের নিকটবর্তী বেণুবনে অবস্থান করতেছিলেন একদিন পথে গৃহী ব্রাহ্মণ শৃগালের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। শৃগাল করজে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, উর্ধ ও অধো দিকে ঘুরতোছলেন। অ এড়াবার জন্য পূর্বপ্রচলিত ধর্মীয় কুসংস্কার অনুসারে তিনি এইরূপ করছি শুনে তথাগত শৃগালকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এইরূপ অদ্ভুত অনুষ্ঠান কেন?' তখন শৃগাল উত্তর দিলেন, "নব গ্রহের উপদ্রব থেকে আমার গৃ রক্ষ করার জন্য আমি এইরূপ কবছি। কিন্তু আপনি একে অদ্ভুত বল কেন? আপনি হয়ত বলবেন, মন্ত্রাদি শক্তিহীন ও নিষ্ফল। কিন্তু আ মনে রাখবেন যে, আমি পিতৃকুলের ধর্মপ্রথা মেনে চলছি। আমার কল্যাণই হবে।" তখন তথাগত বললেন, "হে শৃগাল, তুমি চিরাচরিত

প্রথার অনুসরণ করে ভালই করছ। ভূত, প্রেত ও গ্রহাদির অনিষ্টকর উপদ্রব থেকে তোমার গৃহ, ধন এবং স্ত্রীপুত্রাদিকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য। কুলধর্ম অনুশীলনে আমি দোষ দর্শন করছি না। কিন্তু আমি বলছি যে, তুমি এই অনুষ্ঠানের অর্থ বোঝ না। অর্থ না বুঝে কোন কাজ করলে তার কোন ফল হয় কি? তথাগত তোমার ধর্মপিতা এবং তোমার পিতামাতার মতই তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী। তিনি তোমাকে ছয় দিকের অর্থ বলে দিচ্ছেন।"

এই বলে তথাগত ব্রাহ্মণ শৃগালকে এই উপদেশ দিলেন, "স্বগৃহকে গ্রহাদির উৎপাত থেকে রক্ষা করতে হলে এরূপ রহস্যময় অনুষ্ঠানই যথেষ্ট নয়। সৎকার্য দ্বারা ছয় দিক্ সুরক্ষিত হয়। পূর্বে পিতৃপুরুষদের দিকে, দক্ষিণে গুরুজনদের দিকে, পশ্চিমে স্ত্রীপুত্রাদির দিকে, উত্তরে বন্ধুবান্ধবের দিকে তাকাও। মানুষের সহিত ধর্মীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হলে উর্ধদিক সুরক্ষিত হয়। ভৃত্যাদির প্রতি প্রীতিযুক্ত হলে নিম্ন দিক্ রক্ষা করা যায়। তোমার পিতৃপুরুষগণ এই ধর্মই তোমাকে পালন করতে বলেছেন। উক্ত ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা তোমার কর্তব্যগুলি মনে পড়বে।" ব্রাহ্মণ শৃগাল যেমন তাঁর পিতার প্রতি শ্রদ্ধাভরে তাকাতেন ঠিক তেমনি বুদ্ধদেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে গৌতম, সত্যই আপনি বুদ্ধ, তথাগত, ধর্মগুরু। আমি কি করছিলাম এতদিন তা জানতাম না; কিন্তু আজ তা আপনার কৃপায় অবগত হলাম। অন্ধকারে প্রদীপ জ্বাললে যেমন সব জিনিষ দেখা যায় ঠিক তেমনি গুপ্ত ধর্ম আজ আপনি আমার নিকট প্রকটিত করলেন। আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিলাম।"

সেনাপতি সিংহ

তথাগতের সহিত জৈনবীর সেনাপতি সিংহের কথোপকথন মহাবগ্গ নামক পালি গ্রন্থে পাওয়া যায়। একদা অনেক বিশিষ্ট নাগরিক স্থানীয় সভা-গৃহে মিলিত হন এবং বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের ভূয়সী প্রশংসা করেন। জৈন নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের সভাপতি সিংহ তন্মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ভাবলেন, "শাক্যমুনি সত্যই সম্বুদ্ধ। আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।"

নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ জ্ঞাতপুত্র সমীপে গিয়ে সিংহ জানালেন, 'আমি শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ যেতে ইচ্ছা করি।' জ্ঞাতপুত্র সিংহকে বললেন, "তুমি গৌতমকে দেখতে যেতে চাও কেন?" এই বলে তিনি বুদ্ধের সম্বন্ধে দুই চারিটি অপ্রিয় অসত্য কথা বলে স্বশিষ্যকে তাঁর কাছে যেতে নিষেধ করলেন। তার ফলে বুদ্ধের কাছে যাবার জন্য সিংহের মনে যে ইচ্ছা উদিত হয়েছিল তাহা অন্তর্হিত হল।

আবার তথাগতের প্রশংসা শুনে সিংহের অন্তরে বুদ্ধদর্শনের ইচ্ছা দ্বিতীয় বার জাগ্রত হল। এবারও জ্ঞাতপুত্র তাঁকে বুদ্ধ সমীপে যেতে নিষেধ করলেন। যখন তৃতীয় বার সেনাপতি পদস্থ ব্যক্তিগণের মুখে বুদ্ধের প্রশংসা শুনলেন তিনি ভাবলেন, "সত্যই শ্রমণ গৌতম তথাগত সম্বুদ্ধ। নির্গ্রন্থ জৈনরা আমার কে? তাঁরা আমাকে অনুমতি দিন বা না দিন আমি বুদ্ধের কাছে যাব, তাঁদের অনুমতির অপেক্ষা করব না।"

সেনাপতি সিংহ বুদ্ধের কাছে গিয়ে প্রণামান্তে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভগবন্, আপনি কি কর্মফল অস্বীকার করেন? আপনি কি নৈষ্কর্ম্য শিক্ষা দেন? আপনি কি শূন্যবাদ প্রচার করেন? আপনি কি অনাত্মবাদ ও নাস্তিকবাদ উপদেশ দেন? হে প্রভো! জৈন গুরুদের মুখে আমি এই সকল কথা শুনেছি। তাঁরা কি সত্য বলেন, না আপনার সদ্ধর্ম বিকৃত করে ব্যাখ্যা করেন?" তখন তথাগত উত্তর দিলেন, "দেখ সিংহ, এক দিক দিয়ে দেখলে তারা যা বলে তা সত্য। আর একদিক দিয়ে বিচার করলে তারা যা প্রচার করে তা মিথ্যা। শোন সিংহ, তোমাকে বুঝিয়ে বলি। যে কর্ম, যে বাক্য বা যে চিন্তা অসৎ, আমি তা করতে নিষেধ করি। চিত্তের যে সব অবস্থা অশুভ, অকল্যাণকর তা যাতে না আসে তদ্রূপ করতে আমি উপদেশ দিই। যে কর্ম, বাক্য বা চিন্তা ধর্মভাব উদ্দীপিত করে এবং মানুষকে সৎপথে চালায় আমি তাহাই প্রচার করে থাকি। অসৎ চিন্তা, অসৎ কর্ম বা অসৎ বাক্য পুড়িয়ে ফেলতে আমি শিষ্যগণকে অনুরোধ করি। তালগাছ উপড়ে ফেললে আর তাল ফলে না। তেমনি অসৎ কর্ম, ও বাক্য মন থেকে দূরে

চলে দিলে মানুষের আমিত্ব, অভিমান মুছে যায়। যার আমিত্ব মুছে যায় স বোধিলাভের অধিকারী হয়। হে সিংহ, আমি অভিমান, কাম, বৈরভাব ও মাহাদির বিনাশ শিক্ষা দিই। কিন্তু তিতিক্ষা, প্রীতি, মৈত্রী, সত্যনিষ্ঠা ও ানশীলতা প্রভৃতি ত্যাগ করতে কথনো বলি না। নীতিনিষ্ঠা ও ধর্মানুরাগ জীবনের অমূল্য সম্পদ। সেগুলি আমি অনুশীলন করতে সকলকে প্রেরণা দিই।"

সেনাপতি সিংহ নিবেদন করলেন, "ভগবন্। বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে আমার একটি সন্দেহ এখনো রয়েছে। তথাগত কি কৃপা করে আমার চিত্তাকাশের সন্দেহ-মেঘ দূর করতে সম্মত হবেন এবং আমাকে ধর্ম বুঝতে সাহায্য করবেন?" তথাগতের সম্মতি লাভ করে সিংহ জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভগবন্! আমি একজন সেনাপতি এবং রাজা কর্তৃক তাঁর আইন প্রজাদের মধ্যে কার্য্যকরী করতে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে নিযুক্ত হয়েছি। আপনি অসীম মৈত্রী ও অনন্ত করুণা শিক্ষা দেন। আপনি কি অপরাধীকে শাস্তি দিতে অনুমতি দেন? আর একটি কথা। আমাদের গৃহ, আমাদের স্ত্রী-পুত্র এবং আমাদের ধনসম্পদ রক্ষার্থ যুদ্ধ করা কি আপনার মতে অন্যায়? আপনি কি সম্পূর্ণ শরণাগতি শিক্ষা দেন; যাতে অনিষ্টকারী আমাদের প্রতি যথেচ্ছ আচরণ করিবে? আমাদের সর্বস্ব যারা কেড়ে নিয়ে যেতে চায় তাদের কাছেও কি আমরা আত্মসমর্পণ করব? ধর্ম্য যুদ্ধে যোগদানাদি সকল প্রকার বিরোধ কি আপনার মতে পরিহার্য্য?"

বুদ্ধ উত্তর দিলেন, "যে শাস্তির যোগ্য তাকে নিশ্চয়ই শাস্তি দেবে। যে পাই তাকে নিশ্চয়ই কৃপা করবে। তথাপি বিনা দোষে কাউকে শাস্তি দেওয়া অনুচিত। সর্ব প্রাণীর প্রতি শুধু অহিংসা নয় অসীম মৈত্রী ও অনন্ত করুণা দেখাবে। এই সকল উপদেশ পরস্পর বিরুদ্ধ নয়। কারণ যে স্বীয় অপরাধের জন্য শাসিত হয় সে বিচারকের হিংস ভাবের জন্য কষ্ট ভোগে না, নিজ কর্মদোষে কষ্ট পায়। তাঁর স্বকর্মই উক্ত দণ্ড অর্জন করেছে, যা আইন প্রয়োগকারী কর্তৃক তদনুসার বিহিত হয়েছে। যখন কোন বিচারক অপরাধীকে দণ্ড বিধান

করে সে যেন নিজ মনে অপরাধীর প্রতি কোন বৈর ভাব পোষণ না করে। আবার যে হন্তা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় তারও মনে রাখা উচিত যে, সে স্বকর্মের ফলই ভুগছে। যখন সে বুঝতে পারবে, উক্ত দণ্ড তার আত্মশোধক হবে তখন সে আর স্বীয় দুর্ভাগ্যের জন্য বিলাপ না করে আনন্দিত হবে।"

তথাগত সিংহকে বলতে লাগলেন, 'যে যুদ্ধে মানুষ তার ভাই মানুষকে বধ করতে অগ্রসর হয় তা শোচনীয়। শান্তি স্থাপনের সকল চেষ্টা যখন নিঃশেষে ব্যর্থ হয়, তখন ধর্ম্ম্য যুদ্ধে যোগদান আদৌ নিন্দনীয় নহে। যে যুদ্ধের কারণ সে-ই আসল দোষী। সদ্ধর্মের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ কল্যাণকর। কিন্তু যে মানুষ বা দেবতা বা প্রাকৃতিক শক্তি অমঙ্গল বিধান করে তার কাছে আত্মসমর্পণ অন্যায়, অধর্ম। সংসারে সংগ্রাম অপরিহার্য; কারণ প্রত্যেক জীবনে কোন না কোন প্রকার সংগ্রাম চলছেই চলছে। মানব জীবন সংগ্রাম-সঙ্কুল। তবে সত্য ও ধর্ম রক্ষার্থে সংগ্রামই বিধেয়। যে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সংগ্রামরত হয় এবং যশস্বী, সম্পন্ন ও শক্তিমান বা বড় হবার জন্য সংগ্রাম করে সে কো: ফল পায় না। যে ধর্ম ও সত্যের জন্য সংগ্রাম করে সে মহাফলের অধিকারী হয়। কারণ এমন কি, তার পরাজয়ও বিজয়তুল্য সুফল প্রসব করে স্বার্থ ক্ষুদ্র, ভঙ্গুর এবং মহান সাফল্য লাভের যোগ্য পাত্র নয়। স্বার্থবশে য করা যায় তাতে নিজের ও অপরের অনিষ্টই হয়। যেমন সাবান-ফেনার বুদ্বুদ জলের উপরে ক্ষণকাল মাত্রই ভাসে তেমনি স্বার্থ-দুষ্ট কর্মের ফল ক্ষণকাল মাত্রই স্থায়ী হয়। পরার্থে যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহা অগ্রে ও পশ্চাতে উভয়ত কল্যাণকর। সত্য পরম কল্যাণের সুযোগ্য পাত্র। সত্যনিষ্ঠ সাধক অমৃত জীবন যাপন করেন।"

"হে সিংহ, যে যুদ্ধে যায় এবং সে যুদ্ধ যদি ধর্ম্ম্য যুদ্ধও হয় সে শত্রু দ্বারা নিহত হবার জন্য যেন সদা প্রস্তুত থাকে। কারণ যোদ্ধার তাহাই অদৃষ্ট। কিন্তু সে যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ ধর্ম্ম্য যুদ্ধে নিহত হয় তাতে কিছু মাত্র পরিতাপ নেই। আবার যে যুদ্ধে জয়ী হয় তারও মনে রাখা উচিত যে পার্থিব বস্তুমাত্রই অস্থায়ী। তার সাফল্য যতই চমকপ্রদ হোক না কেন

াগ্যচক্রের পরিবর্তনে সে আবার ধরার ধূলায় ধূসরিত হতে পারে। কিন্তু যে জেকে সুশান্ত ও সংযত রাখে এবং চিত্ত থেকে সকল হিংসা বিদূরিত করে বং পদদলিত শত্রুকে বুকে তুলে নিয়ে বলে, 'এস ভাই, আমরা উভয়ে শান্তি পন করি এবং পরস্পর ভ্রাতৃতুল্য হই' সে অমর বিজয় লাভ করে। সে জয়ের সাফল্য নশ্বর নয়; কারণ সে সাফল্য চিরস্থায়ী হবে। হে সিংহ, জয়ী সেনাপতি নিশ্চয়ই মহান্। কিন্তু আত্মজয়ী সাধক মহত্তর বিজয়ী।

"আত্মজয়ের দ্বারা আমি আত্মনাশ শিক্ষা দিই না। আত্মজয়ের দ্বারা াত্মরক্ষা সর্বাপেক্ষা উত্তম। যে স্বার্থান্ধ বা স্বার্থদাস তদপেক্ষা নিঃস্বার্থপর াত্মজয়ী পুরুষ বেঁচে থাকতে, সাফল্যমণ্ডিত হতে এবং জয়লাভ করতে র্বাপেক্ষা উপযোগী। যে আত্মজয়ী সে-ই জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়। সে জীবন-দ্ধে কখনো হার মানে না। যার উদ্দেশ্য সৎ ও ন্যায্য সে কখনো বৈফল্যে ড়ে না। সে সর্বকার্যে সাফল্যলাভ করে এবং তার সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয়। স্বহৃদয়ে সত্যনিষ্ঠা পোষণ করে সে কখনো জীবন-যুদ্ধে বিফল হয় না, ত্যু কখনো তাকে অতিক্রম করতে পারে না। কারণ সে অমৃতসাগরের লিল পান করেছে। হে সেনাপতি, তুমি সাহসভরে সংগ্রাম কর এবং হাপরাক্রমে যুদ্ধ চালাও। কিন্তু তুমি সত্য ও ধর্মের যোদ্ধা হও। তাহলে থাগতের আশীর্বাদ তোমার উপর শত ধারায় বর্ষিত হবে।"

যখন তথাগত এইরূপ উপদেশ দিলেন তখন সিংহ সানন্দে বলে উঠলেন হে ভগবন্! আপনার উপদেশ অমৃততুল্য! আপনার বাণী অপূর্ব। আপনি ত্যই সম্বুদ্ধ, আপনিই যথার্থ জগদগুরু। আপনি অভিনব মুক্তিমার্গ গৎকে দেখিয়েছেন। আপনার ধর্ম যে অনুশীলন করবে তার জীবন-পথ দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হবে। সে নিশ্চয়ই চিরশান্তি ও পরম তৃপ্তির অধিকারী বে। আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিলাম। তথাগত কৃপা করে চিরতরে আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন, আপনার চরণে আশ্রয় দিন।"

তথাগত বললেন, 'হে সিংহ, তুমি কি করছ তা প্রথমে বিচার কর! অবশ্য তোমার মত পদস্থ ব্যক্তি যথাযোগ্য বিবেচনা ব্যতীত কোন কিছুই করে না।'

ইহাতে সিংহের বিশ্বাস শত গুণে বর্ধিত হল। তিনি উত্তর দিলেন, "হে ভগব অন্য কোন ধর্মগুরু আমাকে শিষ্যরূপে পেতে সমর্থ হলে তারা সমগ্র বৈশা নগরে বিচিত্র পতাকাদি নিয়ে ঘোষণা করতেন।" তখন তথাগত িংহে বললেন, "দীর্ঘ কাল ধরে তোমাদের বাড়ীতে নিগ্রন্থ জৈন সাধুদিগকে ভি দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে যখন তাঁরা তোমার বাড়ীতে ভিক্ষাটনে আসবে তখন তাহাদিগকে ভিক্ষা দেওয়া পুণ্য মনে করবে।" এই কথা শুনে সিংহে হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হল। তিনি সানন্দে বলে উঠলেন, "হে ভগবন্, আ লোক-মুখে শুনেছি, শ্রমণ গৌতম বলেন, 'কেবল আমাকেই ভিক্ষাদি দেবে এ অন্য সাধুকে ভিক্ষা দেবে না। আমার শিষ্যরাই দান গ্রহণ করবে, অন্য কা শিষ্যরা নয়।' কিন্তু তথাগত আমাকে আজ্ঞা করছেন নিগ্রন্থ সাধুদিগকে ভিক্ষা দিতে। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। সেনাপতি সিংহের অনুচরবগে মধ্যে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি সিংহ ও বুদ্ধের মধ্যে কথো কথন মন দিয়ে শুনলেন। তাঁর মনে কিছু সন্দেহ থেকে গেল। তিনি বুদ্ধে কাছে এসে বললেন, "হে ভগবন্, এই কথা রাষ্ট্র হয়েছে যে, আপনি আত্ম অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। যারা এই কথা বলে বেড়ায় তারা কি সত্য ব না আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটায়?" তথাগত উত্তর দিলেন, "তারা যা ব তা এক পক্ষে সত্য; কিন্তু অন্য পক্ষে মিথ্যা। তথাগতের মতে জীবাত্ম পারমার্থিক সত্ত্বা নেই। যারা বলে জীবাত্মাই পরমার্থতঃ নিত্য তারা ভু বলে। পরমাত্মাই নিত্য, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। সুতরাং তিনি চিন্তার মন্তা কর্মের কর্তা বা ভোগ্যের ভোক্তা হতে পারেন না। দেহ, মন ও বুদ্ধি আত্ম উপাধিমাত্র ও অনিত্য। এদের ত্রিকালাবাধিত অস্তিত্ব নেই। মন বুদ্ধ্যাদির সহযোগে আত্মা কর্তা ও ভোক্তা হন।" তখন সেই উচ্চপদস্থ কর্মচা জিজ্ঞাসা করলেন, "তবে কি তথাগত দুটি সত্ত্বা স্বীকার করেন—একটা ব্যবহারি সত্ত্বা, অন্যটি পারমার্থিক সত্ত্বা।" তথাগত উত্তর দিলেন, "হাঁ, তুমি ঠিক বলেছ দেহ মন ও বুদ্ধ্যাদি পঞ্চ স্কন্ধের ব্যবহারিক সত্ত্বামাত্রই আছে। কারণ, সেগু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। কিন্তু যে সত্ত্বা দ্বারা এই অনন্ত বিশ্ব যন্ত্রিত হয় তা পারমার্থি

ইন্দ্রিয়াতীত। এই জ্ঞানকে বোধি বা ব্রহ্ম বলে। বোধি লাভ করলে ানুষ ঋষি হয়, বুদ্ধ হয়। অষ্টাঙ্গ ধর্মপথে চল্লে প্রত্যেকেই ঋষিত্ব, বুদ্ধত্ব, লাভ রতে পারে। ঋষিত্ব বা বুদ্ধত্বলাভে সর্বশ্রেণীর নরনারীর জন্মগত অধিকার াছে

ব্রাহ্মণ কূটদন্ত *

দানমতি গ্রামে ব্রাহ্মণদের অধিপতি ছিলেন কূটদন্ত। একদিন তিনি থাগতের সমীপবর্তী হয়ে সশ্রদ্ধ অভিবাদনান্তে বললেন, "হে শ্রমণ, আমি নেছি, আপনি সর্বজ্ঞ বুদ্ধ। কিন্তু যদি আপনি বুদ্ধ হন তাহলে কি রাজার মত র্যশালী ও শক্তি ভূষিত হয়ে আপনার আসা উচিত নয়?" তদুত্তরে তথাগত লেন, "তোমার চক্ষুদুটি দৃষ্টিহীন। যদি তোমার মানস চক্ষু দৃষ্টিসম্পন্ন হতো হলে তুমি সত্যের শক্তি ও মহিমা দেখতে পেতে।" তখন কূটদন্ত বললেন, াপনি যদি আমাকে সত্য দেখান তাহলে আমি সত্য দেখতে পাব। কিন্তু পনার বাণীতে সামঞ্জস্য নেই। যদি আপনার বাণী সুসমঞ্জস হত তাহলে া দাঁড়াতে পারত। উহা অসমঞ্জ। বলে চিরস্থায়ী হবে না।' তথাগত উত্তর লেন, 'সত্য কখনো নষ্ট হয় না।'

কূটদন্ত বললেন, 'আমি শুনেছি আপনি নীতিশিক্ষা দেন; কিন্তু ধর্ম ধ্বংস রন। আপনার শিষ্যেরা ধর্মানুষ্ঠান অবজ্ঞা করে এবং বলিদান ত্যাগ করে। ন্তু একমাত্র যজ্ঞাদির দ্বারাই দেবতাদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শিত হয়। যজ্ঞানু- া এবং বলিদানেই ধর্মতত্ত্ব নিহিত। তখন বুদ্ধ বললেন, বৃষ ও ছাগাদি বলিদান পক্ষা আত্মোৎসর্গই উৎকৃষ্টতর। যে তার অসদ্ বাসনাগুলি দেবতাদের ছে উৎসর্গ করে সে যূপ-কাষ্ঠে প্রাণিহত্যার অনুপযোগিতা বুঝতে পারে।

* R. Spence Hardy প্রণীত A Manual of Buddhism পুস্তকে গল্পটী আছে।

পশুরক্তের শোধনী শক্তি নেই। কিন্তু কামচিন্ত উৎপাটন দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হ
দেবপূজা অপেক্ষা ধর্মনীতি পালন শ্রেষ্ঠতর।”

ধর্মপ্রাণ কূটদন্ত স্বীয় আত্মার ভবিষ্যৎ কল্যাণ সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে অসং
পশু বলি দিয়েছিলেন। রক্তপাত দ্বারা আত্মশুদ্ধির মূঢ়তা এখন তিনি দেখ
পেলেন। তথাগতের উপদেশে পরিতৃপ্ত না হয়ে কূটদন্ত বলতে লাগলেন,
ধর্মগুরো। আপনি জীবাত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন। আপনার ম
জন্ম মৃত্যুর চক্রে জীবাত্মা ভ্রামিত এবং কর্মাধীন হয়। মানুষ যেমন কর্ম ক
তেমনি ফল পায়। তথাপি আপনি আত্মার অনস্তিত্ব শিক্ষা দেন। আপন
শিষ্যেরা সম্পূর্ণ আত্মনাশকে নির্বাণের পরম সুখ বলে প্রশংসা করে। যদি আ
সংস্কার সমূহের সংহতি মাত্র তাহলে মৃত্যুর পরে আমার অস্তিত্ব নাশ হ
যদি আমি বেদনা, বিজ্ঞান ও সংজ্ঞার সমষ্টিমাত্র তাহলে দেহপাতান্তে আম
গতি হবে কি করে?”

তথাগত বললেন, “হে ব্রাহ্মণ, তুমি ধর্মপ্রাণ ও চিন্তাশীল। তোমার আ
সম্বন্ধে তুমি গভীরভাবে চিন্তিত। তথাপি তোমার কর্ম্ম নিষ্ফল। কা
একটি অত্যাবশ্যক বিষয় তোমার অজ্ঞাত। পরমাত্মার পুনর্জন্ম নেই। কি
জীবাত্মা এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহে প্রবেশ করে এবং জন্ম-মৃত্যুর অধীন হ
শিক্ষক যে শ্লোকটি উচ্চারণ করে সেটি তদাবৃত্তিকারী শিষ্যে পুনর্জাত হ
মন ও বুদ্ধি সংসরণশীল ; কিন্তু আত্মা নহে। সর্ব দেহে এক পরমাত্মা বিরাজি
কিন্তু লোকে ভ্রমবেশে দেহে দেহে পৃথক্ আত্মা অনুভব করে।”

“হে ব্রাহ্মণ, তোমার হৃদয় এই ভ্রমে ভ্রান্ত। তুমি স্বর্গ-সুখের অভিলাষী
তাই তুমি চরম সত্যের সন্ধান ও আনন্দ পাচ্ছ না। অতি নিশ্চয় জানবে
তথাগত মৃত্যু শিক্ষা দেয় না, জীবনই শিক্ষা দেয়। মরণে এই দেহ পঞ্চভূ
বিলীন হবে। শত যজ্ঞও উহার বিলয় বন্ধ করতে পারবে না। সুতরাং অ
অমৃত জীবন আকাঙ্ক্ষা কর। যেখানে স্বার্থ থাকে সেখানে সত্য আসে ন
আবার সত্য এলে স্বার্থ পালায়। তোমার চিত্ত সত্যে স্থির কর। সত্যালো
পেয়ে ধন্য হও। সত্যে অমর জীবন লাভ কর।”

স্বার্থই মৃত্যু, সত্যই জীবন। স্বার্থকে আঁকড়ে ধরলে নিরন্তর মরণ
গ করতে হয়। সত্যে স্থিত হলে নির্বাণের আনন্দ অনুভূত হয়!
াণে অমর জীবনের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়।

কূটদন্ত—হে ভগবন্. নির্বাণ কোথায়?

তথাগত—যেখানে সুনীতি সর্বদা আচরিত হয় তথায় নির্বাণ বিরাজ
র।

কূটদন্ত—আমি আপনার কথা ঠিক বুঝেছি কি? যদি আমি বলি, নির্বাণ
ন একটি স্থান নয় এবং স্থানহীন বলে ইহার কোন সত্তা নেই?

তথাগত—তুমি আমার কথা ঠিক বোঝনি। এখন শোন এবং আমার
গুলির উত্তর দাও। বায়ু কোথায় বাস করে?

উত্তর—কোথাও না।

তথাগত—(উপহাসচ্ছলে) তবে বায়ু বলে কোন বস্তু নেই?

কূটদন্ত—(নিরুত্তর রইলেন।)

তথাগত—হে ব্রাহ্মণ, বলতে পার প্রজ্ঞা কোথায় বাস করে? প্রজ্ঞার
ন দৈশিক অস্তিত্ব আছে কি?

কূটদন্ত—প্রজ্ঞা বা বোধির কোন নির্দিষ্ট বাস-স্থান নেই।

তথাগত—নির্বাণের কোন স্থানগত অস্তিত্ব নেই বলে কি তুমি বলতে চাও
বোধি নেই, বুদ্ধত্ব নেই, ধার্মিকতা নেই এবং মুক্তি নেই? যেমন
াল বিশাল বাত্যা দিনের উত্তাপের মধ্যেও পৃথিবীর উপর দিয়ে বয়ে যায়
মনি তথাগত মৈত্রীসম্পন্ন হয়ে মানব-জাতির মনসমূহ প্রভাবিত করেন।
র মৈত্রী এত শীতল, এত মধুর, এত প্রশান্ত, এত সূক্ষ্ম যে, তার স্পর্শ
কবার পেলে কেউ ভুলতে পারে না। যারা ত্রিতাপে সন্তপ্ত তাদের সন্তাপও
াগতের পূতস্পর্শে বিদূরিত হয় এবং তাঁরা প্রাণপ্রদ মলয় বায়ু-স্পর্শে সঞ্জীবিত
।

কূটদন্ত—হে ভগবন্, আমি অনুভব করি যে, আপনি এক মহাবাণী
ষণা করছেন। কিন্তু আমি তা ধরতে পারছি না। একটু ধৈর্য ধরে

আমার এক প্রশ্নের উত্তর দিন। হে ভগবন্, আপনি আমাকে বলুন, য আত্মা না থাকে তাহলে অমৃতত্ব কি করে সম্ভব ?

তথাগত—আমাদের চিন্তন চলে যায়; কিন্তু চিন্তা থাকে। বিচ বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু বোধি থাকে।

কূটদন্ত—তা কি করে হয় ? বিচার ও জ্ঞান কি একই নয় ?

তথাগত—(নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত দিযে উভযের পার্থক্য ব্যাখ্যা করলেন।) য কেউ রাত্রিতে কোন চিঠি পাঠাতে চায সে তার কেরাণীকে ডেকে অ আলো জ্বালায এবং চিঠি লেখায। চিঠি লেখা শেষ হলে সে আলে নিবিযে দেয। আলোটি নিবে গেলেও লেখাটি থেকে যায। এইরূপে বি বন্ধ হলেও জ্ঞান থাকে। ঠিক তেমনি মনের ক্রিযা বন্ধ হযে যায; ি অনুভূতি, প্রজ্ঞা এবং সকল কর্মের ফল স্থায়ী হয।

কূটদন্ত—হে ভগবন্, আপনি অনুগ্রহ ক'র বলুন যখন সংস্কার-র বিলীন হয়, তখন আমার আত্মার অভেদ কোথায ? যদি আমার চিন্তার বিকীর্ণ হয এবং আমার আত্মা এক দেহ হতে অন্য দেহে ভ্রমণ করে তাহ আমার চিন্তারাশি বা আত্মা আর আমার থাকে না। একটি উদাহরণ দি আপনি বুঝিযে দিন, আত্মার অভেদ কোথায ?

তথাগত—মনে কর, একজন একটি প্রদীপ জ্বালবে। প্রদীপটি কি স রাত্রি জ্বলবে ?

উত্তর—হাঁ, জ্বলতে পারে।

প্রশ্ন—রাত্রির প্রথম প্রহরে প্রদীপের যে শিখাটি জ্বলে তা কি দ্বি প্রহরে জ্বলে ?

কূটদন্ত ইতস্ততঃ করলেন এবং ভাবলেন হাঁ নিশ্চয়ই একই শিখা জ্বলে কিন্তু কোন গুপ্ত অর্থের জটিলতায় পাছে জড়িযে পড়েন এই ভয়ে যথাযথ হ চেষ্টা করে বললেন, 'না, এক শিখা নয়।'

তথাগত—তাহলে দুটি শিখা জ্বলে—একটি প্রথম প্রহরে, অপর দ্বিতীয় প্রহরে।

কূটদন্ত—না মহাশয়। এক অর্থে ইহা একটি শিখা নয় এবং অন্য অর্থে একই শিখা। একই প্রকার উপাদান পুড়িয়ে একই রকম আলো ন এবং একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

তথাগত—বেশ কথা! একই প্রকার তৈলে পরিপূর্ণ এবং একই কক্ষ লোককারী প্রদীপে যে শিখা কাল জ্বলেছিল এবং আজ জ্বলছে এই উভয় । কি এক?

কূটদন্ত অনুমান করলেন, সেগুলি দিনের বেলায় নিভে গিয়ে থাকবে।

তথাগত—মনে কর, প্রথম প্রহরের যে শিখাটি দ্বিতীয় প্রহরে নিভে ছল সেটি কি আবার জ্বলবে যখন তৃতীয় প্রহরে প্রদীপ জ্বালান হবে?

কূটদন্ত—এক অর্থে ইহা ভিন্ন শিখা, অন্য অর্থে ইহা নয়।

তথাগত—শিখার নির্বাণকালে যে সময় অতিবাহিত হয়েছিল তার সঙ্গে ভেদ বা অভেদের কোন সম্বন্ধ আছে কি?

কূটদন্ত—না মশায়, তা নেই। অনেক বৎসর বা এক মুহূর্ত অতীত হলেও প্রদীপটি ইতোমধ্যে নিবে যাক্ বা না যাক্ ভেদ এবং অভেদ দুইই আছে।

তথাগত—তাহলে আমরা একমত যে, আজকার শিখাটি কালকার শিখার এক অর্থে একই এবং অন্য অর্থে ইহা প্রত্যেক মুহূর্তে ভিন্ন। অধিকন্তু ই প্রকার শিখাগুলি সমভাবে একরূপ কক্ষগুলিকে আলোকিত করলেও অর্থে অভিন্ন নয়!

কূটদন্ত—হাঁ মশায়।

তথাগত—এখন মনে কর এমন এক লোক আছে যে, তোমার মত চিন্তা তোমার মত অনুভব করে এবং তোমার মত কাজ করে। তুমি ও সে একই ব্যক্তি?

কূটদন্ত বাধা দিয়ে বললেন, না তা কি হতে পারে? তখন বুদ্ধ বললেন, কি অস্বীকার কর, যে যুক্তি জাগতিক বস্তুর সম্বন্ধে প্রযোজ্য তা তোমার দ্ধেও প্রযোজ্য। কূটদন্ত চিন্তা করতে লাগলেন এবং ধীরে ধীরে উত্তর ন, না আমি অস্বীকার করি না। একই যুক্তি পৃথিবীর সর্বত্রই প্রযোজ্য।

কিন্তু আমার আত্মা সম্বন্ধে এই বিশেষত্ব আছে যে, ইহা অন্য সমস্ত বস্তু অন্যান্য আত্মা থেকেও স্বতন্ত্র। আর একটি লোক থাকতে পারে, যে ঠিক আমার মত চিন্তা, কাজ ও অনুভব করে। যদিও তার একই নাম একই প্রকার ধন-সম্পদ থাকে সে ও আমি এক হব না।

তথাগত—সত্যই, কূটদন্ত। সে কখনও তুমি হবে না। এখন বল বালক স্কুলে যায় এবং স্কুলের পড়া শেষ করে, এই দুই কি ভিন্ন? যে অ' করে এবং তজ্জন্য শাস্তিরূপে যার হাত পা কাটা যায় এই দুই কি পৃথক্?

উত্তর—না, উভয়ই এক।

প্রশ্ন—তাহলে ধারাবাহিকতায় একত্ব প্রতিষ্ঠিত।

কূটদন্ত—শুধু ধারাবাহিকতায় নয়; কিন্তু প্রধানতঃ চারিত্রিক অভিন্ন দ্বারা।

তখন তথাগত উপসংহার করে বললেন, "বেশ কথা। তাহলে তুমি স্বী করছ যে, একই প্রকার দুটি শিখাকে যে অর্থে এক বলা যায় সেই ব্যক্তিরাও এক হতে পারে। তোমার বোঝা উচিত যে, একই কর্মজাত ও চরিত্রের অন্য এক ব্যক্তি এবং তুমি অভিন্ন।"

কূটদন্ত—আচ্ছা, আমি স্বীকার করছি।

বুদ্ধ বলতে লাগলেন, একমাত্র এই অর্থেই তুমি কাল যেমন ছিলে আজ যেমন আছ তা একই। যে উপাদানে তোমার দেহ গঠিত তাহার তোমার স্বভাব গঠিত নয়। দেহ, ভাবনা ও সংস্কারাদির সমবায় দ্বারা তে প্রকৃতি নির্মিত। সংস্কারের সংহতিতে ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত। যেখানে সেখানেই তুমি। যেখানে তারা যায় সেখানে তুমিও যাও। এইরূপে এক অর্থে তোমার আত্মার অভিন্নতা স্বীকার কর এবং অন্য অর্থে তা কর কিন্তু যে অভিন্নতা স্বীকার করে না, সে সমস্ত অভিন্নতা অস্বীকার করুক বলুক, যে প্রশ্ন করে এবং যে এক মুহূর্ত পরে উত্তর পায়, এই দুই ভিন্ন ব কর্মের দ্বারা যে ব্যক্তিত্ব-ধারা রক্ষিত হয়, তাহা বিবেচনা কর। তুমি কি মৃত্যু এবং বিনাশ বল; অথবা জীবন এবং ধারাবাহিক জীবন বল?

কুটদন্ত উত্তর দিলেন, আমি একে জীবন ও ধারাবাহিক জীবন বলি। ারণ ইহাই আমার অস্তিত্বের প্রবাহ, যদিও আমি সেরূপ প্রবাহ গ্রাহ্য রি না। অন্য অর্থে যে ব্যক্তিত্ব-প্রবাহ আছে আমি তাহাই গ্রাহ্য করি। ারণ ইহা প্রত্যেক মানুষকে একটি ভিন্ন ব্যক্তি করে, সে আমার সহিত ৷ভিন্ন বা ভিন্ন হোক।

তথাগত—তুমি এইটিই কামনা কর এবং ইহাই জীবত্বের আসক্তি। ইহা ৷ান্তি মাত্র। সংহত বস্তু মাত্রই নশ্বর। তারা বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তারা ন্ত্রণাদায়ক। প্রকৃতির এই নিয়ম যে, প্রিয় বস্তুর বিয়োগ এবং অপ্রিয় বস্তুর ংযোগ অবশ্যম্ভাবী। সংহত বস্তুর কোন আত্মা বা অহং নেই।

কূটদন্ত—তা কিরূপে সম্ভব?

তথাগত—তোমার জীবাত্মা কোথায়?

যখন কূটদন্ত কোন উত্তর দিতে পারলেন না, তখন বুদ্ধ বললেন, "যে ীবাত্মাকে তুমি জড়িয়ে ধরেছ সেটা নিরন্তর পরিবর্তনশীল। বহু বৎসর পূর্বে ম একটি ছোট্ট শিশু ছিলে, তারপর বালক হলে, তারপর তরুণ এবং এখন প্রৌঢ় হয়েছ। শিশু ও প্রৌঢ়ের মধ্যে অভিন্নতা আছে কি? এক সঙ্কীর্ণ র্থে অবশ্য এখানে অভিন্নতা স্বীকার করা যায়। বস্তুতঃ রাত্রির প্রথম ও তীয় প্রহরের প্রদীপ শিখাদ্বয়ের মধ্যে অধিকতর অভিন্নতা বিদ্যমান, যদিও ৃতীয় প্রহরে প্রদীপটি নিবে যেতে পারে। এখন গত কালের আত্মা সত্য, া অদ্যকার, না কল্যকার আত্মা সত্য? যে আত্মার রক্ষণার্থ তুমি এত চীৎকার ্রছ সেটি কোন্‌টি?

কূটদন্ত হতভম্ব হলেন এবং বললেন, "হে জগৎগুরো! আমি আমার ভুল দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি এখনো সন্দেহাকুল।"

তথাগত—বিবর্তনের ধারার দ্বারা সংস্কারগুলি উৎপন্ন হয়। ক্রমিক বিকাশ ব্যতীত কোন সংস্কার জাত হয় না। তোমার সংস্কারগুলি পূর্ব পূর্ব ন্মের কর্মফল। সংস্কার সমবায়কে ব্যক্তিত্ব বা জীবাত্মা বলে। যে দিকে ংস্কার-স্রোত প্রবাহিত হয় সে দিকেই জীবাত্মা ধাবিত হয়। তোমার সংস্কার-

স্রোতের মধ্যেই তোমার অস্তিত্ব বিধৃত থাকে। অতীতে ও বর্তমানে তুমি বীজ বপন করেছ তার ফল ভবিষ্যৎ জীবনে ভোগ করতেই হবে।

কূটদন্ত বললেন, "সত্যই ভগবন্, ইহা খুব যুক্তি-সঙ্গত কর্মফল নয়। আ| এখন যে বীজ বপন করেছি তার ফল অন্যে ভোগ করবে এব যৌক্তিক: আমি বুঝতে পারছি না।

মুহূর্তকাল অপেক্ষা করে তথাগর্ত বললেন, "আমার সব বিচার কি বৃ হল ?" এটা তুমি কেন বুঝতে পারছ না যে, অন্যেরাও তুমিই। তুমিই সে ফল ভোগ করবে, যার বীজ তুমি বপন করেছ, অন্যে নহে। এমন এক লোকের কথা চিন্তা কর, যে মন্দভাবে পালিত ও দুরবস্থায় পতিত এবং । মর্মান্তিক কষ্ট পাচ্ছে। বাল্যে সে অলস ও শ্রমবিমুখ ছিল। যখন সে ব হল সে জীবিকা অর্জনের জন্য কোন শিল্পবিদ্যাদি শিখলে না। তুমি কি বলে তার দুঃখ স্বীয় কর্মের ফল নয় ? যদিও সেই বয়স্ক ব্যক্তি ও কুমার বাল সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

তুমি এটা নিশ্চয় জানবে যে, স্বর্গে বা মর্ত্যে এমন কোন স্থান নেই যেখা গেলে সৎকর্ম বা অসৎ কর্মের ফল এড়াতে পারা যায়। সুদীর্ঘ প্রবাসের প কেউ নিরাপদে গৃহে ফিরলে যেমন তার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা প্রতীক্ষ করে তেমনি সৎকর্মের ফলগুলি অনুষ্ঠাতাকে সম্বর্ধনা করে, যখন সে ধর্মপ বিচরণ করতে কবতে বর্তমান জীবন থেকে ভবিষ্যৎ জীবনে প্রবিষ্ট হয়।'

কূটদন্ত—আপনার বাণীর মহিমায় ও অপূর্বতায় আমার বিশ্বাস আছে কিন্তু আমার চক্ষু এখনো সেই সূক্ষ্ম জ্ঞানালোক দেখতে পায়নি। তবে আমি জীবাত্মার নশ্বরত্ব উপলব্ধি করছি এবং আমার মধ্যে সত্য প্রতিভাত হচ্ছে যজ্ঞাদি আমাদিগকে উদ্ধার করতে পারে না এবং মন্ত্রাদি বৃথা শব্দ মাত্র। কি কিরূপে আমি অমৃত জীবনের পথ দেখতে পাব ? আমি চতুর্বেদ কণ্ঠস্থ করেছি কিন্তু এখনো সত্যদ্রষ্টা হইনি।

তথাগত—পাণ্ডিত্য খুব ভাল; কিন্তু তাতে সত্যলাভ হয় না। সাধনা দ্বারা সত্যজ্ঞান অর্জিত হয়। এই সত্যটি অভ্যাস করতে, তুমি এবং তোমা

অভিন্ন। আর্য্য ধর্মপথে বিচরণ কর। তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে, পরতা ও সংকীর্ণতাই মৃত্যু এবং সত্যনিষ্ঠা ও উদারতাই অমৃতত্ব।

তখন কূটদন্ত করযোড়ে বললেন, "ভগবন, আমি বুদ্ধ সংঘ ও ধর্মের শরণ ম। আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন এবং অমৃতানন্দের আস্বাদ দিন।"

বুদ্ধের স্বরূপ

অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতে'* বুদ্ধের স্বরূপ বিবৃত আছে। ব্রহ্মজাল সূত্তেও বিষয়ে অনেক আলোক পাওয়া যায়। বুদ্ধ একদা তাঁর শিষ্যবৃন্দকে কথা প্র বললেন, "যারা আমাকে বিশ্বাস করে না, তারা আমাকে গৌতম বলে চ। আর তোমরা আমাকে তথাগত বুদ্ধ বলে শ্রদ্ধা কর। তোমরা ই করেছ। কারণ এই জীবনেই আমি নির্বাণ লাভ করেছি এবং গৌতমের চিরতরে নির্বাপিত হয়েছে। আমার অহং (আমি) অন্তর্হিত হয়েছে বোধি এসে আমার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। এই দেহ গৌতমের। ইহা পঞ্চভূতে বিলীন হবে। ইহা বিনষ্ট হলে ঈশ্বর বা কোন দেবতা আর মকে দেখতে পাবে না। কিন্তু মহাবোধি সনাতন। বুদ্ধ অমর। বুদ্ধ য়ে অনন্ত কাল জীবিত থাকবেন। সিদ্ধার্থের মৃত্যুর পর কেউ বলতে র না, তিনি এখানে কি, ওখানে আছেন। তিনি জ্বলন্ত হুতাশনের বিশাল অগ্নি শিখাবৎ মিশ্রিত হবেন! কিন্তু তথাগতের ধর্মদেহই চিরন্তন।"

"তোমরা সকলে আমার সন্তান এবং আমি তোমাদের পিতা। আমা তোমরা দুঃখ-কষ্ট থেকে চিরমুক্তি পেয়েছ। আমি নিজে ভব-নদীর গেছি এবং অন্যকে নদীপার হতে সাহায্য করেছি। আমি মুক্তিলাভ এবং অন্যের মুক্তিদাতা হয়েছি। আমি চির শান্তি লাভ করেছি এবং

---

* ইহা সংস্কৃত গ্রন্থ এবং গদ্য-পদ্যে রচিত। ৪২০ খৃঃ ইহা ধর্মরক্ষ কর্তৃক সংস্কৃত হতে চীনা অনূদিত হয়। স্যামুয়েল বীল ১৮৮৩ খ্রীঃ উহাকে চীনা ভাষা থেকে ইংরাজিতে অনুবাদ উক্ত অনুবাদ 'সেক্রেড বুক্স অব দি ইষ্ট' সিরিজের ১৯শ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। ইহা ডাঃ লাল মিত্র কর্তৃক কলিকাতায় এসিয়াটিক্ সোসাইটি হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। ডাঃ এস. । কর্তৃক ইহা জার্মান ভাষায় অনূদিত এবং বার্লিন হতে ১৮৭৪ খ্রীঃ প্রকাশিত।

অন্যকে শান্তিধামে যাবার পথ দেখাচ্ছি। এই লোকে আমি ধর্মরাজর জন্মেছিলাম জগতের উদ্ধারের জন্য। আমি সত্য ধ্যান করি, আমি স অনুশীলন করি। সত্যই আমার ধ্যেয় জ্ঞেয় বস্তু। আমার চিন্তারাশি এ অদ্বিতীয় সত্যে নিবদ্ধ। আমি সত্যস্বরূপ হয়ে গেছি। আমিই সত্য, আ বোধি। বোধি ও বুদ্ধ অভিন্ন। যে বোধিলাভ করে সে বোধিকে পায়, বুদ্ধই হয়ে যায়। বুদ্ধত্ব লাভে প্রত্যেক নর-নারীর জন্মগত অধিকার আছে।

কাশ্যপের মনে যে অনিশ্চয় ও সন্দেহ অবশিষ্ট ছিল তা দূর করবার জ তথাগত বল্লেন, "সব বস্তু এক উপাদানে গঠিত। তাদের পার্থক্য আকারগ কুমার যেমন একটী মাটী থেকে বিভিন্ন আকৃতির ঘট তৈরী করে তে অভিন্ন উপাদান থেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী-দেহ সৃষ্টি হয়। কোন পাত্রে দই, কে পাত্রে দুধ, কোন পাত্রে চিনি ও কোন পাত্রে চাল থাকে। আবার অ পাত্রে কিছু রাখা যায় না, সেগুলি মলিন বলে। পাত্রসমূহের মধ্যে উপাদান পার্থক্য নেই, শুধু আকৃতিগত প্রভেদ আছে। অবস্থাভেদে যে বিভিন্ন প্রয়ো উঠে তাহা পূরণার্থই পাত্রগুলির নানা আকার সৃষ্টি করেছে কুমা সুনিপুণ হস্তদ্বয়।"

"তথাগত সর্বভূতে সমদর্শী। মেঘ যেমন সকল বস্তুর প্রতি সমানভ বারি বর্ষণ করে তেমনি তথাগত সমগ্র সমাজ ধর্মভাবে পুনর্গঠন করেন। উ নীচ, জ্ঞানী-অজ্ঞ, মহাত্ম-দুরাত্মা সকলের প্রতি তাঁর মনোভাব সমান। তথা যে ধর্ম প্রচার করেন তার সার কথাই মুক্তিলাভ এবং তার লক্ষ্য নির্বা শান্তি। তিনি সমদর্শী হলেও প্রত্যেক প্রয়োজন অনুসারে তদুপযোগী ধর্ম প্রকাশ করেন। সেজন্য তিনি কাউকে একবার সম্পূর্ণ সর্বজ্ঞত্ব দান করেন ন যার যেমন ধারণাও আকাঙ্খা তাকে তিনি ততটুকু ধর্ম উপদেশ করেন।

রাহুলকে উপদেশ

বুদ্ধদেব স্বপুত্র রাহুলকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা 'মহারাহুল সুত্ত' গ্র পাওয়া যায়। বোধিলাভের পূর্বে রাহুলের জীবন সর্বদা সত্যনিষ্ঠার ধা

।শেষিত ছিল না। সেজন্য তথাগত তাঁকে কোন সুদূর বিহারে পাঠালেন মন বাক্যের সংযম শিক্ষা করতে।

কিছুদিন পরে তথাগত উক্ত স্থানে গেলেন। রাহুল পিতাকে দেখে ।নন্দিত হলেন। পিতা পুত্রকে একটী পাত্রে জল এনে তাঁর পা ধুয়ে দিতে ।লেন। পুত্র পিতার আদেশ পালন করলেন। যখন রাহুল তথাগতের পা য় দিচ্ছিলেন তখন তথাগত জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি এই জল পানযোগ্য ? হুল উত্তর দিলেন, "না ভগবন্, এই জল ময়লা হয়ে গেছে। এখন একে আর ন করা যায় না।"

তখন তথাগত বললেন, "এখন তোমার বিষয় বিবেচনা কর। যদিও মি আমার পুত্র, রাজা শুদ্ধোদনের পৌত্র এবং যদিও তুমি শ্রমণ হয়েছ ও চ্ছায় সর্বস্ব ত্যাগ করেছ তথাপি তুমি অসত্য থেকে জিহ্বাকে রক্ষা করতে মর্থ নও এবং এইরূপে মনকে মলিন করছ।" যখন ময়লা জল ফেলে দেওয়া হল খন তথাগত আবার রাহুলকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই পাত্র কি এখন বিশুদ্ধ নীয় রাখার যোগ্য নয় ?" রাহুল উত্তর দিলেন, 'না প্রভু! পাত্রও মলিন ৷ গেছে।' তখন তথাগত বললেন, এখন তোমার বিষয় বিবেচনা কর। ন তুমি এই পাত্রের মত মলিন হয়েছ তখন গেরুয়া পরলেও কোন উচ্চ দর্শের যোগ্য কি ? তখন তথাগত শূন্য পাত্রটী তুলে চার দিকে ঘুরিয়ে লেন, "পাছে এটা পড়ে ভেঙ্গে যায় সেজন্য তুমি ভয় করছ না কি ?" রাহুল ত্তর দিলেন, "না প্রভো, এই পাত্রটা সস্তা। এটা ভাঙ্গলে বেশী ক্ষতি হবে ।" তখন তথাগত বললেন, এখন তোমার নিজের বিষয় চিন্তা কর। হৃতির অসংখ্য আবর্তে পড়ে তুমি ঘূর্ণায়মান হচ্ছ এবং তোমার দেহ অন্যান্য ৎ বস্তুর ন্যায় একই উপাদানে গঠিত বলে সেটা নষ্ট হলেও কোন ক্ষতি নেই। অসত্য কথনে অভ্যস্ত সে জ্ঞানী গুণীর ঘৃণার্হ।"

পিতার সস্নেহ তিরস্কারে পুত্র অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। তথাগত আর কবার রাহুলকে সম্বোধন করে বললেন, "শোন, বাবা, আমি তোমাকে একটী । বলি। কোন রাজার একটী খুব বলবান্ হাতী ছিল। সে হাতীটা

পাঁচ শত সাধারণ হাতীর সাথে লড়তে পারত। যুদ্ধে যাবার সময় তার দাঁতে ধারাল অসি, তার কাঁধে লম্বা ছোরা, তার পায়ে বর্শা ও তার লেজে লৌহ কন্দুক বেঁধে দেওয়া হত। মাহুত এই মহৎ জন্তুটাকে যুদ্ধ-সাজে সজ্জিত দেখে আনন্দিত হল এবং উহার শুঁড়ে তীরের সামান্য আঘাত মারাত্মক হবে জেনে সে হাতীটাকে শিখিয়েছিল শুঁড়টী কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে তুলে রাখতে। কিন্তু যুদ্ধকালে হাতী একটী অস্ত্র ধরে ফেল্‌বার জন্য তার শুঁড় প্রসারিত করেছিল। এতে মাহুত সন্ত্রস্ত হয়ে রাজার সঙ্গে পরামর্শ করল। উভয়ের বিচারে এই স্থির হল যে, হাতীটা আর যুদ্ধে ব্যবহৃত হবার যোগ্য নয়। আরে রাহুল! মানুষ যদি তার জিহ্বা সংযত রাখত তাহলে তার প্রভূত কল্যাণ হত। সেই রণ-হস্তীর মত হও, যে মধ্যভেদী বাণ থেকে নিজের শুঁড় বাঁচিয়ে চলে। সত্যনিষ্ঠার দ্বারা সাধুলোক অসামঞ্জস্য থেকে রক্ষা পায়। যে সংযত ও শান্ত হাতী রাজাকে তার শুড়ে চড়তে দেয় ঠিক তার মত যে মানুষ ধর্মানুশীলনে শ্রদ্ধাবান্ সে সারা জীবন বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে টিকে থাকে।"

বুদ্ধের গল্পটি ও উপদেশ শুনে রাহুল গভীর দুঃখে অভিভূত হলেন। তিনি আর কখনো তাঁর বিরুদ্ধে অন্য অভিযোগের সুযোগ কাউকে দেননি। তখন থেকে তিনি আন্তরিক প্রযত্ন দ্বারা তাঁর বাক্য-মন বিশুদ্ধ ও সত্যনিষ্ঠ রেখেছিলেন।

তথাগত সমাজের রীতিনীতি লক্ষ্য করে দেখলেন, আত্মশ্লাঘা ও বৃথাগর্বের ফলে মানুষ যে সব নির্বোধ অন্যায় বিদ্বেষ করে থাকে তাতেই গভীর দুঃখের উৎপত্তি হয়। তিনি বলেন, যদি কোন নির্বোধ আমার প্রতি অন্যায় আচরণ করে আমি তার প্রতিদানে অযাচিত প্রীতি প্রসারিত করবো। তার কাছ থেকে যত অন্যায় আসবে আমার কাছ থেকে তত প্রীতি নির্গত হবে। সততার সুগন্ধ আমার কাছেই আসে এবং শঠতার দুর্গন্ধ তার কাছেই যায়।

মূঢ়ের সহিত ব্যবহার

কোন মূঢ় ব্যক্তি যখন জানলেন যে, বুদ্ধ সেই মৈত্রী প্রদর্শন করেন যাতে কেহ অন্যায় করলেও তিনি তাকে আশীষ দিয়ে থাকেন তখন সে এসে বুদ্ধকে

তিরস্কার করল। অকারণে মূঢ়কে তিরস্কার করতে শুনে বুদ্ধ নীরব রইলেন এবং তার মূঢ়তাকে উপেক্ষা করলেন। ভৎর্সনা শেষ হলে বুদ্ধ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা! যদি কেউ কোন উপহার গ্রহণ না করে তবে সেটা কার হবে?' লোকটি উত্তর দিল, 'এইরূপ অবস্থায় যে উপহারটি দিয়েছিল উপহারটি তারই থাকবে।' বুদ্ধ বললেন, "বাবা! তুমি আমাকে যে তিরস্কার করেছ তা আমি গ্রহণ করছি না এবং তা তোমার কাছে রাখতে অনুরোধ করছি। এটা কি তোমার দুঃখের কারণ হবে? যেমন প্রতিধ্বনি মূলধ্বনির অনুগত হয় এবং ছায়া স্বীয় বস্তুর অনুসরণ করে তেমনি দুঃখ নিশ্চিতই মন্দকারীকে অভিভূত করবে।'

ভৎর্সনাকারী কোন উত্তর দিলেন না এবং বুদ্ধ বলতে লাগলেন, 'যে দুষ্ট লোক শিষ্ট লোককে তিরস্কার করে সে সেই লোকের মত, যে উপরের দিকে মুখ তুলে থুথু ফেলে। থুথু আকাশকে মলিন করে না; কিন্তু ফিরে এসে লোকটির গায়ে পড়ে। নিন্দুক তারই মত, যে প্রতিকূল বায়ুর স্রোতে ধুলো ছোড়ে। যে ধুলো ছুঁড়ে বায়ু তার গায়ের উপরই ধুলো এনে ফেলে। ধার্মিক ব্যক্তি কখনও আহত হয় না। যে তাকে দুঃখ দিতে চায় সে-ই দুঃখ প্রাপ্ত হয়।'

নিন্দাকারী লজ্জিত হয়ে চলে গেল। কিন্তু একটু পরে ফিরে এসে বুদ্ধের শরণ নিল। এই গল্প থেকে বোঝা যায়, বুদ্ধ মানাপমানকে কত তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। একটি জাপানী গ্রন্থে* এই গল্পটি পাওয়া যায়।

দেবতার সহিত কথোপকথন

তথাগত মর্ত্যধাম এবং দেবলোকেরও পূজ্য গুরু ছিলেন। তিনি দেবতাদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলতেন এবং তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতেন। এই সম্বন্ধে একটি চীনা গ্রন্থে † নিম্নলিখিত গল্পটি পাওয়া যায়।—যখন তথাগত অনাথ

* Sutra of Forty-two sections (Kyoto, Japan) দ্রষ্টব্য।

† A Catena of Buddhist Scriptures from the Chinese by Samuel Beal (London, 1871) দ্রষ্টব্য।

পিণ্ডদের উদ্যান জেতবনে অবস্থান করছিলেন তখন একদিন এক স্বর্গবাস দেবতা ব্রাহ্মণের বেশে তাঁর কাছে এলেন। উক্ত ব্রাহ্মণের মুখমণ্ডল সমুজ্জ্ব এবং তাঁর গাত্রবস্ত্র তুষারবৎ শুভ্র ছিল। ছদ্মবেশী দেবতা যে সকল প্র করলেন তথাগত তার যথাযথ উত্তর দিলেন।

দেবতা—সর্বাপেক্ষা সুতীক্ষ্ণ অসি কোন্‌টি? সর্বাপেক্ষা মারাত্মক বিষ কি সর্বাপেক্ষা ভীষণ অগ্নি কি? সর্বাপেক্ষা অন্ধকার রজনী কোনটী?

তথাগত—ক্রুদ্ধভাবে যে বাক্য উচ্চারিত হয় তাহাই তীক্ষ্ণতম অসি। লো সর্বাপেক্ষা মারাত্মক বিষ। কামাদি রিপুই সর্বাপেক্ষা জ্বলন্ত হুতাশন। অজ্ঞা নিবিড়তম রাত্রি।

দেবতা—কে অধিকতম উপকার লাভ করে? কে অধিকতম ক্ষতি হয়? কোন্ বর্ম দুর্ভেদ্য? কোন্‌টি সর্বোত্তম অস্ত্র?

তথাগত—যে অন্যকে দান করে সে-ই সর্বাপেক্ষা লাভবান্ হয়। প্রতিদান না দিযে অন্যের কাছে থেকে শুধু দান গ্রহণই করে সে সর্বাপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধৈর্যই দুর্ভেদ্য বর্ম। প্রজ্ঞাই সর্বোত্তম অসি।

দেবতা—কে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক তস্কর? সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সম্পদ্ কি মর্ত্যে বা স্বর্গে বলপূর্বক গ্রহণ করতে কে সর্বাপেক্ষা কৃতকার্য হয়? সর্বাপে নিরাপদ্ ধনাগার কি?

তথাগত—অসৎ চিন্তাই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক তস্কর। ধর্মই সর্বাপে মূল্যবান্ সম্পদ্। প্রশান্ত চিত্ত ও সংযত জীবনই বলপূর্বক মর্ত্য ও স্বর্গের সম অধিকার করতে পারে। অমৃতত্বই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ্ ধনাগার।

দেবতা—আকর্ষণীয় বস্তু কি? পরিহার্য কি? সর্বাপেক্ষা অসহ্য বেদনা কি সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য কি?

তথাগত—সৎই একমাত্র আকর্ষণীয়। অসৎই সর্বথা পরিত্যাজ্য। দু বিবেক সর্বাপেক্ষা দুঃখদায়ক বেদনা। মুক্তিই চরম সুখের অনন্ত উৎস।

দেবতা—ইহলোকে ধ্বংসের কারণ কি? কিসে বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটায় উগ্রতম জ্বররোগ কি? কে শ্রেষ্ঠ বৈদ্য?

তথাগত—অজ্ঞানই জগৎ ধ্বংস করে। ঈর্ষা ও স্বার্থ মিত্রভেদ ঘটায়। :ভাবই উগ্রতম জ্বররোগ। বোধিপ্রাপ্ত মহাপুরুষই উত্তম চিকিৎসক।

তখন দেবতা বিনয়পূর্বক বললেন, 'এখন আমার আর একটি মাত্র সন্দেহ :ছে, যার সমাধান আপনার কাছে পেতে চাই। কৃপাপূর্বক আমার এই শয় দূর করে দিন।'

দেবতা—এমন কি বস্তু আছে যাকে আগুন পোড়াতে পারে না, জল পচাতে :র না, বায়ু শুকাতে পারে না, অথচ যাহা সমগ্র পৃথিবী সংস্কারে সমর্থ?

তথাগত—সৎকর্মের সুফলই সেই বস্তু! আগুন বা জল বা বায়ু সৎকর্মের ফল নষ্ট করতে পারে না এবং ইহাই নিখিল বিশ্ব সংস্কৃত করতে পারে।

স্বর্গাগত দেবতা বুদ্ধের কথা শুনে পরমানন্দে পরিপূর্ণ হলেন। হাত াড় করে তিনি বুদ্ধের সম্মুখে প্রণত হয়ে হঠাৎ অন্তর্হিত হলেন।

ভিক্ষুর জীবন

সুত্ত নিপাতে * ভিক্ষুর কর্তব্য সম্বন্ধে ভগবান্ তথাগতের উপদেশ লিপিবদ্ধ। কদিন ভিক্ষুবৃন্দ তথাগতের কাছে এসে করজোড়ে অভিবাদনান্তে নিবেদন :লেন, "হে ভগবন্! আপনি সর্ববেত্তা। আমরা আপনার কাছে ধর্ম শিক্ষা াতে চাই। আপনার বাণী শুনবার জন্য আমরা উৎকর্ণ হয়ে আছি। পনি অনুপম শিক্ষক। হে মহামুনি, আমাদের সন্দেহ ছিন্ন করুন, আমাদিগকে শিক্ষা দিন। সহস্রাক্ষ দেবরাজের মত আপনি সর্বদর্শী। আপনি ধর্মব্যখ্যা ন। আপনি ভব-নদী পার হয়েছেন এবং আদর্শ ধর্মাচার্য। আপনি বলুন, রূপ ভিক্ষু সংসার ত্যাগ ও বাসনা বর্জন করে এই জগতে ঠিকভাবে ণ করবেন।

ভগবান্ বুদ্ধ উপদেশপ্রার্থী শিষ্যবর্গকে বললেন, "ভিক্ষু ঐহিক ও পারত্রিক র কামনা বর্জন করবে এবং জিতেন্দ্রিয় হয়ে ধর্মসাধনে ও ধর্মপ্রচারে রত

* ভি. ফৌসবল কর্তৃক পালি থেকে ইংরাজিতে অনূদিত এবং সেক্রেড বুক্স অব দি ইষ্ট ির দশম খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগে ১৮৮১খ্রীঃ অক্সফোর্ড হতে প্রকাশিত।

থাকে। যে ভিক্ষু এইরূপে চলবে সে-ই ঠিকভাবে জগতে বিচরণ করা যে ভিক্ষু ষড়রিপু জয় করেছে ও অহংকার মুক্ত হয়েছে, যে সমস্ত ইন্দ্রিয় সং করেছে এবং শান্তচিত্ত ও দৃঢ়মনা সে জগতে ঠিকভাবে বিচরণ করবে। ভিক্ষু বিবেকী ও বিশ্বস্ত ও নির্বাণমার্গে আরূঢ়, যে পক্ষপাতশূন্য পবিত্র আত্মজয়ী এবং মানস নয়ন থেকে অজ্ঞান-আবরণ ফেলে দিয়েছে সে ঠিক জগতে বিচরণ করবে।"

ভিক্ষুগণ তথাগতের উপদেশ শুনে যারপরনাই আনন্দিত হয়ে বলে "হে ভগবন্, আপনি যা বলেছেন তা অতি সত্য। যে ভিক্ষু জিতেন্দ্রি মমতামুক্ত হবে সে-ই আদর্শ ভিক্ষুর যোগ্যতা পাবে।" ভিক্ষুবৃন্দকে অ উপদেশ শ্রবণে উৎকণ্ঠিত দেখে তথাগত বলতে লাগলেন, যে নির্বাণের শ পেতে ইচ্ছা করে তাকে বিবেকী, ভদ্র, নিরভিমান, ন্যায়পরায়ণ ও কর্তব্য হতে হবে। কোন ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে প্রতারণা করবে না, ঘৃণা করবে না ক্রোধভরে বা ঈর্ষাবশে অনিষ্ট করবে না। যারা সত্যদ্রষ্টা ও শান্তিকামী তা কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়। যে ইন্দ্রিয়দমনে দৃঢ়চেতা হয় সে-ই সুখী। প্রত্যেক দুঃখ নষ্ট ও প্রত্যেক বাসনা ক্ষীণ হয়েছে সে-ই সুখী। অভিমান যে জয় করেছে সে-ই পরা শান্তির অধিকারী। ধর্মেই মানুষের হোক, ধর্মেই তার আনন্দ হোক, ধর্মে সে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হে ধর্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করতে সে শিখুক। ধর্মকে যে বিতর্ক বিকৃত করে ধ সে যেন কখনো না তোলে। ধর্ম সম্বন্ধে প্রামাণ্য বাণীর উপর অনুধ্যান সে কালক্ষেপ করুক।'

"যে সম্পদ গভীর গর্তে প্রোথিত তা কারও কাজে আসে না এবং স নষ্ট হয়ে যেতে পারে। দয়া, ধর্ম, মিতাচার ও আত্মসংযম এবং পুণ্য কর্মাদির যে সম্পদ অর্জিত হয় তাহাই অক্ষয়, তাহাই আসল। ধর্মসম্পদই অবিন ইহকালে ও পরকালে ইহা আমাদের জীবনের পাথেয়। কোন চোর সম্পদ চুরি করে নিতে পারে না। এই ধন যতই দান করবে তত বেড়ে যা অন্যের অনিষ্ট করে বা কাউকে আজ্ঞা করে এই ধনলাভ হয় না। মৃত্যুর

সকলকেই নশ্বর পার্থিব সম্পদ্ ছেড়ে যেতে হয় ; কিন্তু এই ধর্মসম্পদ্ তার সঙ্গে যায়। যারা বিবেকী তারা পুণ্য কর্মে রত হোক। পুণ্য কর্মের ফল পরলোকে শ্রেষ্ঠ সঙ্গী।"

ভিক্ষুগণ তথাগতের উপদেশ শুনে সম্যক্ পরিতৃপ্ত হলেন এবং এই ভাবে প্রশংসাবাদ করতে লাগলেন, "হে তথাগত সম্বুদ্ধ, আপনি দুঃখাতীত, সুখপ্রাপ্ত ও রিপুযুক্ত। আপনি মহাজ্ঞানী, মহামনীষী ও মহাগুরু। আপনি আমাদের সংশয় ছিন্ন করেছেন। আপনাকে প্রণাম করি। যে বস্তু লাভ করলে অন্য লাভ অধিক মনে হয় না সেই লাভ আপনার হয়েছে। আপনি শান্ত দান্ত, সত্যনিষ্ঠ ও উপরত। আপনাকে নমস্কার করি। আপনি মার-জয়ী এবং এই জগতের পরিত্রাতা। নরলোকে বা দেবলোকে আপনার সমকক্ষ বা অভ্যধিক আর কেহ নাই। আপনাকে প্রণাম করি।"

অমিতাভ

পরবর্তী বৌদ্ধ ধর্মে অমিতাভ শব্দ উৎপন্ন হয়। বুদ্ধকে অমিতাভ বলা হয়েছে। কারণ তাঁর অমিত আভা ছিল। চীনে ও জাপানে সদ্ধর্ম-পুণ্ডরীক সম্প্রদায়ে অমিতাভ নাম বিশেষ প্রচলিত। হীনযান বৌদ্ধ ধর্মে অমিতাভ ব্যক্তিরূপে অজ্ঞাত। চীনদেশীয় পর্যটক ফাহিয়ান ও হিউয়েন সাঙ ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। অমিতায়ুস সূত্রে * ইহার প্রাচীনতম উল্লেখ দেখা যায়।

কোন শিষ্য তথাগতের নিকট সংশয়াকুল মনে ও কম্পমান চিত্তে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে বুদ্ধ, যদি আপনি অলৌকিক ক্রিয়া এবং অলৌকিক শক্তি লাভ করতে নিষেধ করেন তবে আপনি জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করলেন কেন? অমিতাভ কি অসীম শক্তির উৎস নয়?"

* ইহা বিগত শতকে ইংরাজীতে অনূদিত। Hand Book of Chinese Buddhism by Earnst J. Eitel দ্রষ্টব্য। ইহা ১৮০৮ খ্রীঃ লণ্ডন হইতে প্রকাশিত।

তথাগত সত্যকামী শিষ্যের আগ্রহ দেখে বললেন, "হে শ্রাবক,† তু ধর্মপথে প্রবর্তক মাত্র। তুমি সংসার-সাগরে নিপতিত ও ভাসমান। ধর্মবোধ লা করতে তুমি আর কতকাল সময় নেবে? তুমি তথাগতের বাক্য বুঝে পারনি। কর্মফল অনিবার্য এবং প্রাণহীন প্রার্থনা নিষ্ফল। তখন শি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তবে কি আপনি বলেন, অলৌকিক ও অত্যদ্ভুত বস্তু কিছু নেই

ভগবান্ বুদ্ধ উত্তর দিলেন, "সংসারী লোকের পক্ষে এর চেয়ে অত্যদ্ভু অলৌকিক ও রহস্যজনক ঘটনা আর কি হতে পারে যে, ধর্মবলে পাপী সা হয়ে যায় এবং যে ধর্মপথে চলে সে সৎবস্তু লাভ করে ও অসৎপথ বর্জন করে যে ভিক্ষু নশ্বর পার্থিব সুখ বর্জনপূর্বক নির্বাণজাত বিশুদ্ধ পরম সুখ আকাঙ্ক্ষ করে তার মত অলৌকিক ক্রিয়া জগতে আর কিছু নেই। যে ধর্মপথে চ তার অসৎ কর্মের অভিশাপ সৎকর্মের শুভাশীষে পরিণত হয়। লোভ বা দ হতে অলৌকিক কার্য প্রদর্শনের বাসনা জন্মে। সেই ভিক্ষুই আদর্শনিষ্ঠ, ভাবে না আমাকে লোকে অভিবাদন করুক এবং যে জগৎ দ্বারা অবজ্ঞাত হযে ইহার প্রতি বৈর ভাব পোষণ করে না। সেই ভিক্ষুই ধর্মপথচারী, যার কা স্বপ্ন ও দৈব ইঙ্গিতাদি অর্থহীন এবং যে এই সকলের অসৎ প্রভাব থেকে মুক্ত

"অমিতাভ প্রজ্ঞা, ধর্ম ও বুদ্ধত্বের উৎস। যাদুকর ও বাজীকরের কা প্রবঞ্চনা মাত্র। কিন্তু অমিতাভ অপেক্ষা আশ্চর্যজনক, অসাধারণ আর কি হতে পারে? তখন শ্রাবক জিজ্ঞাসা করলেন, সুখ-স্বর্গের প্রতিশ্রুতি তবে কি বৃথা বাক্য মাত্র? বুদ্ধ প্রতিপ্রশ্ন করলেন, 'এই প্রতিশ্রুতি কি?' তখন শি উত্তর দিলেন, 'পশ্চিম দিকে এক স্বর্গরাজ্য আছে। সেটি স্বর্ণ-রৌপ্যাদ এব অমূল্য রত্নে সুসজ্জিত। উহাতে যে স্রোতস্বতী আছে তার জল বিশুদ্ধ এব উহার বালি স্বর্ণময়। উহা বড় বড় পদ্মফুলে শোভিত এবং রমণীয় ভ্রমণপথে বেষ্টিত। তথায় সর্বদা মধুর সঙ্গীত শোনা যায এবং তিনবার পুষ্পবৃষ্টি হয গায়ক পাখীরা তথায় সুমিষ্ট স্বরে ধর্ম-মহিমা ঘোষণা করে। যারা সেই দি

† যিনি বুদ্ধের স্বর শুনেছেন। শিষ্য, প্রবর্তক। বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিষ্যবৃন্দ। হাঁস যেমন ভে ভেসে জলের উপর দিয়ে অপর পারে চলে যায় তেমনি যিনি সাধন-সাগরে ভাসমান।

ত শোনে তাদের মনে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের স্মৃতি জাগে। তথায় কোন অসৎ হয় না এবং এমন কি, নরকের নামও অজ্ঞাত। আন্তরিক ভাবে ও বিশুদ্ধ ত্ত যে অমিতাভ বুদ্ধ বার বার উচ্চারণ করে সে-ই বিশুদ্ধ সুখ-রাজ্যে বাহিত এবং যখন মৃত্যু সমীপবর্ত্তী হয় তখন বহু সাধু-শিষ্য সমভিব্যাহারে বুদ্ধ তাঁর :খ এসে দাঁড়ান এবং তাঁকে নির্বাণের সুখ দান করেন।”

বুদ্ধ বললেন, “সত্যই এমন একটি সুখময় স্বর্গলোক আছে। কিন্তু সেই ‍ ভাবরাজ্যের অন্তর্গত। যারা অধ্যাত্মনিষ্ঠ তাঁদের নিকট স্বর্গরাজ্য সুপ্রাপ্য। ম বলছ, উহা পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার অর্থ, যথায় আলোকদাতা ধর্মগুরু া করেন সেই দিকে তাকাও। সূর্য অস্ত যান এবং আমাদিগকে ঘন ‍কারে ফেলে যান। রাত্রির ছায়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করে এবং পাপ-পুরুষ । আমাদের দেহগুলিকে গোরস্থানে প্রোথিত করে। তথাপি সূর্যাস্ত প্রলয় এবং যেখানে আমরা প্রলয় কল্পনা করি তথায় অমিত আভা ও অনন্ত বন বিরাজিত।”

বুদ্ধ বলতে লাগলেন, “তোমার বর্ণনা সুন্দর। কিন্তু ইহা অসম্পূর্ণ এবং রাজ্যের মহিমা বর্ণনে অসমর্থ। সংসারী লোকেরা জাগতিক ভাবেই উহার না করে জাগতিক দৃষ্টান্ত দিয়ে জাগতিক ভাষায়। কিন্তু যে স্বর্গ-রাজ্যে মুক্ত ‍ষরা বাস করেন তা এত সুন্দর যে, তুমি তার বর্ণনা বা কল্পনাও করতে র না। সে যাই হোক, অমিতাভ বুদ্ধ নাম জপ অতি পুণ্য কাজ। যদি ম সেই নামোচ্চারণ ভক্তিভরে কর তাহলে তোমার চিত্ত শুদ্ধ হবে এবং কাজ করতে ইচ্ছা জাগবে। সত্যলোকে যার হৃদয় উদ্ভাসিত সে স্বর্গরাজ্যে ‍ত সমর্থ। যে নির্বাণলাভ করেছে সে পাশ্চাত্য স্বর্গে গিয়ে তথাকার দিব্য রিবেশে থাকতে পারবে।

“তোমাকে আমি সত্যই বলছি, তথাগত এই দেহে থাকাকালেও স্বর্গরাজ্যের ন্ত সুখ অনুভব করেন। তথাগত যে ধর্মপ্রচার করেন তা পালন করলে এবং গতের সকলে সেই শান্তি ও সেই সুখলাভে সমর্থ হবে।” তখন শিষ্য বেদন করলেন, ‘হে ভগবন্, সেই ধ্যানগুলি আমাকে শিক্ষা দিন যা অভ্যাস

করলে আমার মন সেই স্বর্গসুখ অনুভবে সমর্থ হবে।' শিষ্যের প্রার্থনায় এই পাঁচ প্রকার ধ্যান তাঁকে শিক্ষা দিলেন।

"প্রথম ধ্যানে তোমার চিত্তকে এত মৈত্রীপূর্ণ কর যে, তুমি সর্বপ্রাণীর কি, শত্রুদেরও মঙ্গল কামনা কর। দ্বিতীয় ধ্যানে তোমার হৃদয়কে এত ক পূর্ণ কর, যাতে উহা সর্বপ্রাণীর দুঃখ কষ্ট স্পষ্টভাবে কল্পনা করবে এবং ত জন্য তোমার প্রাণে গভীর সমবেদনা জাগবে। তৃতীয় ধ্যানে হৃদয় আন কর এবং অপরের সুখে সুখী হও এবং অপরের উন্নতিতে নিজেকে উন্নত কর। চতুর্থ ধ্যানে পাপকর্মের কুফল চিন্তা করতে হয়। পাপ, রো ব্যাভিচারের কুফল বিচার কর এবং চিন্তা কর, ইন্দ্রিয়সুখ কত ক্ষণিক এবং ই কুফল কত মারাত্মক। পঞ্চম ধ্যানে হৃদয় সৌম্য ও শান্তভাবে পরিপূর্ণ কর এ প্রীতি ও ঘৃণা, দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার, সম্পদ্ ও অভাব প্রভৃতির ঊর্ধে উত্থিত এবং নিরপেক্ষ ভাবে শান্ত চিত্তে তোমার ভাগ্যের দিকে লক্ষ্য কর। তথাগ খাঁটি শিষ্য কৃচ্ছ্র তপস্যা ও বাহ্য অনুষ্ঠানের উপর আস্থা স্থাপন করে না। অহংভাব বর্জনপূর্বক অমিতাভ বুদ্ধের উপর সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস স্থাপন কর।'

তথাগত অমিতাভ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে শিষ্যের অন্তরে দৃষ্টিপাত করলেন এ তখনও কিছু সংশয় ও উৎকণ্ঠা দেখতে পেলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলে "বাবা! তোমার হৃদয়ে যে প্রশ্নগুলি জাগছে সেগুলি আমাকে জিজ্ঞাসা কর তখন শিষ্য বললেন, "কোন সামান্য ভিক্ষু কি ভাবশুদ্ধি দ্বারা অভিজ্ঞ* ও ঋদ্ধি লাভ করতে পারে? আমাকে ঋদ্ধিপথ দেখান। আমাকে সেই ধ্যানশি দিন, যার দ্বারা সমাধিলাভ হয়।' তখন তথাগত বললেন, "অভিজ্ঞা কি শিষ্য উত্তর দিলেন, "ছয় প্রকার অভিজ্ঞা আছে—(১) দিব্য চক্ষু (২) দিব্য (৩) ইচ্ছামত দেহকে ছোট বড় করার শক্তি (৪) পূর্ব পূর্ব জন্মের জ্ঞান জাতিস্মরত্ব (৫) অন্যের মনোভাব অবগতি (৬) জীবন-স্রোতের অবস্থার জ্ঞান।"

* অলৌকিক জ্ঞান। ছয় প্রকার অভিজ্ঞা বুদ্ধ লাভ করেছিলেন।

† অলৌকিক শক্তি। আর্নেষ্ট আইটেলের মতে জড় শক্তির উপর চিৎশক্তির প্রভুত্ব।

চথাগত উত্তর দিলেন, 'এগুলি খুবই অদ্ভুত সন্দেহ নেই এবং প্রত্যেকে
াই এগুলি লাভ করতে পারে। তোমার মনের সামর্থ্য বিবেচনা কর।
া থেকে প্রায় দুই শত লিগ দূরে তুমি জন্মেছিলে। তুমি কি মনে মনে এক
ঁ তোমার জন্মস্থানে গিয়ে পিত্রালয়ের খুঁটিনাটি খবর স্মরণ করতে পার না?
াছ ব্যাত্যা দ্বারা কম্পিত হয়েছে অথচ উৎপাটিত হয়নি তার মূলগুলি কি
মানস চক্ষে দেখতে পাও না? ওষধির সংগ্রাহক কি মানস নয়নে যখন ইচ্ছা
কোন লতাপাতার মূল, ডালপালা, ফল-পাতা এবং সেগুলির উপকার
ত পারে না? বহুভাষাবিৎ কি যে কোন শব্দ মনে আনতে পারে না, যার
; অর্থ ও ভাব তার জানা আছে? এদের সকলের চেয়েও তথাগত সর্ববস্তুর
গ্রবগত আছেন। তিনি সকলের অন্তর দেখেন এবং মনোভাব বুঝতে
ন। প্রাণিগণের ক্রমবিকাশ ও ভবিষ্যৎ তিনি সর্বদা অবহিত
ন।

শিষ্য বলেন, "তাহলে তথাগত শিক্ষা দেন যে, মানুষ ধ্যান সহায়ে
জ্ঞার আনন্দ উপলব্ধি করতে পারে।" তখন তথাগত জিজ্ঞাসা করলেন,
ন কোন ধ্যান সহায়ে মানুষ অভিজ্ঞা লাভ করতে পারে?" শিষ্য উত্তর
ন, "অভিজ্ঞা লাভের চারটি ধ্যান আছে। প্রথম ধ্যানে নির্জনে মনকে
াপরতা থেকে মুক্ত করতে হয়। দ্বিতীয় ধ্যানে মন আনন্দ ও আহ্লাদে
র্ণ হয় ও প্রশান্ত থাকে। তৃতীয় ধ্যানে অধ্যাত্ম বিষয়ে হর্ষলাভ হয়। চতুর্থ
ম্পূর্ণ সংশুদ্ধি ও শান্তির অবস্থা লাভ হয়। তখন মন শোকদুঃখের
চলে যায়।

থাগত বললেন, "বেশ বাবা, সুশান্ত ও সংযত হও ও অসৎ আচরণ ত্যাগ
অসৎ কার্যে বা অসৎ বাক্যে মন অশুদ্ধ হয়ে যায়।" তখন শিষ্য অনুনয়
লন, "হে তথাগত, আমার প্রতি ধৈর্য ধারণ করুন। আমার বিশ্বাস
কিন্তু বোধ নেই; তথাপি আমি সত্যান্বেষী। আমাকে ঋদ্ধিপথ শিক্ষা
তখন তথাগত বললেন, "চার উপায়ে ঋদ্ধিলাভ হয়—(১) মন্দগুণ
াাসতে দিও না। (২) যে মন্দগুণগুলি মনে উঠেছে সেগুলি দূর কর।

(৩) যে সাধুতা এখনো নেই তা জাগ্রত কর। (৪) একনিষ্ঠভাবে সং সন্ধান কর এবং সেই সন্ধানে অধ্যবসায়ী হও। এই চারিটি উপায় অবলম্বি হলে পরিশেষে সত্যলাভ সুনিশ্চিত।'

মহানিব্বাণ সুত্তে এবং চুল্লবগ্‌গে তথাগত নিজস্বরূপ এইভাবে আনন্দ বলেছেন। তথাগত বললেন, "আনন্দ, বিভিন্ন সংসদে আমাকে যেতে হয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংসদ, ব্রাহ্মণদের সংসদ, ভিক্ষুদের সংসদ এবং অন্যান্য প্রাণী সংসদ। যখন আমি কোন সংসদে প্রবেশ করতাম আমি উপবেশনের শ্রোতৃমণ্ডলীর বর্ণে রঞ্জিত হতাম এবং তাদের স্বর পর্য্যন্ত আমার স্বর যেত। অনন্তর আমি ধর্মপ্রসঙ্গ করে তাদিগকে ধর্ম শিক্ষা দিতাম উৎসাহিত করতাম।"

"আনন্দ, সমুদ্রের মত আমার বাণীর আটটী অদ্ভুত গুণ আছে। সাগর আমার বাণী উভয়ই ক্রমশঃ গভীরতর হয়। সর্বাবস্থায় উভয়ে স্ব স্ব স্বা বজায় রাখে। উভয়ে মৃতদেহগুলিকে শুষ্ক ভূমিতে নিক্ষেপ করে। বে বড় বড় নদী সমুদ্রে পতিত হয়ে তাদের নাম রূপ হারায় এবং সমুদ্র বলে পরিগণিত হয় তেমনি সকল শ্রেণীর নরনারীরা তাদের বংশধারা ছেড়ে স প্রবেশান্তে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যায় এবং শাক্যমুনির সন্তান বলে কা হয়। সাগরে সব নদীর এবং সব বৃষ্টির জল এসে পড়ে। কিন্তু তাতে কখ সমুদ্র উদ্বেলিত হয় না ও বেলাভূমি অতিক্রম করে না। আবার বে জল না পড়লেও সমুদ্র শুকিয়ে যায় না। তেমনি আমার ধর্ম লক্ষ লোকে গ্রহণ করলেও তার হ্রাস বা বৃদ্ধি নেই। যেমন সমুদ্রজলের স লোনাই হয় তেমনি আমার বাণীর একমাত্র সৌরভ আছে। সেটি বিমু সৌরভ। সমুদ্র ও ধর্ম উভয়ই মণি-মাণিক্য ও হীরামুক্তায় পরিপূর্ণ। উ অসংখ্য প্রাণীকে শান্তির আশ্রয় দান করে।"

"এই আটটি অদ্ভুত গুণে আমার ধর্ম সমুদ্র সমতুল্য। আমার ধর্ম বি এবং উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র ভেদ করে না। আমার বাণী শুদ্ধ জলের সর্বস্থান পরিষ্কার ও পবিত্র করে। আমার ধর্ম আগুনের মত সকল

ম্মীভূত করে এবং স্বর্গ ও মর্ত্য, বড ও ছোট শ্রেণীভেদ করে না। আমার র্ স্বর্গরাজ্যবৎ সুবিশাল। ইহাতে নর-নারী, বালক-বালিকা, সবল-দুর্বল কল শ্রেণীর মানুষের জন্য প্রচুর স্থান হতে পারে। কিন্তু আমি যখন উপদেশ তাম তারা আমাকে জানতে পারত না এবং বলত, 'যিনি এই বাণী হেন তিনি কি মানুষ, না দেবতা?' অনন্তর আমি ধর্মশিক্ষা ও প্রেরণা .য় অন্তর্হিত হতাম। কিন্তু আমার অন্তর্ধানের পর তারা আমাকে ানতে পারত না।

গল্প ও উপাখ্যান

জীশু খ্রীষ্টের ন্যায় বুদ্ধদেব গল্পচ্ছলে ধর্মোপদেশ দিতেন। বুদ্ধ-ধর্ম আদিতে ত্তম, মধ্যে উত্তম ও অন্তে উত্তম এবং ভাবে ও ভাষায় উৎকৃষ্ট হলেও লোকে বুঝতে পারত না। তাই তথাগত নানা গল্প ও উপাখ্যান বলে ধর্ম শিক্ষা তেন। তিনি বুঝেছিলেন, যে যুক্তি-বলে বা বিচার-মার্গে তিনি বোধি লাভ রেছেন তা সাধারণের অবলম্বনীয় নয়। শিশুদের ন্যায় মানুষমাত্রই গল্প নতে ভালবাসে। তাই তিনি ধর্ম-মহিমা ব্যাখ্যান-কালে সুন্দর সুন্দর গল্প তেন। বুদ্ধ-কথিত গল্পসমূহের মধ্যে ২৪।২৫টী এখানে দেওয়া হল। তাঁর গুলি যেমন সহজ ও চিত্তাকর্ষক, তেমনি সারগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ। বুদ্ধ-বাণী তে বা বলতে হলে এগুলি জানা দরকার। বুদ্ধের গল্পগুলি নানা ভাষা ও শের মধ্য দিয়ে ঈশপের ফেব্‌লরূপে পাশ্চাত্যে প্রচলিত। সাহিত্যের দিক য়েও এগুলি অমূল্য ও উত্তম।

জ্বলন্ত প্রাসাদ

কোন ধনী গৃহীর একটী বিশাল, অথচ পুরাতন প্রাসাদ ছিল। উহার ড়ি-বরগা কীট দষ্ট, উহার থাম জীর্ণ এবং ছাদ শুষ্ক ও দাহ্য হয়েছিল।

একদিন হঠাৎ সেই প্রাসাদে আগুণের গন্ধ পাওয়া গেল। গৃহ-কর্তা গৃহের বাহিরে এসে দেখলেন, উহার ছাদে আগুণ লেগেছে। তিনি ভয়-বিহ্বল হলেন; কারণ তিনি তাঁর পুত্র-কন্যাদিগকে খুব ভালবাসতেন এবং জানতেন তারা বিপদ্ সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে জ্বলন্ত প্রাসাদের চারি দিকে খেলে বেড়াচ্ছে।

সন্ত্রস্ত পিতা মনে মনে ভাবলেন, "আমি এখন কি করি? আমার শিশুরা অজ্ঞ। তাদিগকে বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করা বৃথা। যদি আমি ছুটে গিয়ে তাদের ধরি এবং বুকে করে বাহিরে নিয়ে আনতে চেষ্টা করি, তাহলে আমি হয়ত দুই একজনকে বাঁচাতে পারি; কিন্তু অন্যান্য শিশু আগুণে পুড়ে মরবে।" হঠাৎ এই চিন্তা তাঁর মনে উদিত হল। তাঁর মনে উঠ্‌ল, "আমার ছেলেমেয়েরা খেল্‌না খুব ভালবাসে। আমি যদি তাদিগকে খেল্‌না দেবার অঙ্গীকার করি তারা আমার কথা মন দিয়ে শুন্‌বে।"

তখন তিনি চীৎকার করে ছেলেদিগকে ডেকে বল্‌লেন, "তোরা শীঘ্র বাহিরে আয়। তোদের জন্য কি সুন্দর খেলনা এনেছি, এসে ত্থাখ্। এমন সুন্দর খেলনা তোরা পূর্বে কখনো দেখিস্ নি। সত্বর ছুটে আয়। দেরী হলে খেলনা পাবি না। ছেলেরা খেল্‌নার কথা শুনে ক্ষিপ্র গতিতে জ্বলন্ত প্রাসাদের বাহিরে এল। সন্তান-বৎসল পিতা তখন মহানন্দে মূল্যবান্ সুন্দর খেল্‌না কিনে সন্তানদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। শিশুরা স্বগৃহ ভস্মীভূত হয়েছে দেখে তাদের পিতার মহৎ উদ্দেশ্য বুঝতে পারল এবং যে কৌশলে পিতা এই বিপদে তাদের প্রাণরক্ষা করলেন তার ভূয়সী প্রশংসায় রত হল।

তথাগত জানতেন যে, দুনিয়ার লোকে শিশুবৎ জাগতিক সুখের চাকচিক্যই ভালবাসে। তাই তিনি ধর্ম-সুখ বর্ণনায় পঞ্চমুখ হতেন। এইরূপে তিনি মানবকে পাপাচরণ থেকে নিবৃত্ত এবং ধর্মসাধনে প্রবৃত্ত করতে চেষ্টিত হতেন। ইন্দ্রিয়-সুখের বিনিময়ে অধ্যাত্ম সম্পদ্ দিয়ে বুদ্ধ জগদ্ধিতায় ব্যাপৃত ছিলেন।

জন্মান্ধ মানব

কোন জন্মান্ধ ব্যক্তি বলেছিল, "আমি বিশ্বাস করি না যে, আলোকিত জগৎ আছে; অথবা কোন উজ্জ্বল বা শ্যামবর্ণ বস্তু আছে। আকাশে সূর্য বা চন্দ্র ব

রকা নেই। কেউই এই জ্যোতিষ্কগুলিকে দেখেনি।” তার বন্ধুরা এই ক্তর তীব্র প্রতিবাদ করল। কিন্তু সে তার ভ্রান্ত ধারণাকে আঁকড়ে ধরে ল এবং বললে, “তোমরা বল যে, তোমরা দেখতে পাও। আমার মনে হয়, সম্পূর্ণ মিথ্যা। যদি কোন বর্ণ থাকত আমি নিশ্চয়ই তা স্পর্শ করতে পারতুম। দের কোন স্থূল সত্তা নেই বললে তাদের অস্তিত্বও অস্বীকার্য।” তখনকার ন একজন অভিজ্ঞ বৈদ্য ছিলেন, যিনি চক্ষুচিকিৎসায় সুনাম অর্জন করেছিলেন। নি আন্ধ্যাদি চক্ষুরোগ সারাতে পারতেন। তাঁকে ডাকা হল। জন্মান্ধ কটিকে চিকিৎসা করবার জন্য। তিনি এসে চারটি সহজ দ্রব্য মিশিয়ে কটি ঔষধ প্রস্তুত করলেন। তা কিছু কাল প্রয়োগ করার ফলে জন্মান্ধ ষ্টিশক্তি লাভ করল।

তথাগত ভব-রোগের বৈদ্যরাজ। তিনি চারিটি মাত্র আর্যসত্য প্রচার করে নুষকে ভব-রোগ থেকে মুক্ত করলেন। ভব-রোগের এমন সুবৈদ্য জগতে রই এসেছেন।

নষ্ট পুত্র

কোন গৃহস্থের একটি পুত্র দূর দেশে চলে গিয়েছিল। এদিকে পিতা অমিত পদ্ সঞ্চয় করলেন। কিন্তু পুত্র অত্যন্ত দরিদ্র রইল। অন্ন-বস্ত্রের সন্ধানে ীন পুত্র নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে সেই গ্রামে এলেন, যেখানে তার পিতা সম্পন্ন ছিলেন। পুত্রকে দুঃস্থ দেখে পিতা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। পুত্র জীর্ণ বস্ত্র হিত ও দারিদ্র্য-পীড়িত ছিল বলে পিতা তার কয়েকটি ভৃত্যকে আদেশ লন পুত্রকে ডেকে আনতে।

যখন পলাতক পুত্র প্রাসাদে আনীত হল সে ভাবল, “আমি নিশ্চয়ই কোন ক্ষমতাধর মানুষের সন্দেহভাজন হয়েছি। তিনি হয়ত আমাকে কারাবদ্ধ বেন।” এই কল্পিত ভয়ে ভীত হয়ে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই সে ায়ে গেল। তখন পিতা পুত্রকে আনবার জন্য অনুচর পাঠালেন। তারা ন পুত্রকে ধরে নিয়ে এল তখন সে ভয়ে চীৎকার করে ক্রন্দন ও বিলাপ

করছিল। পিতা ভৃত্যবর্গকে আদেশ দিলেন তাঁর পুত্রের সঙ্গে কোমল ব্যব করতে। পুত্রের সমবয়স্ক ও সমশিক্ষিত শ্রমিক একটি নিযুক্ত হল জমিদারি তার সহকারীরূপে। নূতন পরিস্থিতিতে নষ্ট পুত্র প্রীত হল।

স্বীয় প্রাসাদের বাতায়ন দিয়ে পিতা স্বপুত্রকে নিত্য নিরীক্ষণ করতে যখন তিনি বুঝলেন পুত্র সচ্চরিত্র ও স্বাবলম্বী হয়েছে তখন তিনি ত ক্রমেই উচ্চ পদে নিযুক্ত করলেন। অনেক বৎসর পরে তিনি তার পুত্র ভৃত্যবর্গকে ডেকে রহস্যটি উদ্ঘাটিত করলেন। তখন দরিদ্র পুত্র ত পিতাকে চিনতে পেরে যারপরনাই আনন্দিত হল।

অল্প অল্প করে মানবমনকে উচ্চতর শিক্ষা দিতে হয়। সুপ্তোত্থিতের চ সামান্য আলোক সইতে পারে; পরে সূর্য্যের দিকে তাকাতে সমর্থ হয়।

অস্থির মাছ

কোন ভিক্ষু তার ইন্দ্রিয়সমূহ ও রিপুগুলিকে সংযত করতে পারতেন ন তিনি সংঘত্যাগের সঙ্কল্প করে তথাগতের কাছে এলেন এবং ব্রত-মুক্তি প্রার্থনা জানালেন। তখন তথাগত ভিক্ষুকে বললেন, "বৎস, সাবধান তোমার ভ্রান্ত চিত্তের রিপুগুলির গোলাম হয়ে পড়ো না। কারণ আ দেখছি যে, তুমি পূর্ব পূর্ব জন্মে প্রবল কামের কুফল থেকে খুব কষ্ট পেয়েছ যদি তুমি কামভাব জয় করতে না পার তোমার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। কে পূর্ব জন্মে অস্থির মাছরূপে তুমি কিরূপ বিপন্ন হয়েছিলে সেই গল্পটি শোন।

একটি মাছ তার সঙ্গিনীর সঙ্গে কাম-ক্রীড়ায় আসক্ত থেকে জলের উপ সাঁতার দিয়ে বেড়াত। সঙ্গিনী সম্মুখে যেতে যেতে হঠাৎ জলের স্পর্শ পে এবং চার দিকে ঘুরে বিপদ্ এড়িয়ে গেল। কিন্তু কামান্ধ মাছটি ভ্রান্তভা সঙ্গিনীর পেছনে ছুটতে ছুটতে জালের মুখে এসে পড়ল। জেলে মাছ স জালটি উপরে টেনে তুললেন। সে তখন মৃত্যু আসন্ন দেখে স্বীয় দুর্ভাগ্যে কথা ভাবতে লাগল এবং স্রষ্টার নিকট অভিযোগ করল। বোধিসত্ত্ব মাছে মনোভাব বুঝতে পেরে করুণার্দ্র হলেন এবং মাছটি জেলের কাছ থেকে কি

াকে বললেন, "আজ যদি তোকে দেখতে না পেতাম তুই মরে যেতিস্।
ামি তোকে বাঁচাব; কিন্তু এখন থেকে তুই আর পাপ করিস্ না।" এই
থা বলে তিনি মাছটিকে জলে ফেলে দিলেন।

এই গল্পটি বলে বুদ্ধ উক্ত ভিক্ষুকে উপদেশ দিলেন, এই জন্মে তুমি সংঘ-
ীবনের যে সুযোগ পেয়েছ তার সেরা সদ্‌ব্যবহার কর। কাম-মলকে সদা
ণা করে চলবে। যদি তুমি ইন্দ্রিয়-সংযম না কর তাহলে কামভাব অনলের
ত দাউ দাউ করে জ্বলে তোমাকে পুড়িয়ে ফেলবে।

নিষ্ঠুর সারস প্রতারিত

কোন দর্জি বৌদ্ধ সংঘের ভিক্ষুদের জন্য পোষাক তৈরী করে দিত।
ক্রতাদিগকে প্রতারণা করা তার অভ্যাস ছিল। এইরূপে সে অন্যাপেক্ষা
িজেকে চতুর ভেবে গর্ব অনুভব করত। একদা সে কোন আগন্তুকের
হিত দরকারী ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট হয়। সে তার প্রভুকে প্রতারণাময় কার্যে
গু দেখে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল।

তথাগত বললেন, "লোভী দর্জির কপালে এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।
ব পূর্ব জন্মে সে এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অপরকে ঠকাতে গিয়ে
রশেষে সে নিজের সর্বনাশ করেছিল। এই লোভী মানুষ বহু পুরুষ পূর্বে
রসরূপে একটি পুকুরের কাছে বাস করত। যখন গ্রীষ্ম ঋতু এল এবং
রগুলির জল শুকিয়ে গেল তখন একদিনে সে কাতর স্বরে মাছগুলিকে বলল,
ামাদের ভাবী কল্যাণের জন্য তোমরা ব্যস্ত নও কি? এখন এই পুকুরে
কম জল আছে এবং আরও কম আছে তোমাদের আহার্য। তোমরা
করবে যখন এই গ্রীষ্মকালে পুকুরটি শুকিয়ে যাবে?" মাছগুলি উত্তর
ল, "হাঁ তাইত, আমরা কি করি?" সারস বললে, "একটি বড় সুন্দর হ্রদের
ান আমি জানি, যার জল কখনো শুকায় না। আমি যদি আমার ঠোঁটে
র তোমাদের এক একটিকে সেই হ্রদে বয়ে নিয়ে যাই তাতে তোমরা
জী আছ কি?" যখন মাছগুলি সারসের সততায় অবিশ্বাস করতে লাগল

সে তখন প্রস্তাব করল তাদের একজনকে নিয়ে উক্ত হ্রদ দেখাতে। তাতে একটি বড় বাটামাছ অন্যান্য মাছের প্রাণরক্ষার্থে নিজেকে বিপন্ন করতে রাজী হল। তদনুসারে সারস তাকে একটি সুন্দর হ্রদে নিয়ে গেল এবং হ্রদটি দেখিয়ে নিরাপদে ফিরে নিয়ে এল। তখন সকলের সন্দেহ দূরে গেল এবং মাছগুলি সারসের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করল। এখন সারস সেই পুকুর থেকে এক একটি মাছ ঠোঁটে নিয়ে গিয়ে অদূরে একটি বরণ গাছে বসে খেয়ে ফেলল।

সেই পুকুরে একটি বড চিংডি মাছ ছিল। সারস তাকেও খেয়ে ফেলা উদ্দেশ্যে বললে, "আমি সব মাছকে এখান থেকে নিয়ে একটি বড হ্রদে রেখেছি এস, তোমাকেও নিয়ে যাই।" গলদা চিংডি জিজ্ঞাসা করল, "আমাকে কি করে ধরে তুমি নিয়ে যাবে?" সারস উত্তর দিল, "আমার ঠোঁট দিয়ে তোমাকে চেপে ধরব।" তখন চিংডি মাছ বললে, 'তুমি যদি সেরূপে আমাকে ধর তাহলে আমাকে ফেলে দেবে, আমি তোমার সঙ্গে যাব না।' সারস তাকে বুঝিয়ে বললে 'তুমি আদৌ ভয় পেও না। সারা রাস্তা তোমাকে শক্ত করে ধরে থাকব।'

সেই চিডিং মাছটা খুব চালাক ছিল। সে সারসের কথা শুনে মনে মনে ভাবল, 'যদি ঐ বক একবার কোন মাছকে ঠোঁটে ধরে সে নিশ্চয়ই তাকে হ্রদে ফেলবে না। অবশ্য যদি সে সত্যই আমাকে কোন হ্রদে নিয়ে যায় তবে অতি চমৎকার। কিন্তু যদি সে না করে তাহলে আমি তার গলা কেটে তাকে মেরে ফেলব।' চিংড়ি বককে প্রকাশ্যে বলল, 'দেখ ভাই! তুমি আমাকে শক্ত করে ধরতে পারবে না। আমরা গলদা চিংডির জাত। আমাদের কামড় প্রসিদ্ধ। যদি তুমি আমাকে আমার দাড়া দুটি দিয়ে তোমার গলা জড়িয়ে ধরতে দাও তাহলে আমি সানন্দে তোমার সঙ্গে যাব।'

সারস বুঝতে পারলে না যে, চতুর চিংড়িটা তাকে প্রতারিত করতে চেষ্টা করছে। তাই সে তার প্রস্তাবে সম্মত হল। কামারের সাঁড়াশীর মত চিংড়ি মাছ তার দুটি লম্বা দাড়া দিয়ে বকের গলা দৃঢ়রূপে জড়িয়ে ধরল এবং বলল 'এখন আমাকে নিয়ে চল।' সারস চিংড়িকে নিয়ে হ্রদের কাছে গেল এবং হ্রদটি দেখিয়ে বরণ গাছের দিকে ফিরল। তখন চিংড়ি চীৎকার করে বলল

'খুড়ো মশায়, হ্রদটা তো ওদিকে ; তুমি আমাকে অন্য দিকে নিয়ে যাচ্ছ কেন ?' সারস উত্তর দিল, "তুমি কি তাই মনে কর ? আমি কি তোমার খুড়ো যে, আমি তোমাকে ভাল হ্রদে বয়ে নিয়ে যাব ? আমি কি তোমার চাকর যে, তোমাকে ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে তোমার মনঃপূত স্থানে রেখে আসব ?' অদূরে বরণ গাছের তলায় মাছের কাঁটার স্তূপের দিকে দৃষ্টিপাত কর। যেমন আমি সেই মাছগুলির প্রত্যেকটি খেয়েছি ঠিক তেমনি তোমাকেও চিবিয়ে খাব।"

চিংড়ি মাছ উত্তর দিল, 'আহা! সেই মাছগুলি তাদের নির্বুদ্ধিতার জন্য তোমার দ্বারা ভক্ষিত হয়েছিল! কিন্তু তুমি আমাকে মারতে ও খেতে পারবে না! পক্ষান্তরে তোমাকেই আমি কামড়ে মেরে ফেলব। কারণ তোমার বোকামির জন্য তুমি বুঝতে পারনি যে, তুমি আমার দ্বারা প্রতারিত হয়েছ। যদি আমরা মরি, উভয়ে একত্রে মরব। আমি তোমার গলা কেটে তোমাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করব।' এই বলে চিংড়ি মাছ তার লম্বা দাড়া দুটি দিয়ে নিষ্ঠুর সারসের গলা খুব জোরে কামড়ে ধরল। তখন সারস হাঁপাতে হাঁপাতে এবং চোখের জল ফেলতে ফেলতে এবং মৃত্যুভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিংড়িকে অনুনয় করল, "হে প্রভু, আমি তোমাকে খেতে চাইনি। আমাকে বাঁচাও।" চিংড়ি তখন সগর্বে বলল, 'অতি উত্তম! নীচের দিকে উড়ে গিয়ে আমাকে হ্রদে ফেল।' তখন সারস উড়ে গিয়ে হ্রদের তীরস্থ পঙ্কের উপর চিংড়িকে ফেলল। ইতোমধ্যে চিংড়ি সারসের গলাটি এমন ভাবে কাটল, যেমন লোকে শিকারীর ছুরি দিয়ে পদ্মফুলের নাল কাটে। সারসের গলা কেটে সে হ্রদের জলে ডুবে গেল।

যখন বুদ্ধদেব গল্পটি শেষ করলেন তখন তিনি এই মন্তব্য করলেন, "এইরূপে কেবলমাত্র এখনই এই লোক প্রতারিত হয়নি। কিন্তু পূর্ব পূর্ব জন্মেও সে সমভাবে প্রতারিত হয়েছিল।"

চার প্রকার পুণ্য

কোন ধনী মানুষ নিজ গৃহে প্রতিবাসী ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করে বহুমূল্য উপহার দিতেন। দেবতাগণকে বিবিধ নৈবেদ্য দানেও তিনি অভ্যস্ত ছিলেন।

ভগবান্ বুদ্ধ বললেন, 'যদি কেহ প্রত্যেক মাসে হাজার যজ্ঞ করে এবং নিরন্তর দানাদি পুণ্য কর্মে রত থাকে সে তার সমান হয় না যে, মুহূর্তমাত্র ধর্ম-ভাবের উপর মনঃস্থির করে।

বিশ্ববন্দিত তথাগত বলতে লাগলেন, "চার প্রকার দান আছে। প্রথমতঃ যখন দান অধিক ও পুণ্য অল্প হয়। দ্বিতীয়তঃ যখন দান অল্প ও পুণ্য অল্প। তৃতীয়তঃ যখন দান অল্প ও পুণ্য অধিক এবং চতুর্থতঃ যখন দান অধিক এবং পুণ্য ও অধিক।

যে ভ্রান্ত ব্যক্তি দেবতাগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ প্রাণী হত্যা করে এবং তৎসঙ্গে ভোজ্য ও মদ্যপানাদিতে রত হয় সে-ই প্রথম দানের দৃষ্টান্ত। এখানে দান অধিক ; কিন্তু পুণ্য অল্প। যখন কেহ লোভবশে এবং অসদ্ উদ্দেশ্যে দেয় তখন সে বস্তুর কিয়দংশ আত্মসাৎ করে। তাহাই দ্বিতীয় দানের উদাহরণ। ইহাতে দানও অল্প পুণ্যও অল্প। যখন মানুষ প্রীতিভরে এবং দয়া ও প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে দান করে তাহাই তৃতীয় দানের দৃষ্টান্ত। এতে দান কম হলেও পুণ্য অত্যধিক ও আশাতীত। চতুর্থ দানের দৃষ্টান্ত এইরূপ—যখন কোন ধনী নিঃস্বার্থভাবে ধন-সম্পদ দান করেন এবং মানব জাতির কল্যাণার্থ বা অন্যের অভাব পূরণার্থ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।"

জগতের আলো

কৌশাম্বীতে এক শ্রোত্রিয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তখন তর্কে তাঁর সমকক্ষ কেউ না থাকায় তিনি একটি জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে চলতেন। তাঁর এরূপ অদ্ভুত আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিতেন, জগৎ এত অন্ধকার যে, উহাকে সাধ্যমত আলোকিত করবার জন্য এই মশাল নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াই।*

* প্রাচীন গ্রীসে দার্শনিক ডাইওজিনিস দিনের বেলায় একটা লণ্ঠন হাতে করে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন এবং সামনে লোক এলে লণ্ঠনটা তুলে তাকে দেখতেন। লোকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করত আপনি এরূপ কচ্ছেন কেন? তিনি হেসে উত্তর দিতেন, আমি একটা খাঁটি মানুষের সন্ধান করছি।

বাজারে কোন শ্রমণ বসে এই কথাগুলি শুনতে পেলেন। তিনি সেই হ্মণকে বললেন, "হে বন্ধু, দিনের আলো জগৎ জুড়ে রয়েছে। তা তুমি খতে না পেয়ে জগৎকে অন্ধকার ভাবছ কেন? তোমার মশাল দিবাকরের হিমা আদৌ বাড়াতে পারছে না। অপরকে জ্ঞানালোক দানের যে শুভেচ্ছা ামার আছে তা যেমন নিষ্ফল তেমনি উদ্ধত।"

এই কথা শুনে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি যে সূর্যের কথা বলছেন, নি কোথায়?' শ্রমণ উত্তর দিলেন, "তথাগতের প্রজ্ঞাই মানবমনের নিকট তুল্য। সেই অপার্থিব উজ্জ্বলতা দিনে বা রাত্রে আদৌ হ্রাস পায় না। যারা দ্ধর শরণাগত তারা জীবনপথে সেই জ্ঞানালোক দেখতে পান এবং নির্বাণলব্ধ শ্বত সুখের অধিকারী হন।"

বিলাসময় জীবনযাত্রা

যখন বুদ্ধ শ্রাবস্তীর উপকণ্ঠে আর্যধর্ম প্রচারে রত ছিলেন এক ধনবান ব্যক্তি র কাছে এলেন। সেই ব্যক্তি নানা রোগে ভুগতেছিলেন। তিনি যুক্ত করে কে নিবেদন করলেন, 'হে জগৎপূজ্য তথাগত, আপনাকে আমার প্রণাম করা চিত। কিন্তু আপনাকে প্রণাম করতে অক্ষম বলে আমায় ক্ষমা করবেন। মি স্থূলতা, নিদ্রালুতা প্রভৃতি তামসিক দোষে এত ভুগছি যে, বিনা কষ্টে মি নড়তে চড়তে পারি না।'

তথাগত বিলাসী ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার রোগগুলির রণ জানবার ইচ্ছা আছে কি?' যখন সেই ধনী ব্যক্তি আগ্রহ প্রকাশ রলেন তথাগত বললেন, "যে অবস্থায় তুমি কষ্ট পাচ্ছ তা এই পাঁচটি কারণে য় থাকে।—ভূরিভোজন, নিদ্রাপ্রিয়তা, ভোগেচ্ছা, চিন্তাহীনতা ও কর্মবিমুখতা। াহারে জিহ্বা-সংযম অভ্যাস কর। এমন কতকগুলি কর্মে রত হও যাতে তামার সামর্থ্যের সদ্‌ব্যবহার ও পরোপকার হয়। আমার এই উপদেশ নুসরণ করলে তুমি দীর্ঘজীবী হবে।"

ধনী লোকটি বুদ্ধ-বাক্য স্মরণ করে রাখলেন এবং তদনুসারে চলতে লাগলেন।

কিছু কাল পরে দৈহিক লঘুতা এবং যৌবন-সুলভ প্রফুল্লতা ফিরে পেয়ে ঘোড না চড়ে ও অনুচর না নিয়ে তিনি তথাগতের কাছে পদব্রজে এলেন এবং নিবে করলেন, "ভগবন্! আপনি কৃপাপূর্বক আমার দৈহিক অসুখ সারিয়ে দিয়েছে এখন আমি আপনার কাছে এসেছি মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্য।" তথাগ উত্তর দিলেন, "বিষয়ী লোক দেহকে পুষ্ট করে; আর জ্ঞানী মনকে সদ্‌ভা সমৃদ্ধ করে। ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য যে সদা যত্নশীল হয় সে নি সর্বনাশ ডেকে আনে। যে ধর্ম-পথে চলে তার পাপ-মুক্তি ও আয়ুবৃদ্ধি হয়।"

আনন্দ প্রকাশ

সুমনের ক্রীতদাস অন্নভার মাঠে ঘাস কাটার পরেই একটি শ্রমণকে দেখ ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে অন্ন ভিক্ষা করতে। ঘাসের বোঝা ছুঁড়ে ফেলে দি সে বাড়ীতে ছুটে গেল এবং তার ভক্ষণার্থে যে অন্ন প্রস্তুত হয়েছিল তা নি ফিরে এল এবং শ্রমণকে শ্রদ্ধাভরে দান করল। শ্রমণ দত্তান্ন খেলেন এ দাতাকে ধর্মকথা শুনিয়ে আনন্দিত করলেন। সুমনের কন্যা জানালার ভি দিয়ে এই দৃশ্য দেখে বলল, 'ভাল অন্নভার, ভাল খুব ভাল করেছ।

সুমন এই কথাগুলি শুনে তাঁর কন্যাকে এর অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন এবং অ ভারের সাধুভক্তি ও শ্রমণের নিকট থেকে প্রাপ্ত আশ্বাস-বাণীর কথা শুনে ত কাছে গেলেন এবং দানানন্দের অংশ লাভের জন্য তাকে অর্থ দিলেন। অন্নভার বলল, প্রভো, প্রথমে আমি শ্রদ্ধেয় সাধুটিকে জিজ্ঞাসা করি। এই বলে শ্রমণের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, "আপনাকে অন্নদান করে যে পুণ্যানন্দ পেয়ে তার ভাগ দিবার জন্য আমার প্রভু আমাকে অনুরোধ করেছেন। এই বিষ আনন্দের অংশীদার তাঁকে করা উচিত কি?"

শ্রমণ এই গল্পটী বলে উত্তর দিলেন, "কোন গ্রামে এক শত গৃহ ছিল। তন্ম একটীতে একটি মাত্র আলো জ্বলছিল। অনন্তর কোন প্রতিবেশী তার প্রদী নিয়ে এসে জ্বালিয়ে নিল। এইরূপে গৃহ হতে গৃহান্তরে সেই আলো ছড়ি

াড়ল এবং গ্রামের উজ্জ্বলতা বেড়ে গেল। তদ্রূপ ধর্মালোক প্রসারিত হতে ‌াারে প্রকাশকে খর্ব না করে। তোমার দানের আনন্দ ছড়িয়ে দাও, সকলের ধ্যে বিলিয়ে দাও।"

অন্নভার স্বীয় প্রভুর গৃহে ফিরে গিয়ে তাঁকে বল্ল, "প্রভো! আমার ানানন্দের এক অংশ আপনাকে উপহার দিতেছি, অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন।" ্মন তা সানন্দে গ্রহণ করে তাঁর ক্রীতদাসকে কিছু অর্থ দিতে চাইলেন। কিন্তু ন্নভার উত্তর দিল, "প্রভো! আমি অর্থ নেব না। যদি আমি অর্থ নিই তা ়লে দানানন্দকে বিক্রয় করা হবে। আনন্দ কেনা বা বেচা যায় না। অনুগ্রহ ্র্বক এটি উপহাররূপে গ্রহণ করুন।" সুমন উত্তর দিলেন, "ভাই অন্নভার, ্মি আজ হতে আমার গোলামী থেকে মুক্ত হলে। বন্ধুবৎ তুমি আমার সঙ্গে াস কর এবং আমার শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে এই উপহারটি নাও।"

অনবহিত মূঢ়

কোন বয়োবৃদ্ধ ধনবান্ ব্রাহ্মণ পার্থিব বস্তুর নশ্বরতা সম্বন্ধে অমনোযোগী হয়ে ্বং দীর্ঘজীবী হবার আশা করে নিজের জন্য একটি বৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণ ্রলেন। বুদ্ধ আনন্দকে এই ব্রাহ্মণের নিকট পাঠালেন এই অট্টালিকা নির্মাণের কারণ জানতে এবং চারিটি আর্য সত্য এবং অষ্টাঙ্গিক মুক্তিমার্গ তাঁকে শক্ষা দিতে।

ব্রাহ্মণ আনন্দকে স্বীয় প্রাসাদের কক্ষগুলি দেখালেন এবং সেগুলি নির্মাণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। কিন্তু আনন্দ যে বুদ্ধবাণী শুনালেন তাতে তিনি কর্ণপাত করলেন না। তা দেখে আনন্দ ব্রাহ্মণকে বললেন, "এই কথা বলা মূঢ়দের অভ্যাস যে, আমার এত পুত্রকন্যা ও ধনসম্পদ্ আছে। যে এই কথা বলে সে নিজেই নিজের প্রভু নয়। কিরূপে সে দারাসুত, ধনরত্ন ও ভৃত্যাদির প্রভুত্ব দাবী করতে পারে? বিষয়ীরা অসংখ্য দুশ্চিন্তায় জর্জরিত। তারা ভবিষ্যতের বিবর্তন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।"

আনন্দ সেই গৃহ হতে চলে যেতে না যেতেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে

আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। যারা ধর্মশিক্ষা করার জন্য উন্মুখ তাঁদিগ প্রেরণা দানের জন্য বুদ্ধ বললেন, "যেমন একটি চামচ ঝোলের আস্বাদ জান পারে না তেমনি মূঢ় ব্যক্তি জ্ঞানীর পূতসঙ্গে বাস করেও সত্যধর্ম সম্ব অনবহিত থাকে। সে কেবল নিজের কথাই ভেবে মরে এবং সাধু সদুপদেশে অবহিত হয় না। তাই সে নিজেকে অজ্ঞান থেকে মুক্ত করতে জ্ঞানালোক পেতে সমর্থ হয় না।"

মরুভূমিতে পরিত্রাণ*

সে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। বুদ্ধদেবের কোন শি সত্যলাভের জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। একদিন তিনি দৃঢ় সংকল্প করেন যে এই জন্মেই সত্যলাভ করতে হবে। তাই একান্তে তিনি ধ্যান ধারণায় কাটালে বেশ কয় দিন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মন দমে গেল। তিনি হতাশ হ ভাবলেন, "বুদ্ধ বলেছেন, জগতে নানা শ্রেণীর লোক আছে। আমি নিশ্চয় সব চেয়ে নীচু শ্রেণীর, নয়তো ধ্যানে আমার মন ডুবছে না কেন? শংকা হচ্ছে এই জন্মে হয়তো আমার ভাগ্যে সত্যলাভ ঘটবে না। এমন কি, সত্যলাভে পথও চির দিন আমার কাছে অজানা থেকে যাবে। নিশিদিন জ্বালিয়ে রেখে আমার সাধনার প্রদীপ, কই নির্বাণের একটু জ্যোতিও তো দেখতে পাচ্ছি না অতএব, এই আরণ্যক জীবনের কি লাভ?"

এই ভেবে তিনি নির্জনে কঠোর তপস্যা করা ছেড়ে দিলেন এবং ফি এলেন বুদ্ধের অন্য শিষ্যদের কাছে জেতবনে। শ্রমণেরা তাঁদের প্রিয় ভি ভাইয়ের সব ব্যাপার শুনে মনে বড় ব্যথা পেলেন ও মৃদু ভৎর্সনার সু বললেন, "ভাই, একটা মহৎ ব্রত নিয়ে সেটি শেষ পর্যন্ত পালন না করা তোমা অন্যায় হয়েছে।" তাঁরা তাঁকে নিয়ে গেলেন ভগবান বুদ্ধের নিকটে উৎসা ও উপদেশ লাভের জন্যে।

* 'কিশোর বাংলা' মাসিকের পৌষ-মাঘ ১৩৫৮ সংখ্যায় প্রকাশিত।

তথাগত জেতবনে শিষ্যদের সঙ্গে বিহার করছিলেন। তাঁর শ্রীমুখের ও উপদেশ শুনতে তথায় উৎসুক ভিক্ষুদের ভিড় জমেছিল। তখনও নামেনি পৃথিবীতে, দিনের উজল প্রভা ধীরে ধীরে নিভে আসছিল। অস্তায়মান রবির সোণালী কিরণে চার দিক ভরে ছিল।

এমন সময়ে শ্রমণেরা ব্যথিত ভিক্ষু ভ্রাতাকে সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধের সামনে ই থমকে দাঁড়ালেন। তথাগতের সৌম্য শান্ত মূর্তি দর্শনে তাঁদের মনের ন্ত কোথায় উড়ে গেল। অন্তর্যামী বুদ্ধ স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে বুঝে ফেললেন ত সকলের মনের কথা। তাই কেউ কিছু বলবার আগেই তিনি ন, "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা তোমাদের এই ভাইকে এখানে এনেছ তার র বিরুদ্ধে। এ কী করেছে?"

শ্রমণেরা বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলেন, "হে ভগবন্, এই গুরুভ্রাতা কিছুকাল একটি পবিত্র ব্রত নিয়েছিল। কিন্তু সংঘের প্রত্যেক সভ্যের যা লক্ষ্য শে গিয়ে সে এখন উক্ত ব্রত পালনের সমস্ত চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে; আর দুঃখে চলে এসেছে আমাদের কাছে। আমরা এর কি করতে পারি? ন্, আপনি একে কিছু উপদেশ দিন যাতে এর চঞ্চল মন সুশান্ত হয়।"

তথাগত সস্নেহে শুধালেন ব্রতত্যাগী শিষ্যকে, 'বৎস তুমি সাধনার প্রচেষ্টা কি ছেড়ে দিয়েছ?'

বুদ্ধের স্বাভাবিক ও করুণার্দ্র কণ্ঠস্বর শুনে ভীত লজ্জিত শিষ্য একটু সাহস করে বললেন, "হাঁ ভগবন্, সত্যই।"

তখন শান্ত স্বরে বুদ্ধ বলতে লাগলেন, "দেখ, এখন তুমি কৃপার্হ। নির্বাণ সুখের অবস্থা। তুমি এই জন্মে যদি সেই নির্বাণ লাভের জন্য উদ্যম না বে আসছে জন্মে তোমায় যথেষ্ট পরিতাপ পেতে হবে। কিন্তু বৎস, এত অধীর হলে কেন? পূর্ব জন্মে তোমার মন কতই না সবল ছিল। তোমার শক্তিতেই না পাঁচ শত গাড়ির যাত্রী ও বৃষেরা বালুময় বিজন প্রান্তরে পিপাসার জল পেয়ে প্রাণে বেঁচেছিল! এখন তুমি সাধনার হাল সহজে ছেড়ে দিলে কেমন করে?"

বুদ্ধদেবের কথাগুলি শিষ্যের মর্মে গিয়ে মৃদু আঘাত করল, আর জা[illegible] তুলল তাঁর অন্তরের সব সুপ্ত শক্তিকে। তিনি নির্বাক্ নিঃস্পন্দ হয়ে দাঁ[illegible] রইলেন। এদিকে অন্য ভিক্ষুরা বুদ্ধকে অনুনয় জানালেন, "ভগবন্, এঁর পূর্বজ[illegible] যে ঘটনার উল্লেখ আপনি করলেন তা বিশদ্‌ভাবে আমাদের শোনান।"

তথাগত সহাস্যে বললেন, 'তা হলে সব শোন ভিক্ষুগণ।' সকলের ম[illegible] এভাবে এক নিমিষে আকৃষ্ট করে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন সেই [illegible] যা জন্মান্তরের দরুণ সকলে ভুলে গিয়েছিলেন।

ব্রহ্মদত্ত যখন কাশীর রাজা ছিলেন তখন একবার বোধিসত্ত্ব এক ব[illegible] ঘরে জন্মান। বড হয়ে তিনি বেরিযে পডলেন বানিজ্য করতে। [illegible] নিলেন জন কযেক লোক এবং পাঁচশত মালগাডী। অনেক ক্রোশ হ[illegible] পর তিনি এক বালুময় মরুভূমিতে এসে পৌছিলেন। সেখানকার বা[illegible] সরু ছিল যে, হাতের মুঠোয তা ধরে রাখা যেত না। সূর্য উঠার পরেই সেই বালুরাশি জ্বলন্ত অঙ্গারের মত ভীষণ গরম হয়ে উঠত। [illegible] কেউ তার উপর দিযে চলতে পারতো না। সুতরাং যাদের সে ম[illegible] পেরোতে হত, তাদের এই এক সহজ উপায় জানা থাকত। সঙ্গে কা[illegible] তেল ও চাল নিযে তারা রাত্রে চলত, দিনে না চলে। দিনের বেলায় [illegible] তাঁবু খাটিয়ে বিছিয়ে দিত তার উপর এক খড়ের চাল। তারপর শীঘ্র [illegible] সেরে নিয়ে সেই তাঁবুর ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে দিন কাটাত। আবার স[illegible] সময় তারা রাত্রের আহার সেরে ফেলত। পরে মাটি ঠাণ্ডা হলে [illegible] গাডীতে বলদ্ জুডে রওনা হত। সংগে চালক তার নক্ষত্র-জ্ঞানের সা[illegible] দিক নির্ণয় করে নিরাপদে তাদের নিয়ে যেত মরুভূমির পারে।

আমাদের এই বণিকটিও উক্ত ভাবে পার হতে লাগলেন সেই বিস্তীর্ণ [illegible] ভূমি। প্রায় সাতাশী ক্রোশ রাস্তা হাঁটবার পর তিনি স্বস্তির শ্বাস [illegible] বাঁচলেন ও ভাবলেন, এখন একটা রাত্রির মধ্যেই আমরা এই ভীষণ মরু[illegible] থেকে পরিত্রাণ পাব। রাত্রে আহারের পর তাঁদের যাত্রা আবার শুরু [illegible] এই সময়ে এক অঘটন ঘটল।

চালকটি সবার আগে গাড়ীতে বসে নক্ষত্র দেখে দেখে যাত্রীদের ঠিক
য় নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় গদীর উপরে আরামে
থাকতে থাকতে সে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। এদিকে বৃষেরা কখন যে
চ ফিরে উল্‌টো পথে গাড়ী টেনে নিয়ে যেতে লাগল ঘুমন্ত চালক তার
বিসর্গও টের পেল না।

এই ভাবে বৃষেরা গাড়ী টেনে চলল সারাটা রাত্রি। ভোরের দিকে যখন
কের ঘুম ভাঙল, তখন সে আকাশে নক্ষত্র দেখে বুঝতে পারল যে তারা
ক্ষণ উল্‌টো রাস্তায় এসেছে। মহা ভয় ও ভাবনায় তার মাথা ঘুরে গেল।
চেঁচিয়ে সকলকে বললে, 'গাড়ী থামাও, গাড়ী থামাও।' সব গাড়ী যেই
ল সেই পূর্ব গগনে তরুণ অরুণের সোনার হাসিও দশদিক আলো করে
! যাত্রীরা সমস্ত ব্যাপার বুঝে খুব চিন্তিত হল। তাঁরা সমস্বরে বিলাপ
তে লাগলেন, "হায়, কাল যে জায়গায় আমরা তাঁবু খাঁটিয়ে ছিলাম এ-ত সেই
ই জায়গা দেখছি! এখন কী হবে! আমাদের কাঠ ও জল ফুরিয়ে
ছ, আমরা সব কিছুই হারিয়েছি!" তাঁরা শ্রান্ত বলদের বাঁধন খুলে
নন ও মাথায় কাপড় দিয়ে যাঁর যাঁর গাড়ীতে হতাশ ভাবে বসে পড়লেন।
ন্তু বোধিসত্ত্ব মনোবল না হারিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, "আমি যদি এখন
রের কোন আশা-ভরসা না রাখি তবে এরা সকলে মারা পড়বে।"

সকালটা তখন বেশ ঠাণ্ডা ছিল। বোধিসত্ত্ব* এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে
লেন কোন উপায়ের সন্ধানে। হঠাৎ বালির ওপরে একগাছি কুশ দেখতে
য তিনি আশ্চর্য্য হলেন ও ভাবলেন, এর নীচে নিশ্চয়ই জল আছে। কারণ
র মরুতে কুশ জন্মাতে পারে কেবল মাত্র বালির নীচেকার জল শোষণ করে।
বোধিসত্ত্বের নির্দেশে তখন সকলে কোদাল দিয়ে সেই জায়গাটা খুঁড়তে
লেন। ত্রিশ গজ খোঁড়ার পর তাঁদের কোদাল এক পাথরে বিষম চোট

* যাঁর সত্ত্বা বোধিত বা আলোকিত হচ্ছে, কিন্তু যিনি এখনো নির্বাণলাভ করেননি। স্বীয়
লাভ অপেক্ষা অপরকে মুক্তি করার জন্য যারা ব্রত নিয়েছে। একমতে তাঁরা নির্বাণলাভার্থ-
এক জন্ম গ্রহণ করবেন।

খেল। তখন তাঁরা জল পাবার আশা ছেড়ে দিলেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব মনে ঠিক করলেন, ঐ পাথরের নীচে নিশ্চয়ই জল আছে। তিনি কারুর ওপর নির্ভর না করে নিজেই নেমে পড়লেন সেই গর্তের মধ্যে সেখানে একটা বড় পাথরের চাঁই দেখতে পেলেন। তিনি নুয়ে পড়ে পা ধারে কান পাতলেন নীচ থেকে কোন শব্দ উঠে কিনা শুনবার জন্য। আশা দুরাশায় পরিণত হল না। পাথরের তলায় জলস্রোতের অবিরাম কল ধ্বনি তিনি শুনতে পেলেন। ওপরে উঠে বোধিসত্ত্ব তাঁর বালক ভৃ সস্নেহে আদেশ দিলেন, "বাছা, এখন যদি মনে বেশ জোর না রাখ আমরা এই ভয়ংকর মরুভূমি থেকে রক্ষা পাব না। এই লোহার হাতু হাতে ধর, সাহসে বুক বেঁধে নেমে যাও গর্তের নীচে ও পাথরের গায়ে স আঘাত কর।"

বোধিসত্ত্বের সঙ্গীদের মধ্যে কেউই জল পাবার বিন্দুমাত্র আশা করলেন গভীর আশংকায় তারা নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হযে রইলেন। তৃষ্ণায় তাঁদের চিন্তাশক্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হবার উপক্রম হল।

এদিকে ছেলেটি সাহসে ও সংকল্পে ভরপুর হয়ে বোধিসত্ত্বের আদেশ গর্তের নীচে নেমে পড়ে এক প্রচণ্ড আঘাত হানল পাথরের গাযে। বোধিস অভীষ্ট সুসিদ্ধ হল। পাথরটি সে আঘাত সইতে না পেরে তৎক্ষণাৎ ভেঙে টুক্‌রা হযে গভীর জলে তলিয়ে গেল ও জল-প্রবাহের উর্দ্ধগতি আর করতে পারল না। উচ্ছল জলধারা গব্ গব নাদে সেই গভীর গর্তটা ছাপিযে ওপরে উঠতে লাগল। তখন শ্রান্ত শংকিত পথিকেরা সহজ নাগা মধ্যে অফুরন্ত জলরাশি পেযে মহানন্দে আত্মহারা হযে গেলেন। তাঁরা জলে তাঁদের পিপাসা মিটালেন ও স্নান করলেন। তারপর ভাত নিজেরা খেলেন ও বৃষদের খাওয়ালেন। সূর্য্যদেব যখন অস্তাচলে গেলেন কুয়োর মুখে এক টুক্‌রা কাপড় চাপা দিয়ে আবার পথ চলা আরম্ভ করে পরদিন তাঁরা গন্তব্য স্থলে পৌছলেন ও সেখানে সঙ্গের মালপত্র বেচে লাভ করে শেষে স্বদেশে ফিরে এলেন।

তাঁরা সারা জীবন যেমন কর্ম করেছিলেন তেমন ফল ভোগ করলেন মৃত্যুর ময়ে। যিনি পুণ্য কর্ম করেন তিনি শুভ ফল পান। আবার যিনি পাপ কর্ম রেন তাঁকে অশুভ ফল ভুগতে হয়। বোধি সত্ত্বের সংগীরা সকলেই সারা জীবন র ভাল কাজ করেছিলেন। তাই তাঁরা পরম শান্তিতে দেহত্যাগ করলেন। াধিসত্ত্ব নিজেও দান-ধ্যানাদি অনেক পুণ্য কর্ম করেন। সেজন্য মরণের পরে র উর্ধ্বগতি লাভ হয়।

গৌতম বুদ্ধের কাহিনী এখানে শেষ হল। তারপর পূর্বের ঘটনার সঙ্গে গল্পের সম্বন্ধ দেখাবার জন্য বুদ্ধ বললেন, যাত্রীদলের মধ্যে যে ছিল নায়ক বোধিসত্ত্ব বা ভাবী বুদ্ধ। যে তরুণ ভৃত্যটি পাথর চূর্ণ করে সকলকে দুঃসহ ায় জলদান করেছিল সে এই অধীর ভিক্ষু ভ্রাতা; আর বোধিসত্ত্বের বাকী রা বুদ্ধের সহচর।

বুদ্ধের এই গল্পে ব্রতচ্যুত ভিক্ষু ভাই তাঁর পূর্ব জীবনের অদ্ভুত সাহসের ও ল্লের কথা জেনে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি বুঝলেন, জীবন এক র্ঘ সংগ্রাম। যে এই জীবন যুদ্ধে মনের বল অটল রাখতে পারে এবং সাহস ও ধীরভাবে কর্তব্য পালন করে যায় সেই পরিণামে বিজয়ের গৌরব- ই লাভ করে।

বপনকারী বুদ্ধদেব

ারদ্বাজ নামক কোন ধনী ব্রাহ্মণ ফসলোৎসব সম্পন্ন করতেছিলেন, যখন ব তার ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে তথায় এলেন অন্ন-ভিক্ষার্থ। কয়েকটি তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বললেন, "হে অন্ন ভিক্ষা করার চেয়ে মাঠে গিয়ে শ্রমিকদের মত কাজ করা তোমার ভাল। আমি ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপন করি এবং তার ফলে আমি আহার ন করি। যদি তুমি তদ্রূপ করতে তাহলে তোমাকে আর ভিক্ষা করতে না।"

তদুত্তরে তথাগত বললেন, "হে ব্রাহ্মণ, আমিও ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপ করে থাকি এবং তার ফলেই আমার অন্ন জোটে।" ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলে "তুমি কি কৃষকের কাজ কর? তাহলে তোমার বলদগুলি কোথায়? কোথা বা বীজ ও হল?" তথাগত উত্তর দিলেন, "আমি ধর্ম-বীজ বপন করি, সৎকর্মর বর্ষাই সেই বীজকে অঙ্কুরিত করে। বিবেক ও বিনয়ই আমার হল। আমা মনই বল্লাধারক। আমি ধর্মের হাত ধরে থাকি। আগ্রহই আমার চালক উদ্যমই আমার জলবাহী বলদ। মানব-মনে অজ্ঞানের যে আগাছা জন্মায় ত উচ্ছেদ করার জন্য আমি হল কর্ষণ করি। তাতে নির্বাণের যে অমৃত ফ উৎপন্ন হয় তাই আমার ফসল। এইরূপে সকল দুঃখের অবসান ঘটে।"

তারপর ব্রাহ্মণ স্বর্ণ পাত্রে সুমিষ্ট পায়স ঢেলে বুদ্ধকে দিলেন এবং বল "জগৎগুরু মহস্ত পায়স গ্রহণ করুন। কারণ. গোতম বুদ্ধ যে বীজ বপন ক তা অমৃত ফল দান করে।"

সমাজচ্যুত সন্ন্যাসী

যখন ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে জেতবনে ছিলেন তখন তিনি একদিন ভি পাত্র হাতে নিয়ে ভিক্ষার্থ বাহির হন এবং কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বাড় যান। তখন পুরোহিতের গৃহ-বেদীতে হোমাগ্নি জ্বলছিল। পুরোহিত বুদ্ধ দেখে অবজ্ঞা-ভরে বলে উঠল, "হে ভিক্ষু! ওখানেই দাঁড়াও। হে হতভ শ্রমণ। এদিকে এসো না। তুমি ত সমাজচ্যুত।" তথাগত উত্তর দিে "কে সমাজচ্যুত! আমি, না তুমি। যে ক্রোধ ও ঘৃণার বশীভূত হয়, যে ও ভণ্ড এবং যে ভ্রান্তি ও প্রবঞ্চনায় জড়িত সেই সমাজচ্যুত।"

তথাগত আরো বললেন, "যে উত্তেজনাকারী ও লোভী, যে পাপাসক্ত হিংসুক, যে নির্লজ্জ ও পাপাচরণে ভয়শূন্য তাকে সমাজচ্যুত বলে জান জন্ম দ্বারা কেউ সমাজচ্যুত হয় না, জন্ম দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণও হয় মানুষের সমাজ-চ্যুতি ঘটে, এবং কর্মদ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব বা বুদ্ধত্ব কর্ম দ্বা লাভ হয়।"

কূপপার্শ্বে নারী

প্রিয় শিষ্য আনন্দ বুদ্ধের দ্বারা কোন কার্যে প্রেরিত হন। তিনি গ্রামের কটে একটি কূপের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে মাতঙ্গ জাতির প্রকৃতি নাম্নী লিকাকে দেখেন এবং তার কাছে পানীয় জল চাহেন। প্রকৃতি বল্লে, হ ব্রাহ্মণ, আমি এত দীনহীন যে, আপনাকে পানীয় জল দিতে সাহস হচ্ছে । নীচ কুলে আমার জন্ম। আমার কোন সেবা চাইবেন না। কারণ াতে আপনার সাধুত্বহানি হতে পারে।"

আনন্দ উত্তর দিলেন, "আমি তো জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিনি, আমি ধু জল চেয়েছি।" এই কথা শুনে মাতঙ্গ বালিকার হৃদয় আনন্দে নেচে ঠল এবং সে ভিক্ষুকে জল খেতে দিল। আনন্দ তাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু সে দূরে দূরে তাঁর পশ্চাৎ অনুসরণ করল। আনন্দ শাক্যমুনির শিষ্য শুনে বালিকা বুদ্ধের কাছে গেল এবং করজোড়ে বলল, "হে প্রভো! আমাকে কৃপা করুন। আপনার শিষ্য আনন্দ যথায় থাকেন তথায় আমাকে থাকতে দিন। তাহলে আমি তাঁর দর্শন ও সেবা করতে পারি। কারণ আমি তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করি।"

তথাগত বালিকার ভক্তিভাব বুঝতে পেরে বললেন, "প্রকৃতি! তোমার হৃদয় প্রীতিপূর্ণ, কিন্তু তোমার প্রীতির মর্ম তুমি বুঝতে পারনি। তুমি আনন্দকে ভালবাস না, কিন্তু তার করুণাকে। তিনি তোমাকে যে করুণা দেখিয়েছেন সেটি তুমি নিজে শিক্ষা কর। যে অবস্থায় তুমি আছ তথায় নম্রভাবে সেটি অন্যের প্রতি দেখাও।"

"রাজা গোলামের প্রতি যে দানশীলতা দেখান তাতে মহাপুণ্য হয়। কিন্তু ই গোলামের অধিকতর পুণ্য হয় যদি, তৎপ্রতি সামাজিক অন্যায় বা অবিচার গ্রাহ্য করে সে অন্য মানুষকে করুণা ও মৈত্রী দেখায়। সে তার অত্যাচারীদের তি অবজ্ঞা বা অসূয়া প্রদর্শনে বিরত হয়! এমন কি, যখন সে অত্যাচার তিরোধে অসমর্থ হয় তখনও করুণার সহিত তাদের ঔদ্ধত্য ও অভদ্রতা সহ্য রে। প্রকৃতি, তুমি ভাগ্যবতী। যদিও তুমি জাতিতে মাতঙ্গ তুমি আর্য

নারীগণের আদর্শ। তুমি নীচ কুলে জাত হলেও ব্রাহ্মণরা তোমার সংশিক্ষা পাবে। ন্যায় ও ধর্মের পথ থেকে তুমি কখনও বিচ্যুত হইং তাহলে সিংহাসনস্থা সম্রাজ্ঞীরা তোমার কাছে হার মানবে।"

শান্তি স্থাপক

শোনা যায় যে, দুটি রাজ্য পরস্পর যুযুৎসু হয়েছিল কোন বাঁধের অা সম্বন্ধে বিবাদ হওয়ায়। বুদ্ধ নৃপতিযুগলকে স্ব স্ব সৈন্যদল নিয়ে যুদ্ধার্থ দেখে বিবাদের কারণ জানাতে অনুরোধ করলেন। উভয় পক্ষের অভি শুনে তিনি বললেন, "আমি বুঝতে পারছি যে, তোমাদের অনেকগুলি এ পক্ষে বাঁধটি মূল্যবান। তোমাদের প্রজাদিগকে এটি যে উপকার দেবে তা এর কোন নিজস্ব মূল্য আছে কি?" নৃপতিদ্বয় উত্তর দিলেন, 'না, কোন নিজস্ব মূল্য নেই।'

তথাগত বলতে লাগলেন, "আচ্ছা, যখন আপনারা যুদ্ধরত হবেন নিশ্চয়ই আপনাদের বহু প্রজা আহত ও নিহত হবে এবং আপনাদের জ বিপন্ন হতে পারে।" তাঁরা বললেন, "আপনার কথা খুবই সত্য। প্রজ ব্যতীত আমাদের প্রাণনাশের সম্ভাবনাও আছে।" বুদ্ধ বললেন, 'মা রক্ত অপেক্ষা জড় মাটির মূল্য কি বেশী?' রাজারা নিবেদন করলেন, 'নি না। প্রজাদের জীবন, সর্বোপরি রাজাদের জীবন অমূল্য।' তখন ত উপসংহার করলেন, মূল্যহীন বস্তুর জন্য মূল্যবান্ বস্তুকে পণ করা উচিত বুদ্ধবাক্যে নৃপতিযুগলের ক্রোধ উপশান্ত হল এবং তাঁরা শান্তিপূর্ণ চুক্তি যুদ্ধবিরত হলেন।

ক্ষুধিত কুকুর

কোন মহারাজা প্রজাপীড়ক ছিলেন। প্রজারা তাঁকে অবজ্ঞা করত। তথাগত তাঁর রাজ্যে এলেন তখন মহারাজা তাঁকে দেখতে খুব ইচ্ছা এ করলেন। যেখানে তথাগত অবস্থান করছিলেন তথায় গিয়ে মহারাজা জি

:লেন, "হে শাক্যমুনি ! তুমি আমাকে এমন শিক্ষা দিতে পার যা আমার :ক বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট ও লাভবান্ করতে পারে।"

তথাগত বললেন, 'আমি তোমাকে ক্ষুধিত কুকুরের গল্পটি বলব।' একদা ান দুর্দান্ত অত্যাচারী রাজা বাস করতেন। দেবরাজ ইন্দ্র শিকারীবেশে ধামে এলেন মাতালি দৈত্যকে সঙ্গে নিয়ে। দৈত্য বিশালকায় কুকুরের ধরে ইন্দ্রের সঙ্গে ছিল। শিকারী ও কুকুর প্রাসাদে ঢুকে পড়ল। কুকুরটি ১ জোরে চীৎকার করে উঠল যে, তার শব্দে রাজবাড়ীর ভিত্তি পর্য্যন্ত কেঁপে ল। অত্যাচারী নরপতি সেই ভীতিপ্রদ শিকারীকে স্বীয় সিংহাসনের ছে ডেকে আনল এবং তার ভীষণ চীৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করল। কারী বলল্, কুকুরটি ক্ষুধিত। তখন সন্ত্রস্ত রাজা কুকুরের জন্য খাবার নতে আদেশ দিলেন। রাজভোজের জন্য যত আহার্য্য প্রস্তুত হয়েছিল সমুদয় অবিলম্বে কুকুরের মুখে চলে গেল ; কিন্তু তথাপি সে পূর্ব্ববৎ ভীষণ ংকার করতে লাগল। আরও খাদ্য আনীত হল এবং রাজভাণ্ডার নিঃশেষিত য়া সত্ত্বেও কুকুরের ক্ষুধা-নিবৃত্তি হল না। তখন অত্যাচারী মরিয়া হয়ে জ্ঞাসা করলেন, "এই অদ্ভুত জন্তুর ক্ষুধা কি কিছুতেই নিবৃত্ত হবে না?" কারী উত্তর দিলেন, 'না, কিছুতেই না। তার সমস্ত শত্রুর মাংস খেলেই াত তার ক্ষুন্নিবৃত্তি হতে পারে।' অত্যাচারী ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, াব শত্রু কারা?' শিকারী উত্তর দিল, "এই রাজ্যে যতক্ষণ একটিও ক্ষুধিত ুষ থাকবে ততক্ষণ কুকুর চীৎকার করবে। যারা অন্যায় করে বা াকে পীড়া দেয় তারাই ওর শত্রু।" মানবপীড়ক অত্যাচারী রাজা অন্যায় কার্য স্মরণ করে অনুতপ্ত হলেন এবং তাঁর জীবনে ধর্মশিক্ষা নিতে লেন।

ভগবান্ বুদ্ধ গল্পটি শেষ করে বিষন্ন বদনে রাজাকে সম্বোধনপূর্বক বললেন, াগত শক্তিশালীদের আধ্যাত্মিক শ্রবণশক্তি বাড়িয়ে দিতে পারেন। াজন্, আপনি যখন কুকুরের চীৎকার শুনবেন তখন বুদ্ধের কথা ভাববেন। লে আপনি দৈত্যকে শান্ত করবার উপায় জানতে পারবেন।"

স্বেচ্ছাচারী শাসক

রাজা ব্রহ্মদত্ত দৈবাৎ এক সুন্দরী বৈশ্যপত্নীকে দেখতে পেলেন এবং ত প্রতি মনে মনে অনুরক্ত হয়ে একটি অমূল্য মণিকে গুপ্তভাবে বৈশ্যের গাড়ী নিক্ষেপ করতে আদেশ দিলেন। মণি হৃত হওয়ায় অন্বেষণ চলল এবং পা গেল। চুরির অপরাধে বৈশ্যকে গ্রেপ্তার করা হল এবং রাজা আসা স্বপক্ষ সমর্থন মনোযোগ দিযে শোনাব ভাণ করলেন এবং দুঃখের স বৈশ্যকে ফাঁসির হুকুম দিলেন। রাজার আদেশে বৈশ্য পত্নী রাজার অন্তঃপ প্রেরিত হল।

ব্রহ্মদত্ত স্বয়ং বৈশ্যের ফাঁসি দেখতে গেলেন, কারণ এইরূপ দৃশ্য তাঁকে আহ্লাদিত করত। মৃত্যুর দণ্ডাজ্ঞা পেযে বৈশ্য যখন গভীর কাতরতার স কুখ্যাত বিচারকের প্রতি দৃষ্টিপাত করল তখন বুদ্ধ-প্রজ্ঞার বিদ্যুতে রাজ কামাসক্ত চিত্ত চমকিত হল। জহ্লাদ যখন বধ্য ব্যক্তির বধার্থ খড়্গ তুলে তখন ব্রহ্মদত্তের মনে অনুশোচনা এল। তিনি নিজেকে মানস নয়নে কাষ্ঠের উপরে স্থাপিত দেখলেন। তখন তিনি চীৎকার করে বলে উঠ 'জহ্লাদ, থামো। রাজাই বধ্য, বৈশ্য নয়। রাজার চীৎকার হতে না হ জহ্লাদের খড়্গ বৈশ্যের রক্তে রঞ্জিত হযে গেল।

নির্দোষ বৈশ্য নিহত দেখে রাজা মূর্চ্ছিত হলেন। যখন তাঁর চে ফিরে এল তখন পরিবর্তনের ঝড় তাঁর মনে বইল। তিনি আর নি শাসক রইলেন না। মৈত্রী ও করুণার ভাবে তাঁর জীবন মধুময় হয়ে গে লোকে বলতে লাগল, ব্রহ্মদত্ত ব্রাহ্মণের স্বভাব লাভ করেছেন।

চুরি ও বধাদি কুকাজ যারা করে তারা পাপিষ্ঠ। আত্মপ্রতারণার চ সীমায় তারা উপনীত। স্বকৃত কর্মের ফল প্রত্যেককে ভোগ করতেই হ ভগবান বুদ্ধ জেতবনে কোন ভিক্ষুকে বলেছিলেন, "অন্তরীক্ষে, সমুদ্রমধ্যে পর্বতবিবরে প্রবেশ করলেও পাপ কর্মের ফল কেউ এড়াতে পারবে ন ইহলোকে এমন কোন স্থান নেই যেখানে থাকলে কুকর্মের ফল বা মৃ এড়ান যায়।"

বাসবদত্তা*

মথুরাপুরীতে বাসবদত্তা নামে এক বারাঙ্গনা ছিল। সে হঠাৎ বুদ্ধ-শিষ্য াগুপ্তকে দেখতে পেল। উপগুপ্ত দীর্ঘকায়, সুদর্শন ও তারুণ্যমণ্ডিত ছিলেন। সবদত্তা তাঁর প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হল। সে তরুণ শ্রমণকে নিমন্ত্রণ করে ঠাল। কিন্তু উপগুপ্ত উত্তর দিলেন, "বাসবদত্তাকে দেখা করবার সময় এখনও াগত হয়নি উপগুপ্তের পক্ষে।"

বারাঙ্গনা উত্তরে বিস্মিতা হয়ে আবার শ্রমণকে বলে পাঠালেন, বাসবদত্তা রমপ্রার্থিনী, স্বর্ণকাঙ্ক্ষিণী নয় উপগুপ্তের কাছে। উপগুপ্ত পূর্ব প্রকার বাধ্য উত্তর দিলেন, কিন্তু নিজে এলেন না। কয়েক মাস পরে বাসবদত্তা ধান শিল্পীর প্রেমে পড়ে এবং যুগপৎ মথুরাগত ধনী বণিকও বাসদত্তার প্রতি নুরক্ত হন। বণিকের ঐশ্বর্যলোভে এবং অন্য প্রেমিকের ঈর্ষাভয়ে বাসবদত্তা ধান শিল্পীর বধের ষড়যন্ত্র করল এবং তাকে বধ করে তার মৃতদেহ আস্তাকুড়ে তে রাখল।

যখন প্রধান শিল্পী হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট হলেন তখন তাঁর আত্মীয় স্বজনরা সন্ধান রতে করতে তাঁর শবদেহ পেলেন। বিচারকের দ্বারা বাসবদত্তার বিচার ল। বিচারে সে শিল্পীর হন্তারূপে প্রমাণিত হওয়ায় তার এই দণ্ড হল, 'র নাক-কান, ও হাত পা কেটে তাকে কবরখানায় ফেলে দেওয়া হল। বদত্তা প্রেমিকা রমণী ছিল। চাকরাণীদের প্রতি তার দয়া-দাক্ষিণ্যও া অদ্ভুত। তার এক কুমারী ভৃত্য কবরখানায় তার ভূতপূর্ব কর্ত্রীকে ভরে সেবা করল এবং তার মৃত্যু-যন্ত্রণা হ্রাস করবার জন্য চেষ্টিতা হল। হত মুমূর্ষু বাসদত্তার ক্ষত স্থানগুলিতে বহু কাক বসে ঠোকরাচ্ছিল। কুমারী ্য কাকগুলোকে তাড়িয়ে দিল। ঠিক এই সময়েই উপগুপ্ত বাসবদত্তাকে খতে এলেন।

* বার্নফ প্রণীত Introduction to the History of Indian uddhism (প্যারিস, ১৮৮৪) দ্রষ্টব্য।

যখন উপগুপ্ত এলেন তখন মুমূর্ষু রমণী তাঁর দাসীকে আদেশ দিলেন ত কর্তিত ও সংচ্ছিন্ন অঙ্গগুলি কুড়িয়ে এনে এক খানি কাপড়ে ঢাকা দিয়ে রাখতে উপগুপ্ত এসে সদয়ভাবে বাসবদত্তার কাছে বসলেন। তখন বারাঙ্গনা ধৃষ্ট সহকারে শ্রমণকে বললেন, "একদা এই দেহ পদ্মের মত সুগন্ধিত ছিল তখন আপনাকে আমার প্রেমার্ঘ্য পাঠিয়েছিলাম। সে সময় আমি মুক্তাহা ও সক্ষ মশ্‌লিনে আবৃত ছিলাম। এখন আমি ঘাতকের খড়্গে ছিন্ন ভি এবং আমার সুন্দর শরীর রক্তাক্ত ও মলিন।"

তরুণ সন্ন্যাসী সুশান্ত ভাবে উত্তর দিলেন, "ভগিনী, আমি আমার সুখে জন্য তোমার কাছে আসি নি। তুমি যে সব সুষমা হারিয়েছ তদপে মনোহর সুষমা দানের জন্য আমি এসেছি। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তথাগ ধরাধামে বিচরণ করছেন এবং তাঁর অমৃত বাণী শিক্ষা দিচ্ছেন। তখন তু প্রলোভনে বেষ্টিত এবং তুমি ঐহিক সুখের আকাঙ্ক্ষা ও ভোগ-লিপ্সায় মোহি ছিলে তখন তুমি ধর্ম-কথায় কান দিতে না। স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে না ভোগ-সুখের মোহে অভিভূত ছিলে বলে তুমি বুদ্ধ-বাণী শুনতেও না। সুন্দ দেহের আকর্ষণ সুতীব্র এবং অচিরে মনকে প্রলুব্ধ করে। তুমি প্রলো এড়াতে পারনি এবং নশ্বর সৌন্দর্যে আস্থা স্থাপন করেছিলে। যদি তু আমাদের গুরু বুদ্ধের বাণী গ্রহণ কর তাহলে এমন সৌন্দর্যের অধিকারিণী হ যা কখনও ম্লান হয় না, এবং এমন শান্তিতে পরিপূর্ণা হবে যা অনিত্য ঐহি ভোগে পাওয়া যায় না।"

বাসবদত্তার ব্যথিত হৃদয় শান্তি বারিতে শীতল হল। দিব্যানন্দে ত দৈহিক কষ্ট-যন্ত্রণাও অবসিত হল। সে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিয়ে স্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত শান্ত চিত্তে সহ্য করে দেহত্যাগ করল।

জম্বুনদে বিবাহভোজ

জম্বুনদবাসী কোন ব্যক্তির বিবাহের কথা ছিল পর দিন। সে ভাবে বুদ্ধদেব কি আমার বিবাহভোজে উপস্থিত থাকবেন? তথাগত তার বাড়ী

দিয়ে যেতে যেতে তাকে দেখলেন, এবং বরের অন্তরের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা তে পেরে তা পূর্ণ করতে সম্মত হলেন। বরের আয়োজন নির্ধারিত ছিল। তথাগত বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে তার বাড়ীতে এলেন সে যথাসাধ্য তাঁদের ; অভিবাদন ও অভ্যর্থনা করে প্রার্থনা জানালে, "হে ভগবন্, আপনি ও নার শিষ্যবৃন্দ আমার পর্ণকুটীরে পরিতৃপ্তি সহকারে ভিক্ষা নিয়ে আমাকে র্থ করুন।"

যখন সাধুরা ভোজনে ব্যাপৃত ছিলেন তখন বরের বাড়ীতে পলান্ন ও য়াদি প্রচুর পরিমাণে ছিল, আহার্য্যের অভাব পড়ল না। তা দেখে বর র্য্যান্বিত হয়ে ভাবল, "কি অলৌকিক ঘটনা! আমার আত্মীয় স্বজনগণের ও আয়োজন করলে ভাল হতো। তা হলে তাদেরও আমন্ত্রণ করতে তাম।" যখন এই চিন্তা বরের মনে চলছিল তখন তার সব আত্মীয় স্বজন হুত হয়েও তথায় এসে পড়ল। যদিও ভোজকক্ষ বড় ছিল না তথাপি য নবাগতদের জন্য স্থানাভাব হল না। তাঁরা স্বচ্ছন্দে বসে আহার করলেন, দের জন্যও আহার্য সঙ্কুলান হয়ে গেল।

এতগুলি অতিথিকে প্রফুল্ল ও পরিতৃপ্ত দেখে তথাগত আনন্দিত হলেন। ন ধর্মপ্রসঙ্গ করে তাদিগকে অনুপ্রাণিত করলেন এবং শাশ্বত সুখের সন্ধান ান। সমাগত অতিথিবৃন্দকে সম্বোধন করে বুদ্ধদেব বললেন, "যে দাম্পত্য- ্মে দুটি প্রেমিক হৃদয় সম্বদ্ধ হয় সেটাকেই শ্রেষ্ঠ সুখ বলে মানুষ কল্পনা করে। ন্তু তার চেয়েও উৎকৃষ্টতর সুখ আছে। সে সুখ জ্ঞান-জাত, সত্য-লব্ধ। তে পতি পত্নী বিচ্ছিন্ন হয়। কিন্তু যে সত্যধর্মের সঙ্গে পরিণীত হয় মৃত্যু কে প্রভাবিত করতে পারে না। অতএব সত্যধর্মের সঙ্গে বিবাহিত হও। পতি তার পত্নীকে ভালবাসে এবং তার সঙ্গে শাশ্বত মিলন চায় সে স্বীয় ীর প্রতি সত্যধর্মবৎ বিশ্বস্ত হবে। পত্নীও সেরূপ পতিকে প্রাণপণে বিশ্বাস, া ও সেবা করবে। পত্নীও যদি পতির মত হয় তাহলে পতিও তাকে সম্মান পালন করবে। পতি ও পত্নী ধর্মপথে চললে তাদের বিবাহিত জীবন কর ও শান্তিপ্রদ হয়।' তাদের ছেলেমেয়েরাও পিতামাতার মত ধর্মশীল

হয় এবং বংশের মুখোজ্জ্বল করে। তোমরা কেউ জীবনে একক থেকো না বিশুদ্ধ প্রেমে প্র তাকে চরম সত্যের সহিত সম্বন্ধ হও। যখন মার তোমাদে দৃশ্য সম্পর্ক ছিন্ন করতে আসবে তখন তোমরা সত্যে বেঁচে থাকবে। সত্য ঃ সনাতন। তোমরা ধর্মকে আশ্রয় করলে অমর জীবন লাভ করবে।"

তখন তথায় আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যাঁদে ধর্মজীবন বুদ্ধ-বাক্যে বলবত্তর হয়নি। তারা সকলে ধর্মজীবনের মধুরতা উপলা করে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিলেন।

চোরের সন্ধানে বন্ধুদল

শিষ্যবৃন্দকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে তথাগত স্বয়ং নানা স্থানে ঘুরে উর্ব গ্রামে উপস্থি হলেন। পথে কোন কুঞ্জবনে বিশ্রামার্থ তিনি উপবে করলেন। সেই কুঞ্জে ত্রিশটি বন্ধু মিলে স্ব স্ব পত্নীর সাথে প্রেমালাপে প্র ছিলেন। যখন তাঁরা এই কর্মে রত ছিলেন তখন তাঁদের কিছু জিনিষ অপহৃত হল।

তখন সমগ্র বন্ধুদল চোরের সন্ধানে বাহির হন এবং তথাগতকে বৃক্ষত উপবিষ্ট দেখে যথাযোগ্য অভিবাদনান্তে জিজ্ঞাসা করেন, "প্রভো! আপনি। আমাদের জিনিষপত্র নিয়ে যেতে কোন চোরকে এই পথে দেখেছেন?" তথাগ উত্তর দিলেন, 'তোমরা চোরের সন্ধান করবে, না স্ব স্ব আত্মার সন্ধানে যাবে এই দুটির মধ্যে কোনটি অধিকতর কল্যাণকর? তরুণরা উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠ আত্মানুসন্ধানেই আমরা যাব। তথাগত বললেন, 'বেশ কথা। তবে ব আমি তোমাদিগকে ধর্মশিক্ষা দিব।'

তথাগতের অনিবার্য আহ্বানে তরুণদল তাঁর পদপ্রান্তে বসলেন এ মনোযোগ দিয়ে বুদ্ধবাণী শুনলেন। সত্যের আলোক পেয়ে তাঁরা ধ প্রশংসা করলেন এবং বুদ্ধের শরণ নিলেন।

যমরাজ ভবনে

কোন ধর্মপ্রাণ সন্তান-বৎসল ব্রাহ্মণের গভীর বিবেক ছিল না। তাঁর এক মান্ উন্নতিশীল পুত্র ছিল। পুত্রটি সাত বৎসর বয়সে কঠিন রোগে আক্রান্ত ও মারা যায়। হতভাগ্য পিতা পুত্রশোকে আত্মহারা হলেন এবং পুত্রের দেহের উপর মৃতবৎ পড়ে রইলেন।

তাঁর বন্ধুবর্গ এসে মৃত পুত্রটিকে ভূগর্ভে প্রোথিত করলেন। পিতা সচেতন ও এত শোক-বিহ্বল রইলেন যে, তিনি উন্মত্ত মানুষের মত ব্যবহার করতে লেন। তিনি আর চোখের জল ফেললেন না; কিন্তু এখানে ওখানে ঘুরে র সকলকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, মশায়, মৃত্যুপুরী কোথায় বলতে রেন? কারণ তিনি সঙ্কল্প করেছিলেন যমলোকে গিয়ে মৃত পুত্রকে মর্ত্য-ধামে রিয়ে আনবেন।

ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে করতে শোকার্ত পিতা ব্রাহ্মণ-মন্দিরে উপস্থিত হলেন ং অনেকগুলি ধর্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করে ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নলোকে বিচরণ লে তিনি কোন সুগভীর গিরিবর্ত্মে এসে পড়লেন এবং তথায় অনেকগুলি ণের সাক্ষাৎ পেলেন, যাঁরা পরা প্রজ্ঞা লাভ করেছেন। তিনি সবিনয়ে দিগকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশায়গণ, আপনারা অনুগ্রহ করে আমাকে বলে ত পারেন যমরাজ ভবন কোথায়?' তাঁরা বললেন, 'হে বন্ধু, তুমি তা জানতে ও কেন?' তখন তিনি তাঁর দুঃখের কাহিনী বললেন এবং স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত লেন। শ্রমণরা তাঁর ভ্রান্ত দশার প্রতি করুণার্দ্র হয়ে বললেন, "কোন র্ত্যবাসী যমলোকে যেতে পারে না। কিন্তু দুইশত ক্রোশ পশ্চিমে একটি বিশাল র আছে, যেখানে বহু সংপ্রেত বাস করে। প্রত্যেক মাসের অষ্টম দিবসে রাজ সেখানে আসেন। তুমি সেখানে গেলে তাঁর দেখা পাবে এবং তাঁকে মার বর চাইবে।"

ব্রাহ্মণ এই সংবাদে আহ্লাদিত হয়ে উক্ত নগরীতে গেলেন এবং শ্রমণরা মন বলেছিলেন তেমনি সহরটিকে দেখতে পেলেন। ভয়ঙ্কর যমরাজের

সম্মুখে তিনি আনীত হলে যমরাজ তাঁর অনুরোধ শুনে বললেন, "তোম পুত্র প্রাচ্যোদ্যানে আছে ও খেলা করছে। তুমি সেখানে যাও এবং তা তোমার সঙ্গে এখানে আসতে বল।" সুখী পিতা যমরাজকে জিজ্ঞাসা করে 'আমার পুত্র কোন পুণ্য কর্ম না করে কিরূপে স্বর্গবাসের সৌভাগ্য লাভ করল যমরাজ উত্তর দিলেন, 'সম্যক্ সম্বুদ্ধ তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিয়ে ম গিয়েছিল বলে সে স্বর্গসুখের অধিকারী হল, কোন পুণ্য কর্ম করে নয়।' বলেন, 'প্রীতিভরা বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয় শান্তিময় ও সুশীতল বৃক্ষছায়ার ন নরলোক থেকে দেবলোক পর্যন্ত প্রসারিত।' এই বুদ্ধ বাণী রাজকীয় শি লিপির উপরে রাজার মোহরের ছাপের মত আশ্বাসপ্রদ।

সুখী পিতা প্রাচ্য উদ্যানে গিয়ে দেখলেন, তাঁর পুত্র অন্যান্য শিশুদের স ক্রীড়াসক্ত। স্বর্গবাসীর আনন্দে ও শান্তিতে সেই শিশুরা সমুজ্জ্বল হয়েছি তিনি তাঁর পুত্রের কাছে ছুটে গেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "বাব তুমি আমাকে চিনতে পারছ না? যে পিতা কত স্নেহে তোমাকে পা করত এবং অসুখে ঔষধপত্রাদি দিত আমি সেই ব্যক্তি। আমার স জীবলোকে ফিরে চল।" অন্য খেলার সাথীদের কাছে ফিরে যাবার জন্য ে করতে করতে সে পিতাকে তিরস্কার সহকারে বলল, "পিতা ও পুত্র বাক্য আপনি আর ব্যবহার করবেন না। বর্তমান অবস্থায় আমি সকল মা সম্পর্কের অতীত এবং সম্পূর্ণ মোহমুক্ত।"

পুত্রের কথা শুনে পিতা সেখান থেকে চলে গেলেন। যখন ব্রাহ্মণের ঘ ভাঙল তিনি জেগে উঠলেন এবং বুদ্ধের কথা ভাবলেন। তাঁর কাছে গি দুঃখের কথা বলতে ও সান্ত্বনা চাইতে তাঁর ইচ্ছা হল। তিনি জেতবনে উপস্থি হয়ে বুদ্ধকে তাঁর সকল কাহিনী জানালেন। মৃতপুত্র ব্রাহ্মণ পিতাকে চিনতে পারায় তাঁর দুঃখের সীমা ছিল না। বুদ্ধ ব্রাহ্মণের কথা শুনে বললেন, 'সত তুমি আত্মপ্রতারিত হয়েছ। যখন মানুষ মরে যায় তখন তার দেহ পঞ্চভূ বিলীন হয়, কিন্তু তার আত্মা প্রোথিত হয় না। আত্মা পুণ্য কর্মফলে ঊর্ধ্ব লোকে যায় এবং পিতা-মাতা, স্ত্রীপুত্রাদি সম্পর্ক বিস্মৃত হয়। অতিথি যে

শ্রয়দাতার গৃহ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সকল স্মৃতি ভুলে যায় তেমনি মৃত ৃির আত্মা মৃত্যুকালে মর্ত্যের সম্বন্ধ ছিন্ন করে। বড়ই আশ্চর্য যে, যা চলে য় তা নিয়েই মানুষ ব্যস্ত হয়। কিন্তু বেগবান্ জলপ্রপাতের মত জীবনের ন্তু অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। অন্ধ যেমন দীপশিখা দেখতে পায় না, তেমনি ; স্বীয় কর্তব্য ভুলে যায়। বিবেকী জাগতিক সম্বন্ধের নশ্বরতা বুঝতে পেরে গুলি থেকে নিবৃত্ত হয়। তাই তারা দুঃখাবর্তে পড়ে মরে না। পরমার্থ ইভঙ্গী মানুষকে পার্থিব সুখদুঃখের উপরে তুলে ধরে এবং চিরশান্তির ধিকারী করে।"

ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে ভিক্ষুসংঘে যোগদানের অনুমতি প্রার্থনা করলেন এবং নিজ থিত অন্তরকে সান্ত্বনা দানের জন্য দিব্যজ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত হলেন।

সরিষা বীজ

কোন ধনী তাঁর সঞ্চিত স্বর্ণ হঠাৎ ভস্মে পরিণত দেখে শোকে শয্যাশায়ী লেন এবং আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলেন। তাঁর এক বন্ধু তাঁর অসুখের খবর রে তাঁকে দেখতে এলেন এবং তাঁর দুঃখের কথা ও কারণ শুনলেন। বন্ধুটি ব শুনে বললেন, "তুমি তোমার স্বর্ণের কোন সদ্‌ব্যবহার করনি। যখন মি উহা সঞ্চয় করেছিলে তখন উহা ভস্মাপেক্ষা উত্তম ছিল না। এখন মার পরামর্শ শোন। বাজারে মাদুর পেতে এই ভস্মগুলি তার উপর শীকৃত রেখে তা বিক্রয়ের ভাণ কর।" ধনী স্বীয় বন্ধুর পরামর্শ অনুযায়ী জ করলেন। যখন প্রতিবেশীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ছাই বিক্রয় রছ কেন? ধনী উত্তর দিলেন, 'আমি আমার পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ার্থ এনেছি।'

কিছুক্ষণ পরে অনাথা দরিদ্রা বালিকা কৃশা গোতমী সেই পথ দিয়ে চ্ছিল। সে বাজারে ধনীকে দেখতে পেয়ে বলল, আপনি সোণারূপা ক্রয়ার্থ রাশীকৃত করেছেন কেন? তখন ধনী বল্লেন, তুমি সেই সোণারূপা তে দাও। কৃশা গোতমী এক মুঠো ছাই নিল। আশ্চর্য্য! ছাই তার তে স্বর্ণে পরিণত হল। কৃশা গোতমী ধর্মজ্ঞান সম্পন্না ছিল বলে সর্ববস্তুর

প্রকৃত মূল্য বুঝতে পারত। এইভাবে ধনী তার সঙ্গে স্বপুত্রের বিয়ে দি এবং বললেন, 'অনেকের কাছে সোণা ভস্মের চেয়ে উৎকৃষ্ট নয়; কিন্তু গৌতমীর হাতে ভস্ম স্বর্ণে পরিণত হয়।'

কৃশা গৌতমীর একটি মাত্র পুত্র হল এবং সে মারা গেল। শোকে মৃত শিশুকে বুকে নিয়ে প্রতিবেশী দর বাড়ী বাড়ী ঘুরে জিজ্ঞাসা করতে লা এই ছেলে কে বাচাবার কোন ঔষধ তোমরা কেউ জান? সকলে মুখ বলতে লাগল, 'পুত্রশোকে মেয়েটি আত্মহারা হয়েছে। মৃত পুত্র কি বাঁচে অবশেষে কৃশা গৌতমীর সঙ্গে একজনের দেখা হল, যে তার প্রশ্নের এই দিল, 'আমি তোমার ছেলের জন্য কোন ঔষধ দিতে পারি না; কিন্তু আমি বৈদ্য জানি, যিনি মৃতকে বাঁচাতে পারেন।' পুত্রহারা জননী ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞ করল, 'আপনি দয়া করে বলুন, তিনি কে।' লোকটি উত্তর দিল, 'স শাক্যমুনির কাছে যাও।' কৃশা গৌতমী ক্ষিপ্র বেগে বুদ্ধের কাছে গেল চীৎকার করে বলল, 'ভগবন্! আপনি অনুগ্রহ করে সেই ঔষধটি দিন, য আমার মরা ছেলেটি বেঁচে উঠবে।'

বুদ্ধ উত্তর দিলেন, এক মুঠো সরিষা আমি চাই। মাতা যখন তা শীঘ্র দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন তখন বুদ্ধ বললেন সেই সরিষা এমন গৃহ থেকে চাই যেখানে কোন পিতা, পুত্র, বন্ধু বা পতি মরেনি। হতভাগ্য কৃশা গৌ বাড়ী বাড়ী গিয়ে এক মুঠো সরিষা চাইল। সকলে তার কথা শুনে দুঃ হলো এবং সরিষা এনে দিল। কিন্তু যখন গৌতমী তাদিগকে জিজ্ঞাসা ক এ গৃহে কোন পুত্র বা কন্যা, পিতা বা মাতা মরেনি তো? তারা সেই প্রশ্ন শোকার্ত হয়ে উত্তর দিল, 'হায়! জীবিত লোক অতি অল্পই, কিন্তু মৃ সংখ্যা অগণ্য।' গৌতমী এমন কোন গৃহ পেল না, যেখানে মৃত্যুর কাল জ্বলে ওঠেনি।

গৌতমী হতাশ ও ক্লান্ত হয়ে পথের ধারে বসে পড়ল। সেখানে শহরের আলোকমালার দিকে তাকিয়ে সে দেখল, সেগুলি কেমন বিদ্যু মতন জ্বলছে ও নিভছে। নৈশ অন্ধকার ঘনিয়ে এল এবং ধরাকে

লল। গৌতমী মানুষের অদৃষ্ট ভাগ্যের কথা ভাবতে লাগল। মানুষের বন-প্রদীপ কেমন জ্বলে উঠে, আবার নিভে যায়! সে বুঝতে পারল, াকাধিক্যে সে কত মূঢ় হয়েছে! মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী, অপরিহার্য্য তখন ্য-শোকে অধীর হওয়া অনুচিত। সে মৃত্যুশোক দমন করে পুত্রের মৃতদেহ াণে পুঁতে ফেলল। সে বুদ্ধের কাছে ফিরে গেল এবং তাঁর ধর্ম্মে আশ্রয় নিল। অমৃত ব্যথিত অন্তরকে শান্ত করতে পারে তা ধর্ম থেকেই পাওয়া যায়।

বুদ্ধ তাকে বললেন, ইহলোকে মানুষের জীবন জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর দ্বারা বলিত। পদ্মপত্রস্থ জলবৎ উহা ক্ষণস্থায়ী এবং যন্ত্রণাদায়ক। জীবিত ক্তির পক্ষে মৃত্যু এড়ান অসম্ভব। জরা ও বার্ধক্য মানুষকে গ্রাস করবেই। মন পাকা ফল গাছ থেকে পড়ে যায় তেমনি জাত ব্যক্তি মৃত্যুর কবলে ড়। ক্ষণভঙ্গুর মৃৎপাত্রের মত মানব জীবন অস্থায়ী। তরুণ ও বয়স্ক, জ্ঞানী মূর্খ সকলেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। মৃত ব্যক্তিরাও জীবিত পিতা বা পুত্রকে চাতে পারে না। দেখ! এদিকে মানুষ দুঃখে শোকে অভিভূত হয়ে বিলাপ রছে; আর ওদিকে এক একজন মরে যাচ্ছে, যেমন ষাঁড়কে কসাইখানায় যে যায়। জরা-মৃত্যু অনিবার্য জেনে বিবেকীরা শোক করেন না, মূর্খরাই াক করে থাকে। কাঁদলে বা শোক করলে মানুষ শান্তি পায় না। তাতে কষ্ট ড়ে এবং দেহ কষ্ট ভোগে। তুমি কেঁদে রুগ্ন ও মলিন হলেও বা আহার-নিদ্রা াগ করলেও তোমার মৃতপুত্র বেঁচে উঠবে না। এ জগতে মানুষ যেমন াজ করে মৃত্যুর পরে তার তেমনি ভাগ্য হয়। যদিও মানুষ এক শত বৎসর তারও বেশী বাঁচে তার পরেও তাকে আত্মীয়স্বজন ছেড়ে চলে যেতে হবে। স্বকামা শোকদুঃখ ও অভিমানের যন্ত্রণাদায়ক তীরগুলি তুলে ফেলে দেয়। ব্যাধি, শোকদুঃখ সহন দ্বারাই পরাজিত হয়, অতিক্রান্ত হয়।

স্রোতোপরি বুদ্ধানুসরণ

শ্রাবস্তীর দক্ষিণে যে মহানদী ছিল তার দুই তীরস্থ গ্রামে পাঁচশত ঘর াক বাস করত। বুদ্ধ ধর্মালোক দানের উদ্দেশ্যে উক্ত গ্রামে উপস্থিত হলেন।

তথায় তিনি নদীতীরে একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করলেন। গ্রামবাসীরা তঁ দিব্য অঙ্গকান্তি দেখে দলে দলে আকৃষ্ট হল এবং তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করল কিন্তু যখন তিনি ধর্মপ্রচার করতে আরম্ভ করলেন তখন কেউ তাঁর কথা বি করল না।

যখন বিশ্ববন্দ্য তথাগত শ্রাবস্তী ছেড়ে এলেন তখন সারিপুত্র তাঁকে দ করবার ও তাঁর বাণী শোনবার জন্য আগ্রহান্বিত হলেন। তিনি নদীতী এসে দেখলেন, উহার জল খুব গভীর এবং স্রোতও প্রখর। তা দেখেও তি নিরুৎসাহ হলেন না, বরং ভাবলেন, "এই স্রোত আমাকে বাধা দিতে পার না। আমি ভগবানের কাছে যাব এবং তাকে দর্শন করব।" এইভাবে তি জলে নেমে পড়লেন। তখন দেখলেন, নদীর স্রোত প্রস্তরখণ্ডের মত স্থি হয়ে গেল। তিনি যখন নদীর মধ্য স্থলে গেলেন তখন উত্তাল তরঙ্গের মা পড়লেন। তখন তাঁর পা পিছলে গেল এবং তিনি ডুবতে লাগলেন। কি পুনরায় মনের জোর ও হৃদয়ের বিশ্বাস জাগ্রত করে তিনি অপর পারে উপস্থি হলেন।

গ্রামবাসীরা সারিপুত্রকে নদীপার হতে দেখে বিস্মিত হল। তারা তা জিজ্ঞাসা করল, "পুল বা খেয়া নৌকা নেই; তথাপি আপনি নদী পার হলে কিরূপে?" সারিপুত্র উত্তর দিলেন, 'আমি অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলাম যত দিন বুদ্ধ-বাণী শুনিনি। তাঁর মুক্তিবাণী শোনার আগ্রহে আমি নদীপার হ পেরেছি। বিশ্বাস, কেবল বিশ্বাসই এই আশ্চর্য্য সম্পাদনে আমাকে সম করেছে। তাই আমি তথাগতের সান্নিধ্য-সুখ এখন পাচ্ছি। তখন বু বললেন, 'সারিপুত্র, তুমি যথার্থই বলেছ। তোমার বিশ্বাসের মত বিশ্বাস মানুষকে সংসৃতি-স্রোত থেকে বাঁচাতে পারে এবং ভবসাগরের তীরে নি যায়।' বুদ্ধ স্থানীয় গ্রামবাসীদিগকে ভব-নদী পার হবার জন্য বার বা উপদেশ দিলেন। তাঁর উপদেশে উদ্বুদ্ধ হয়ে শত শত গ্রামবাসী বুদ্ধের কা পঞ্চ শীল গ্রহণ করলেন।

রুগ্ন ভিক্ষু

কোন বৃদ্ধ ভিক্ষুর মেজাজ খুব খিট্‌খিটে ছিল। তিনি এমন এক ঘৃণ্য াগে আক্রান্ত হলেন যে, তার দুর্গন্ধে সকলে পালিয়ে গেল। কেউ তাঁর াছে আসতে বা সেবা করতে চাইল না। যে বিহারে সেই হতভাগ্য ভিক্ষু কতেন তথায় বুদ্ধদেব এসে পড়লেন এবং তাঁর কঠিন অসুখের কথা শুনে াম জল আনিয়ে রুগ্ন ভিক্ষুর ক্ষত স্থানগুলি স্বহস্তে ধুইয়ে দিলেন।

অনন্তর তিনি শিষ্যবৃন্দকে লক্ষ্য করে বললেন, "তথাগত ইহলোকে এসেছেন নহীনের বন্ধু হতে, অসহায়কে রক্ষা করতে, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলকে লন করতে, অন্ধকে চক্ষু দিতে, মূঢ়কে জ্ঞান দিতে এবং বৃদ্ধ ও অনাথের দাবী ক্ষা করতে। এইরূপে তিনি সকলের কাছে বিশ্বপ্রেমের আদর্শ স্থাপন রতে চান। যারা এই সব বিষয়ে বুদ্ধকে অনুসরণ করবে তারা জীবনের ক্ষ্যলাভে সমর্থ হবে, যেমন নদীগুলি সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়।" যতদিন া সেই বিহারে ছিলেন রোজ তিনি সেই রুগ্ন ভিক্ষুর সেবা-শুশ্রূষা করতেন।

নগরের শাসক বুদ্ধকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিতে এলেন এবং তাঁকে রোগীসেবায় ব্যাপৃত খ জিজ্ঞাসা করলেন, রুগ্ন ভিক্ষুর পূর্ব জন্ম সম্বন্ধে।

স্থানীয় শাসকের অনুরোধে বুদ্ধ এই গল্পটি বললেন। পুরাকালে এক দুষ্ট । তার প্রজাদের নিকট হতে যথাসাধ্য ভেট আদায় করতেন। তিনি কোন কর্মচারীকে আদেশ দিলেন একটী বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বেত মারতে। চারী বেত্রাঘাতের ব্যথার কথা না ভেবে রাজার আদেশ পালন করল। । দণ্ডার্হ ব্যক্তি কৃপা ভিক্ষা করলেন তিনি ধীরে ধীরে বেত মারতে লেন। সেই রাজা দেবদত্তরূপে জন্মগ্রহণ করলেন। দেবদত্ত তাঁর ভক্তবৃন্দ ক পরিত্যক্ত হলেন। কারণ তাঁর কড়া মেজাজ কেউ সহ্য করতে পারত তিনি শোচনীয় অবস্থায় অনুতাপ করতে করতে মারা গেলেন। াঘাতকারী কর্মচারী সেই রুগ্ন ভিক্ষু। এই ভিক্ষুর দুর্বাক্যে এবং দুর্ব্যবহারে ারের সকলেই অস্থির হয়ে উঠলেন। তাই তাঁর অসুখের সময় কেউ তাঁর

শুশ্রূষা করতে এলেন না। যে বিশিষ্ট ব্যক্তি কৃপাভিক্ষা করেছিলেন ति বোধিসত্ত্ব! সেই বোধিসত্ত্বই তথাগত রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেছেন। (হতভাগ্য ভিক্ষুকে আমি এখন সাহায্য করছি, কারণ সে আমাকে পূব জ সহানুভূতি করেছিল।

বুদ্ধদেব এই কথাগুলি বার বার বললেন, "যে নির্দোষকে শাস্তি দেয় বা বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনে সে নিশ্চয়ই বিপদে পড়বে। কিন্তু যে ধীরভ দুঃখকষ্ট সহ্য করতে পারে তার জীবন নির্মল হয় এবং সে অপরের : নিবারণের দিব্য যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়।" রুগ্ন ভিক্ষু বুদ্ধের কথা শুনে অনু হলেন এবং স্বীয় দোষ দূরীকরণার্থ প্রতিশ্রুতি দিলেন। বুদ্ধ তাঁকে স্নেহা দানে ধন্য করে অন্য বিহারে চলে গেলেন।

অঙ্গুলিমালা*

ভগবান্ বুদ্ধ যখন ধরাধামে জ্ঞানালোক বিস্তার করতেছিলেন তখন কো রাজ্যের ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পুত্ররূপে অঙ্গুলিমালা ভূমিষ্ঠ হন। গভীর নিশ অঙ্গুলিমালার জন্ম হয়। তাঁর জন্মকালে চার দিকে অগণ্য অশুভ লক্ষণ দে গেল। প্রবল ঝড়-বাতাস চার দিকে কখনো হুঙ্কার, কখনো চীৎকার করছি মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে মুসল ধারে বৃষ্টি পড়তে লাগল, বিদ্যুৎ-চমকে আক বিদীর্ণ হল, ঘন ঘন বজ্রপাতে কোশল নগর কেঁপে উঠল। শৃগাল-কুকুরগু জঙ্গলে চীৎকার করতে লাগল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মেঘের গর্জন ও অন্ধকার উপেক্ষা করে তমসাচ্ছন্ন আকাশে সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর নক্ষত্রপুঞ্জ মিট করে জ্বলতে লাগল। নগরের গৃহে গৃহে অস্ত্রশস্ত্রসমূহ ঝক্‌মক্ করে উঠল।

রাত্রির তুমুল কোলাহলে জাগ্রত হয়ে এবং স্বীয় গাত্রবর্ণ আগুনের মত উঠতে দেখে কোশলরাজ তাঁর প্রাসাদে আতঙ্কিত হলেন। তাঁর আ

* স্বামী অতুলানন্দ লিখিত ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামক ইংরাজী মাসিকে ১৯২৭ জানুযারী প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে এই অংশ রচিত।

ণ কি ? রাজকীয় জ্যোতির্বিৎদিগকে ডেকে পাঠান হল। তাঁরা এসে যখন
া করতে লাগলেন তখন রাজা রুদ্ধ শ্বাসে তাঁদের অভিমত জানবার জন্য
পক্ষা করলেন। গণকদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ তিনি সকলের
ার ফল প্রকাশপূর্বক বললেন, "হে রাজন্! আপনি বৃথা ভীত হবেন না।
ও আজ রাত্রে একটী ভয়ঙ্কর দস্যু জাত হয়েছে সে রাজসিংহাসন অধিকারের
ন চেষ্টা করবে না। তার আতঙ্ক-কাল ক্ষণস্থায়ী হবে।" গণকদের কথায়
স্ত হয়ে রাজা নিশ্চিন্ত ভাবে বিশ্রাম করলেন। গণকরা জ্যোতিষ
অনেক ঘেটে ও বহু গণনা করে জানতে পারলেন, সেই ভাবী দস্যু রাজ-
হিতের নবজাত পুত্র ব্যতীত অন্য কেউ নয়। কিন্তু রাজ-সিংহাসনের কোন
শঙ্কা না থাকায় রাজা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পিতাকে সংবাদ পাঠালেন যে, তাঁর
াতক বেঁচেই থাকবে, তার প্রাণহানির কোন চেষ্টাই করা হবে না।

অঙ্গুলিমালা অসীম শক্তি নিয়ে জন্মেছিল। সে যতই বড় হতে লাগল ততই
শক্তি তরুণ হস্তীতুল্য বেড়ে উঠল। তক্ষশীলা'র প্রধান শিক্ষকের নিকট
শিক্ষার্থ তাকে পাঠান হল। তথায় অন্যান্য ব্রাহ্মণ বালকদের সঙ্গে সে
-বন্দী রইল। গর্বিত, উদ্ধত ও দুরন্ত বালক সাহসিকতা ও সহিষ্ণুতায়
সহপাঠীদিগকে ছাড়িয়ে গেল। কেউ তাকে কোন বিষয়ে বাধা দিতে
করত না। কারণ তার মেজাজ এত কড়া ছিল যে, সামান্য উত্তেজনায়
পেশী-পুষ্ট বাহুদ্বয় অবিলম্বে দোষীকে কঠোর শাস্তি দানে উদ্যত হত।
য ছাত্রদের পক্ষে সেদিন শুভ দিন মনে হল, যে দিন অবশেষে অধ্যাপক
লমালাকে সম্বোধন করে বললেন, "বাবা, তোমার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়েছে।
বাড়ী গিয়ে সুখে শান্তিতে থাক। তোমার শক্তি ও সাহস যেন তোমার
য়, সেগুলি যেন তোমার শত্রু না হয়।" অঙ্গুলিমালার চঞ্চল চিত্তে
কের সদুপদেশ 'অরণ্যে রোদনবৎ' নিষ্ফল হল।

াত্র জীবনের নিয়ন্ত্রিত আচরণ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে এবং পিতামাতার
ধ অগ্রাহ্য করে অঙ্গুলিমালা তার অবরুদ্ধ নিষ্ঠুরতার বাঁধ ভেঙ্গে দিল।
বর্শা ও তলোয়ারাদি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সে কোশলরাজ্যের জাঙ্গিনী

অরণ্যে প্রবেশ করল। পার্শ্ববর্তী রাজপথের অদূরস্থ একটি পাহাড়ে লুকিয়ে থে
সে পথচারীদের নিরীক্ষণ করত এবং কাউকে একক বা অসহায় দেখলেই তা
আক্রমণ ও হত্যা করে তার সর্বস্ব কেড়ে নিত। শুধু তা করেই সে ক্ষান্ত
না; ঔদ্ধত্যের আতিশয্যে নিহত হতভাগ্যদের বুড়ো আঙুলগুলি কেটে আঙু
মালা গেঁথে সে গলায় পরত। তার এই অঙ্গীকৃত অহঙ্কার ছিল যে, এক হা
আঙুল ব্যতীত তার মালা সম্পূর্ণ হবে না। যখন এই ভীষণ কথা চারিদি
রটে গেল লোকে তাকে অঙ্গুলিমালা বলতে লাগল। কিন্তু তার আসল
ছিল হিংসক।

অঙ্গুলিমালার পাশবিক নৃশংসতার ফলে এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়াল
জালিনী অরণ্যের পার্শ্ববর্তী রাজপথ দিয়ে যাওয়া রাত্রে, এমন কি দিনেও, নিরা
হল না। রাজপথ জনশূন্য হয়ে গেল। লোকে ঘরের বাহিরে যেতে ভয় পে
পাছে নির্দয় দস্যুর কবলে পড়ে প্রাণ যায়। তখন রাজা তাঁর প্রজা
প্রাণরক্ষার্থে এই ঘোষণা জারী করলেন, "অবিলম্বে একদল সৈন্য গিয়ে দস্যু
গ্রেপ্তার করুক। অঙ্গুলিমালার মাতা এই রাজকীয় ঘোষণা শুনে এবং
পুত্রের মঙ্গলকামনায় চিন্তিত হয়ে পতিকে বললেন, "আমাদের পুত্র বিপ
তাকে শীঘ্র ডেকে আন এবং লোকের অনিষ্ট করতে বাধা দাও।" কিন্তু প
উত্তর দিলেন, "আমার এমন পুত্রের প্রয়োজন নেই। রাজা তাকে ধরে যা ই
করুন।" জননী পুত্র-স্নেহে অন্ধ হয়ে একাকিনীই পুত্রকে গৃহে ফিরিয়ে আন
এবং তাকে দস্যুবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত করতে রওনা হলেন।

তখন জালিনী অরণ্যের কয়েক যোজন দূরে কোন গ্রামে ত্রিকালজ্ঞ তথা
অবস্থান করতে ছিলেন। তিনি তথায় কোন অশ্বত্থ বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন
মানস নয়নে অঙ্গুলিমালার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান জানতে পারলেন। তি
ভাবলেন, "আজ যদি অঙ্গুলিমালা তার জননীকে কাছে পায় সে নিশ্চয়ই ত
প্রাণনাশ করবে। কারণ, হিংসকের হৃদয় হিংসানলে জর্জরিত এবং ত
প্রতিশ্রুত হাজার অঙ্গুলির মালার সংখ্যা পূর্ণ হতে আর একটি মাত্র বা
আছে। নিশ্চয়ই উক্ত নৃশংস তরুণ তার মায়ের আঙুল কেটে দম্ভ রক্ষা করা

ন্ত ইহাই তার শেষ জন্ম। আমি যদি এখন তার কাছে না যাই তার সর্বনাশ ।। আমি এখনি গিয়ে তাকে মহাপাপ থেকে নিরস্ত করব।' সুতরাং ফাটন ও প্রাতঃকালীন আহার শীঘ্র শেষ করে তিনি এককই জালিনী ণ্যের দিকে যাত্রা করলেন।

অঙ্গুলিমালা স্বীয় জননীকে তার দিকে আসতে দেখে মালার অঙ্গীকৃত ।।। পূরণের আগ্রহে আঙুলগুলি গুণতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ তথাগত বেগে পুত্র ও মাতার মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। তখন হিংসক ভাবলেন, ন আর আমার মাকে আমি বধ করি? এই শ্রমণের বুড়ো আঙুলটী ট নিলেই ত হয়!" এই সংকল্প নিয়ে অসি কোষমুক্ত করে সে ছুটে । তথাগতকে বধ করার জন্য। কিন্তু ইতোমধ্যে তথাগত অরণ্যের দিকে াযে গিয়েছিলেন।

সিংহ যেমন হরিণকে গ্রাস করতে ক্ষিপ্র বেগে ধাবিত হয় তেমনি লমালা তথাগতের পশ্চাদ্বর্তী হলেন। গাছ ও ঝোপের আড়াল দিয়ে সে াযে গেল এবং এক লাফে বুদ্ধের পশ্চাতে এসে দাঁড়াল। সে তরবারি তুলে জোরে নামিয়ে আনল বুদ্ধের মাথা দ্বি-খণ্ডিত করবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু বারি বুদ্ধকে স্পর্শ না করে ডান দিকে ফস্কে মাটিতে পড়ল এবং নীচে গেড়ে । সে মাটিতে বিদ্ধ তরবারী তুলে পশ্চাৎ অপসরণকারী তথাগতকে ত ছুটল। এবারও নিক্ষিপ্ত তরবারী বাম দিকে বেঁকে মাটিতে বিদ্ধ । দুইবার লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ায় দস্যু হতভম্ব হয়ে গেল। সে ভাবল, আমার াত তরবারী কি আজ আমার আদেশ পালনে অস্বীকার করছে! পুনরায় াবা তুলতে সে চেষ্টা করল। কিন্তু সে দেখে আশ্চর্যান্বিত হল, তরবারী ভারী যে, সে তাকে আজ তুলতেই পারছে না! ইতোমধ্যে তথাগত র চালে এগিয়ে পড়লেন। তিনি ডানে বা বামে তাকালেন না, বা একবারও ঘুরালেন না।

অঙ্গুলমালা ভাবল, "কে এই হতভাগ্য সন্ন্যাসী? তিনি আমার উপর তার ণ বিস্তার করেছেন।" সেই ভারী তরবারী তুলবার চেষ্টা না করে তার

লৌহমুষ্টির এক আঘাতে সাধুকে বধ করবার উদ্দেশ্যে সে তাঁর পিছনে পিছ ছুটে গেল। কিন্তু যদিও সে ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে লাগল এবং তার গ থেকে ঘাম বের হল সে স্বাভাবিক গতিতে ধাবমান তথাগতকে অতিক্র করতে পারল না। কিন্তু তার পর হঠাৎ অঙ্গুলিমালা অনুভব করল যে, সে অ ছুটতে পারছে না। সে তার পা তুলতেও সমর্থ হচ্ছে না। ভূমি বিদ্ধ শলাক ন্যায় দাঁড়িয়ে বন্য ক্রোধে সে চীৎকার করে বলে উঠল, "দাঁড়াও সাধু, দাঁড়াও তখন বুদ্ধ তাঁর গতি পরিবর্তন না করে বা পেছন না ফিরে বললেন, "যদিও আ চলেছি তথাপি আমি স্থির আছি। অঙ্গুলিমালা, তুমিই থাম।" এক শুনে দস্যু ভাবল, "কি অদ্ভুত! এই সাধুটি আমার উপর যাদুশ বিস্তার করেছেন। শুনেছি, এই শাক্য সাধুরা সত্য কথা বলে থাকেন। তথ তিনি বলছেন, তিনি থেমেছেন, যদিও তিনি চলেছেন। আর আমি স্থির হ দাঁড়িয়ে রয়েছি, তবুও আমাকে থামতে বলছেন। একথার অর্থ কি? বলে উঠল, "হে সাধু, আপনি চলেও স্থির আছেন বলছেন; আর আমি স্থি থাকা সত্ত্বেও আমাকে থামতে নির্দেশ দিচ্ছেন। আমি আপনাকে জিজ্ঞা করি, এই কথাগুলির অর্থ কি? আপনি কি করে বলছেন যে, আপ থেমেছেন, আর আমি থামিনি?"

ইহাতে বুদ্ধ উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমি সকল প্রাণীর প্রতি হিংসা ত্যাগ করে শান্ত হয়েছি। আর তুমি মানুষের প্রতি হিংসা করবার জন্য এখনও হা বাড়াচ্ছ। সুতরাং আমি থেমেছি, আর তুমি থামনি।" তখন বুদ্ধ পশ্চাতে ফিরে মিত্রভাবে অঙ্গুলিমালাকে ইঙ্গিত করলেন তাঁর নিকটবর্তী হতে। সেই মুহূর্তে দস্যু পা দুটি নাড়তে পারল ও বুদ্ধের দিকে অগ্রসর হল। বুদ্ধ অঙ্গুলিমালা হাত ধরে তাকে কাছে বসালেন একটি গাছের তলায় এবং তাকে আর্য ধর্ম নীতি শিক্ষা দিলেন। তিনি অঙ্গুলিমালাকে বললেন, "কোন স্বেচ্ছাচারী স্বর্গীয় শক্তি বলে নয়, কিন্তু আমাদের কর্মফলেই আমরা কখনো স্বর্গে, কখনো মর্তে কখনো নরকে দেহধারণ করি। পুনর্জন্ম আমাদের দুঃখকষ্ট বাড়িয়ে তোলে। জন্ম-মৃত্যুর চক্র বন্ধ হলে আমরা নির্বাণ-সুখ অনুভব করি। নির্বাণ অতুলনী

।।ন্তিপূর্ণ নিষ্কলুষ অবস্থা। মৎপ্রচারিত আষ্টাঙ্গিক ধর্মমার্গ অনুসরণ করলে সই অবস্থা লাভ হয়।"

অঙ্গুলিমালা মনোযোগ সহকারে বুদ্ধবাণী শুনল। লজ্জায় ও অনুতাপে তার মাথা নীচু হয়ে গেল। তথাগত পূর্ববৎ অঙ্গুলিমালাকে আবার বললেন, অঙ্গুলিমালা! যা লাভ করবার জন্য জ্ঞানীরা বহু জীবন ত্যাগ-তপস্যায় অতিবাহিত করেন তা তুমি সহজে পেয়েছ। মনুষ্যেতর অগণ্য প্রাণীর তুলনায় অতি অল্প প্রাণীই মনুষ্য জন্ম লাভ করে। যখন বুদ্ধ মর্ত্যে থাকেন না তখন :ত লোক দুনিয়ায় থাকে তাদের তুলনায় বুদ্ধের সময়ে মর্ত্যবাসী মনুষ্যের ংখ্যা অত্যল্প। বুদ্ধের সময়ে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেও কয়জন লোকই বা দ্ধের দর্শন পায়? বুদ্ধকে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের সংখ্যা অত্যল্প; কিন্তু বুদ্ধকে ারা দেখেননি তাঁদের সংখ্যা অত্যধিক। কিন্তু অঙ্গুলিমালা, তুমি মনুষ্যরূপে জন্মেছ এবং এমন সময়ে জন্মেছ যখন বুদ্ধ ধরাধামে আবির্ভূত। তুমি বুদ্ধকে দেখেছ এবং তাঁর সঙ্গলাভ করেছ। বুদ্ধদর্শন সুদুর্লভ।"

তখন অঙ্গুলিমালার জ্ঞান-চক্ষু খুলে গেল। হঠাৎ অজ্ঞানের আবরণ তার মানস চক্ষু থেকে অপসৃত হল। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি লাভ হল। তিনি মহাশান্তির আস্বাদ পেলেন এবং বুঝতে পারলেন, তিনি গৌতম বুদ্ধের সান্নিধ্যে উপবিষ্ট। মহানন্দে তিনি চীৎকার করে বলে উঠলেন, "সিংহের গর্জন অদ্ভুত! আমাকে কৃপা করতে তথাগত এখানে এসেছেন। হে মহামানব, আপনাকে চির প্রণতি জানাই। এই পথাদমের প্রতিও আপনার করুণা বর্ষিত হল! আপনি কৃপা করে আপনার পূত সঙ্গে আমাকে থাকতে দেবেন কি?" অঙ্গুলিমালার হাতের উপরে ডান হাত রেখে বুদ্ধ সম্মতি জানালেন ও বললেন, "বুদ্ধকে অনেকে দেখে, কিন্তু তার বাণী শুনে কম লোক। যাঁরা বুদ্ধের বাণী শুনে াদের মধ্যে কয়জন মাত্র সেই বাণী জীবনে পরিণত করে। অঙ্গুলিমালা, মি বুদ্ধবাণী শুনেছ ও জীবনে পরিণত করবে। এস, আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ র ভিক্ষু হও এবং আমার সঙ্গে চল।"

তখন অঙ্গুলিমালা তাঁর তরবারী, ছোরা প্রভৃতি সংগ্রহ করে পাহাড়ের

গভীর গহ্বরে ফেলে দিলেন এবং তথাগতের অনুসরণ করলেন। বুদ্ধের সা
যেতে যেতে তিনি এই কথাগুলি ভাবতে লাগলেন, "লোকে নালা করে জে
স্রোত নিয়ে যায়, ধনুর্ধররা ধনু বাঁকিয়ে তীর ছুড়ে, সূত্রকাররা কাঠ কে
নানা দ্রব্য তৈরী করে; কিন্তু ধার্মিকরা আত্মজয়ে নিযুক্ত থাকেন। অনে
প্রাণীকে জোর করে বশীভূত করতে হয়, কাউকে বেত মেরে, আবার কাউ
তরবারী দিয়ে। কিন্তু আমি এমন একজনের দ্বারা বশীভূত হয়েছি, বি
বেত্র বা অসি কোনটিই হাতে করলেন না। আমি একজন ঘৃণ্য দস্যু। আমা
লোকে অঙ্গুলিমালা বলেই জানে। আমি পশুবৎ হিংসা-স্রোতে ভাস
ছিলাম। এখন বুদ্ধের দিব্য আশ্রয় পেয়েছি। একদা আমার হস্তদ্বয় নরর
রঞ্জিত ছিল। প্রায় একটি কম এক হাজার মানুষকে আমি বধ করেছি তা
সত্ত্বেও বুদ্ধের কৃপায় আমি পাপ মুক্ত হয়েছি। অহো ভাগ্যম্। যে পূ
পাশবিক জীবন যাপন করছিল সে আজ বুদ্ধের কৃপায় দিব্য জীবন ল
করেছে। মেঘাবৃত আকাশ মেঘমুক্ত হলে যেমন সুন্দর দেখায় তে
হিংসাবৃত্তি ত্যাগ করে আমি শান্তিলাভ করেছি। বুদ্ধের করুণায় পাপের বো
আমার মাথা থেকে পড়ে গেছে। আমি জীবনে শান্তির পথ পেয়েছি।"

ভিক্ষুসংঘে যোগদান করে অঙ্গুলিমালা কঠোর তপশ্চর্য আরম্ভ করলে
তাঁর মধুর ও সুভদ্র ব্যবহারে ভিক্ষুরা মুগ্ধ হলেন। বুদ্ধের পূত স্পর্শে মহাপা
মহাসাধু হয়ে গেলেন। পূর্বে যাঁর নাম ছিল হিংসক, ভিক্ষুসংঘে তাঁর ন
হল অহিংসক। বহু বৎসর তিনি জগদ্গুরু তথাগতের পূত সঙ্গে ছিলেন এ
তখন প্রাণপণে তাঁর সেবা করতেন। তথাগতের তিরোভাব হবার প
তিনি বিজন অরণ্যে প্রস্থান করলেন এবং বাকী জীবন নির্বাণের আন
উপভোগে অতিবাহিত করলেন। তথায় তাঁর পরিনির্বাণ ঘটল। তি
কি ভাবে তাঁর অন্তিম জীবন কাটিয়েছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা একটি পা
গাথা থেকে নিয়ে দেওয়া হল।—"যখন নিম্ন আকাশে ঝড়ের মেঘ গর্জন কর
থাকে এবং পাখীদের নীড়গুলি বৃষ্টির জলে ভেসে যায় তখন অহিংসক পর্বতগুহ
নির্বাণানন্দে ডুবে থাকতেন। এই আনন্দ অপেক্ষা অন্য কোন বস্তু মানুষে

ম্য হতে পারে না। যখন জলপূর্ণ নদীতে স্রোত প্রবাহিত হত এবং বনে-
গলে নানা রঙের ফুল ফুটে উঠত এবং মেঘমুক্ত তারকাখচিত আকাশ দেখা
ত, তখন অহিংসক নদীতে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক নেত্রে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে
র্বাণানন্দ উপভোগ করতেন, বোধিধ্যানে মগ্ন থাকতেন। গৌতম বুদ্ধের
তপাবনী করুণা-গঙ্গায় অবগাহন করে জগতের অন্যতম মহাপাপী শুধু
পমুক্ত নয়, পরম পুরুষার্থ লাভে ধন্য হলেন।

অন্তিম জীবন

অম্বাপালী

ভগবান্ বুদ্ধ বহু শ্রমণ সঙ্গে করে বৈশালীতে গেলেন এবং তথায় বারাঙ্গনা
ম্বাপালীর* উদ্যান-বাটীতে অবস্থান করলেন। একদিন তিনি ভিক্ষুগণকে
ক্ষ্য করে এই উপদেশ দিলেন, "হে ভিক্ষুবৃন্দ, তোমরা প্রত্যেকে মনোযোগী
চিন্তাশীল হও। অসৎ বিচারের ভ্রম বা ইন্দ্রিয়-ভোগের আকাঙ্ক্ষা বা দৈহিক
মনা থেকে যে দুঃখ আসে তা অতিক্রম করবার জন্য সচেষ্ট হও।
াকালয়ে থাকতে হলে এটি বিশেষ প্রয়োজন। যা কিছু করবে তাতে
র্ণ সচেতন থাকবে। পানাহার কালে এবং বেড়ান, দাঁড়ান, ঘুমান বা
াগরণ সময়ে এবং কথা বলা বা মৌন থাকবার কালে তোমরা সচেতন
কবে।" বারাঙ্গনা অম্বাপালী শুনলেন যে, তথাগত সশিষ্য এসে তাঁর
াম্রবনে আছেন। তিনি গাড়ীতে করে তথাগতের কাছে গেলেন। যতদূর

* কোন তিব্বতী গ্রন্থে অম্বাপালীকে রাণী অমরা বলা হয়েছে। তিনি সাধারণ বারাঙ্গনা
লেন না। সম্পদে, সৌন্দর্যে ও প্রভাবে এবং অন্যান্য সদগুণে সমাজে তিনি উচ্চ স্থান অধিকার
রছিলেন। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুইর দরবারে মাদাম পম্পাডুর ও গ্রীসের অ্যাসপাসিয়ার
ঙ্গ অম্বাপালীর তুলনা করা যায়। মহাবগ্গের অষ্টম খণ্ডকের প্রথমাংশে তৎকালীন বারাঙ্গনাদের
বরণ পাওয়া যায়।

গাড়ী যেতে পারে ততদূর গাড়ীতে গিয়ে তিনি নেমে পড়লেন। সেখ থেকে তিনি পায়ে হেঁটে বুদ্ধদেবের কাছে গিয়ে শ্রদ্ধাভরে তাঁর এক পা বসলেন। যেমন বিজ্ঞা নারী ধর্ম-কৃত্য সম্পাদনের জন্য কোথাও যান তে তিনি সাদাসিদে পোষাক পরে এবং অলঙ্কারে সজ্জিতা না হয়ে তথায় গিয়েছি তা সত্ত্বেও তাঁকে অতিশয় শ্রীসম্পন্না দেখাচ্ছিল।

তথাগত মনে মনে ভাবলেন, "এই বারাঙ্গনা সংসারী লোকদের মধ্যে ব বেড়ায় এবং রাজন্যবর্গ ও রাজকুমারবৃন্দের প্রিয়পাত্রী। তথাপি তার শান্ত ও সংযত। যদিও সে বয়সে তরুণ ধনী ও ভোগবিলাসে বেষ্টিত চিন্তাশীলা ও সুমনা। বস্তুতঃ ইহা পৃথিবীতে দুর্লভ। সাধারণতঃ নারী অল্পবুদ্ধি ও অত্যন্ত চাকচিক্যপ্রিয়া হয়। কিন্তু যদিও অম্বাপালী ভোগবিল মজ্জমানা তথাপি সে স কার্যে আনন্দ পায় এবং পূর্ণ সত্য শিক্ষার যোগ্যপা যখন অম্বাপালী তথাগতের সমীপে বসেছিলেন তখন তথাগত নানা ধর্মপ করে তাকে আনন্দিতা করেন। যখন তিনি বুদ্ধের মুখে ধর্মকথা শুনছি তখন তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তৎপরে তিনি গাত্রোত্থানপূ তথাগতকে যুক্তকরে নিবেদন করলেন, 'ভগবন্ কি কৃপা করে শিষ্যবৃন্দ স নিয়ে কাল আমার বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন?" এই প্রার্থনায় তথা মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। শাস্ত্রমতে মৌনভাব সম্মতিসূচক। বৰ্ধিষ্ণু ব লিচ্ছবি যখন শুনলেন, তথাগত বৈশালীতে এসে অম্বাপালীর উদ্যানে অ করছেন তখন তিনি সুসজ্জিত গাড়ীতে চড়ে অনুচরবর্গ সাথে তথাগ কাছে গেলেন। লিচ্ছবির বহুমূল্য পোষাক বিভিন্ন উজ্জ্বল বর্ণে ও দ্যু রত্নে শোভিত ছিল। অম্বাপালীও তরুণ লিচ্ছবিদের সাথে প্রতিযো করে নিজ সজ্জিত গাড়ী চালালেন। তখন লিচ্ছবি অম্বাপালীকে জি করলেন, "এ ক অম্বাপালী, তুমি আমাদের সঙ্গে এরূপ প্রতিযোগিতা ক কেন?" অম্বাপালী সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন, "যুবরাজগণ, আমি এই তথাগত ও তাঁর শিষ্যবৃন্দকে আগামী কাল আমার গৃহে ভিক্ষা নেবার নিমন্ত্রণ করেছি।"

রাজপুত্রগণ উত্তর দিলেন, "অম্বাপালী! যদি কাল তথাগতকে আমাদের প্রাসাদে ভিক্ষা নিতে দাও, তাহলে তোমাকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিব।" অম্বাপালী বললেন, "করদ রাজ্য সহ যদি নিখিল বৈশালী আমাকে দেন তাহলেও আমি এই অমূল্য সুযোগ্য পরম সৌভাগ্য ছাড়তে পারবো না।" অনন্তর সেই লিচ্ছবিগণ অম্বাপালীর উদ্যানে গেলেন। লিচ্ছবিকে দূরে আসতে দেখে তথাগত ভিক্ষুবৃন্দকে সম্বোধন করে বল্লেন, "হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষুরা এখনো দেব-দর্শন করেনি তারা এই লিচ্ছবিগণকে এক দৃষ্টে দেখুক। কারণ তারা দেবতাদের মত জাকজমক করে সুন্দর সাজ-পোষাক পরেছে।" যতদূর গাড়ী যেতে পারে ততদূর তাঁরা গাড়ীতে গিয়ে নামলেন এবং বুদ্ধদেবের কাছে পৌছে তারা এক পাশে বসলেন। যখন তাঁরা এইরূপে উপবিষ্ট হলেন তখন বুদ্ধদেব সদুপদেশ দিয়ে তাঁদিগকে উৎসাহিত করলেন। অনন্তর তাঁরা শ্রদ্ধাভরে তথাগতকে সম্বোধন করে বললেন, "ভগবান্ কি শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে কাল আমাদের প্রাসাদে অনুগ্রহপূর্বক ভিক্ষা নেবেন? সে সৌভাগ্য কি আমাদের হবে?" তথাগত উত্তর দিলেন, "হে লিচ্ছবিগণ, আমি ত কাল বারাঙ্গনা অম্বাপালীর গৃহে ভিক্ষা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।"

তথাগতের কথা অনুমোদনপূর্বক লিচ্ছবিগণ গাত্রোত্থান করে তথাগতকে ডান দিকে রেখে বিষন্ন বদনে ধীরে ধীরে স্থানত্যাগ করলেন। বাড়ীতে ফিরে এসে তাঁরা হাত-পা ছড়িয়ে দুঃখ করে বল্লেন, "একজন বারবনিতা আমাদিগকে এ সবায় অতিক্রম করলে? একটি চঞ্চলা তরুণী আমাদিগকে পুণ্য কর্মে পরাস্ত করলে?" শেষ রাত্রে অম্বাপালী তাঁর অট্টালিকায় প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন ও পিষ্টক প্রস্তুত করে রাখলেন এবং বার্তাবহ দ্বারা তথাগতের সমীপে সংবাদ পাঠালেন, "ভগবন্! ভিক্ষান্ন প্রস্তুত, আহারের সময়ও উপস্থিত।" ভোরে তথাগত গেরুয়া পোষাক পরে ও ভিক্ষাপাত্র নিয়ে শিষ্যবৃন্দ সমভিব্যাহারে অম্বাপালীর বাসগৃহে গেলেন। অম্বাপালী তাঁদের জন্য যে আসন রচনা করেছিলেন তদুপরি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুগণ বসলেন। তখন অম্বাপালী স্বয়ং তাঁদিগকে মিষ্টান্ন ও পিষ্টক পরিবেশন করলেন। যতক্ষণ

তাঁরা খেতে না চাইলেন ততক্ষণ তিনি তাঁদিগকে পর্য্যাপ্ত আহার্য্য পরিবেশ ক্ষান্ত হলেন না। যখন তথাগতের আহার শেষ হল তখন একটী নি টুল আনালেন এবং তথাগতের পাশে নিম্নাসনে বসে সশ্রদ্ধ নিবেদন জানাে "হে ভগবন্! যে ভিক্ষু সংঘের শিরোমণি সাক্ষাৎ বুদ্ধ আমি সেই সংঘকে এ অট্টালিকা উপহার দিলাম।" তথাগত অম্বাপালীর মূল্যবান্ উপহার গ্রহণা তাঁকে ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা অনুপ্রাণিত করে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

যতদিন তথাগত অম্বাপালীর উদ্যানে থাকবার সংকল্প করেছিলেন ততি তথায় থাকবার পর তিনি বৈশালীর নিকটে বেলুব নামক স্থানে গেলে বেলুবে তিনি ভিক্ষুবৃন্দকে সম্বোধন করে বললেন, 'হে ভিক্ষুগণ, তেম বৈশালীর অদূরে বর্ষাবাস কর। যেখানে যার বন্ধুবর্গ ও নিকট সঙ্গীরা অ তথায় প্রত্যেকে এই বর্ষাকালে থাক। এই বর্ষা ঋতুতে আমি বেলুবে ব করব।" যখন তথাগত বেলুবে বর্ষাবাস আরম্ভ করলেন তখন তিনি কা অসুখে আক্রান্ত হলেন। রোগের দারুণ যন্ত্রণায় তিনি মৃতবৎ পড়ে রইলে অনুদ্বিগ্ন ও সচেতন থেকে তিনি এই দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করলেন, উহার প্রতীক সচেষ্ট হলেন না। তখন এই চিন্তা তাঁর মনে উদিত হল, "সংঘের অনুমতি নিয়ে এবং শিষ্যবৃন্দকে অন্তিম উপদেশ না দিয়ে আমার পক্ষে দেহত্যাগ ব ঠিক হবে না। এখন মনের জোরে রুগ্ন দেহকে সুস্থ এবং জীবনকে স্ব রাখব নির্দিষ্ট প্রয়াণ কাল পর্যন্ত।" এই সংকল্প অনুযায়ী কাজ করার ফলে ত অসুখ কমে গেল। এইরূপে তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হতে লাগলেন এবং স সুস্থ হতেই বিহারের বাহিরে এলেন এবং উন্মুক্ত স্থানে তাঁর জন্য যে আ পাতা ছিল তাতে বসলেন। শ্রদ্ধেয় আনন্দ অন্যান্য গুরুভ্রাতার সঙ্গে তথাগে কাছে গেলেন এবং তাঁকে ভক্তিভরে প্রণামপূর্বক তাঁর এক পাশে বসে বললে "ভগবন্! আপনি পূর্বে কেমন স্বাস্থ্যবান্ ছিলেন তা আমি দেখেছি। এ রোগে ভুগে ভুগে আপনার শরীর কেমন স্বাস্থ্যহীন হয়েছে তাও দেখি আপনাকে অসুস্থ দেখে আমার দেহ লতার মত দুর্বল হয়েছিল, দশ দি অন্ধকার দেখছিলাম, এবং আমার মনোবৃত্তিগুলিও স্পষ্ট ছিল না। অত

। সম্পর্কে আবশ্যকীয় উপদেশ না দিয়ে আপনি দেহরক্ষা করবেন না জেনে মি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়েছি।”

সংঘের অনুরোধে তথাগত আনন্দকে লক্ষ্য করে বল্লেন, “আনন্দ, সংঘ মার কাছে আর কি আশা করে? ধর্মের গুহ্য ও বাহ্য ভেদ না করে আমি শ্রেণীর নরনারীর নিকট সনাতন আর্য ধর্ম প্রচার করেছি। আচার্য্যের বদ্ধ র মত আমি কোন তত্ত্ব গুপ্ত রাখি নাই। আনন্দ! হয়তো কোন ভিক্ষু া করবে যে, আমি সংঘ-গুরু, ও আমার উপর সংঘ নির্ভরশীল এবং সংঘ দ্ধে আমার সকল উপদেশ প্রদান করা উচিত। কিন্তু আনন্দ! তথাগত নো মনে করেন না যে, তিনি সংঘের চালক, বা সংঘ তাঁর অধীন। কেন ব তথাগত সংঘ-সম্পর্কীয় কোন বিষয়ে তাঁর পরামর্শ দেবেন? আমি াবৃদ্ধ হয়েছি। আমার আয়ুষ্কাল সমাপ্তপ্রায়, আমার মহাপ্রয়াণ সমীপবর্তী। মি এখন আশী বৎসর বয়সে পা দিয়েছি।”

“ঠিক যেমন একটী সুজীর্ণ শকটকে অতিকষ্টে কিয়দ্দূর চালিত করা যায় প তথাগতের দেহকে অতিরিক্ত যত্নে সুস্থ রাখা যায়। তথাগত যখন হ্য ধর্ম থেকে মন তুলে নিয়ে বোধিধ্যানে ডুবে যান কেবলমাত্র তথনই াগতের দেহ সুস্থ থাকে। অতএব হে আনন্দ! তোমরা প্রত্যেকে জেদের কাছে স্ব স্ব প্রদীপবৎ হও। নিজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে হ্য সহায়তার উপর আস্থা আদৌ রেখো না। জীবন-পথে প্রদীপবৎ ধর্মকে ভাবে ধরে থাক। ধর্মেই শান্তি ও মুক্তির সন্ধান কর। নিজ ব্যতীত অন্য রা উপর নির্ভর করো না। নিজ মুক্তি সাধনে জীবন উৎসর্গ কর। তুমি ই নিজের উদ্ধারক, তোমার অন্য কেহই উদ্ধারক নেই। দেহধারণে যে কষ্ট হয় তা অগ্রাহ্য করে নির্বাণ লাভে অগ্রসর হও। আমি বেঁচে থাকতে ত হলে যারা নিজেদের প্রদীপস্বরূপ হবে, কারোর উপর নির্ভর না করে নির্ভরশীল হবে, জীবন-পথে সত্যধর্মকে প্রদীপবৎ ধরে থাকবে এবং সাধনে প্রযত্ন করবে তারাই, হে আনন্দ! ধর্ম-শৈলের অত্যুচ্চ শিখরে রোহণ করবে এবং সংঘের গৌরবস্বরূপ হবে।”

মারের প্রলোভন

তথাগত আনন্দকে বললেন, "পূর্ব পূর্ব বৎসরে পাপাত্মা মার তিনবার ৎ প্রলুব্ধ করতে এসেছিল। যখন বোধিসত্ত্ব রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করেছি মহানিষ্ক্রমণকালে তখন মার তোরণদ্বারে দাঁড়িয়েছিল এবং তাঁকে ব বলেছিল, 'হে প্রভো, গৃহত্যাগ করো না। আজ থেকে সাত দিনের আপনার ভাগ্যচক্র পরিবর্তিত হবে এবং আপনাকে চার মহাদেশের এব হাজার পার্শ্ববর্তী দ্বীপপুঞ্জের সম্রাট করবে। অতএব, আপনি গৃহে থ বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, 'হাঁ, আমি জানি যে, আমার ভাগ্যচক্র আমার অনুকূল হবে। কিন্তু আমি তো সাম্রাজ্য কামনা করি না। আমি বুদ্ধ এবং সমগ্র বিশ্বকে অমৃতের অধিকারী এবং আনন্দে উৎফুল্ল করবো।" ত আনন্দ সেই পাপাত্মা মার তথাগতের কাছে এসেছিল, যখন কঠোর ত পর তিনি নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান করে উঠলেন। তখন মার বলেছিল, 'ত উপবাসে অতি শীর্ণ হয়েছেন এবং আপনার মৃত্যু সমীপবর্তী! এত ক করে কি লাভ? আপনি বেঁচে থাকবার সঙ্কল্প করুন, তাহলে আপনি ' সৎকাজ করতে পারবেন।' তখন তথাগত উত্তর দিলেন, 'হে অলস ব পরম বন্ধু, হে দুষ্টচেতা, কি উদ্দেশ্যে তুমি এসেছ? আমার দেহের চ হোক, যদি তাতে আমার চিত্ত প্রশান্ত ও মনোযোগ বোধিনিষ্ঠ হয়। ' জীবনের মূল্য কি? ইন্দ্রিয়াধীন জীবন যাপন অপেক্ষা ইন্দ্রিয়জয়ের স মৃত্যুও শ্রেয়স্কর।" মার তথাগতকে ছেড়ে এই বলে চলে গেল, সাত ধরে আমি আপনাকে প্রতি পদক্ষেপ অনুসরণ করেছিলাম, কিন্তু আমি আ কোন দোষ দেখতে পাইনি।"

"হে আনন্দ, তৃতীয় বার সেই প্রলোভক তথাগতের কাছে এসেছিল নির্বাণলাভের পরই তিনি নৈরঞ্জনা নদীতীরস্থ ন্যগ্রোধ গাছের তলায় বিশ্র ছিলেন তখন মার তথাগতের কাছে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে ব 'হে প্রভো, এখন আপনি ইহলোক থেকে প্রয়াণ করুন। তথাগত

ক্ষা করুন। তাঁর প্রয়াণকাল সমুপস্থিত।' মারের কথা শেষ হতে না ই, তথাগত বললেন, "রে পাপাত্মা, আমি ততদিন মরব না, যতদিন সংঘের গণ ও ভিক্ষুণীগণ এবং গৃহী শিষ্য শিষ্যাগণ ধর্মলাভ না করে, জ্ঞানী ও র না হয়, বোধিলাভে একনিষ্ঠ না হয় এবং বুদ্ধের পদানুসরণ না করে। ন আর্য্যধর্ম বিশ্বব্যাপী না হয়, জনপ্রিয় না হয় পৃথিবীতে একচ্ছত্র আধিপত্য বে ততদিন আমি বেঁচে থাকব।" এইরূপে তিনবার মার আমাকে ভন দেখিয়েছিল। আনন্দ আজ আর একবার মার আমার কাছে এসে করে পূর্ববৎ বলেছিল, 'হে প্রভো, আপনি মরধাম থেকে চলে যান।' সে এই কথা বললে আমি তাকে উত্তর দিলাম, "রে পাপাত্মা, সুখী হও। তের মহাপ্রয়াণ অবিলম্বে ঘটবে!"

শ্রদ্ধেয় আনন্দ এই কথা শুনে তথাগতকে অনুনয় করে বললেন, "ভগবন্, জাতির কল্যাণার্থ, জগতের প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে কোটি কোটি নরনারীর ও শান্তি বিধানের জন্য আপনি আরও কিছু কাল আমাদের সঙ্গে থাকুন।" ত বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে আনন্দ! আর তথাগতকে অনুরোধ কোরো

আনন্দ দ্বিতীয় বার তথাগতকে অনুরোধ করলেন, কিন্তু একই উত্তর ন। আনন্দ যখন তৃতীয় বার তথাগতকে অনুরোধ করলেন আরও কাল দেহধারণের জন্য তখন বুদ্ধ বললেন, "আনন্দ, তোমার কি আমার বিশ্বাস নেই?' আনন্দ করজোড়ে উত্তর দিলেন, 'ভগবন্, আপনার কথায় র নিশ্চয়ই বিশ্বাস আছে।" তথাগত আনন্দের চক্ষুর পানে কম্পমান এবং প্রিয় শিষ্যের মর্মব্যথা অনুভব করে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ন্দ, তোমার কি আমার কথায় বিশ্বাস নেই?' আনন্দ শ্রদ্ধাভরে উত্তর ন, 'হাঁ প্রভো! আপনার কথায় আমার বিশ্বাস আছে।' তখন গত বলতে লাগলেন, 'যদি তথাগতের বাক্যে তোমার বিশ্বাস থাকে তবে আনন্দ তাঁকে তুমি তৃতীয় বার বিরক্ত করছ? পূর্বে আমি কি তোমাদের ই বারবার ঘোষণা করিনি যে, বস্তু বা ব্যক্তি আমাদের যতই প্রিয় হোক কন কালক্রমে তাকে ছাড়তেই হবে। প্রিয় বস্তু বা প্রিয় ব্যক্তির বিয়োগ

ইহলোকে অনিবার্য। আমার পক্ষে আর দেহধারণ করা কিরূপে স
জাত বস্তুর বা জাত ব্যক্তির মৃত্যু ধ্রুব। মৃত্যু জন্মের সহগামী। যদি জগ
প্রত্যেক বস্তুই নশ্বর হয় তবে আমার দেহনাশ কিরূপে বন্ধ করা স
আনন্দ, এই পার্থিব জীবন তথাগত চিরতরে ত্যাগ করেছে, মলমূত্রবৎ
দিয়েছে।"

বিদায়-বাণী

তথাগত আনন্দকে বললেন, "এখন যাও এবং বৈশালীর পাশে যে ভিক্ষুরা আছে তাদিগকে স্থানীয় বিহারে সমবেত কর।" অনন্তর তথ নির্দিষ্ট বিহারে গেলেন এবং তাঁর জন্য যে মাদুর পাতা হয়েছিল তাতে বসে আসন গ্রহণান্তর তিনি সমবেত ভিক্ষুগণকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমাদের যারা ধর্মলাভ করেছ তারা সেই ধর্ম সাধন ও প্রচার কর। এই সত্যধর্ম দীর্ঘকাল ইহলোকে বলিষ্ঠ থাকে এবং মানব জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে তার প্রাণপণ কর। নক্ষত্রবিদ্যা, জ্যোতিবিদ্যা, কোষ্ঠিগণনা, ভবিষ্যদ্‌বাণী, অলৌ শক্তি প্রদর্শনাদি আমার সংঘে নিষিদ্ধ। ইন্দ্রিয়-সংযম অভ্যাস যারা না ক তারা নির্বাণ লাভের অযোগ্য। যারা নির্বাণলাভে বদ্ধ-পরিকর তারা ই সংযম অভ্যাস করবে এবং জাগতিক উত্তেজনা থেকে অবসর নিয়ে মান শান্তির সন্ধান করবে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য পানাহার কর। মধু যেমন ফুলের মধু খায়; কিন্তু উহার সৌন্দর্য বা সুগন্ধ নষ্ট করে না, জীবনের অভাবগুলি দূর করতে চেষ্টিত হও। চারটি আর্য সত্য উত্তম রূপে বুঝলে ও ধারণা করলে ভিক্ষুগণ বা গৃহিগণ বিপথগামী হবে। যতদিন আ বোধিলাভ না করি ততদিন সংসৃতি-মার্গে পুনঃপুনঃ ভ্রমিত হব। অ তোমাদিগকে যে ধ্যান শিক্ষা দিয়েছি তা নিত্য অভ্যাস করবে। পাপাচ থেকে নিবৃত্ত হবার জন্য স্থির চিত্তে সংগ্রাম করবে। ধর্মপথে দৃঢ়ভাবে চল থাক। নৈতিক চরিত্রে সবল হও। তোমাদের জীবনে ধর্মভাব গড় হোক যখন সাত প্রকার প্রজ্ঞা তোমাদের জীবন পথ আলোকিত ক

। তোমরা নির্বাণের অধিকারী হবে। হে ভিক্ষুগণ, তথাগত অচিরে নির্বাণ লাভ করবেন। তোমাদের প্রতি আমার শেষ বাণী এই, "জগতের সবই বিকারগ্রস্ত ও বিনাশপ্রাপ্ত হবে। যা অবিকারী ও অবিনাশী 'তার ন কর এবং স্বীয় মুক্তিসাধনার্থ অধ্যবসায়ী হও।"

তথাগত পাভায় গিয়ে ধাতুকার চুন্দের আম্রবনে সশিষ্য অবস্থান করলেন। এই সংবাদ পেয়ে বুদ্ধের কাছে গেলেন এবং শিষ্যবৃন্দ সহিত তাঁর গৃহে তাঁকে া নিতে অনুরোধ করলেন। চুন্দ চালের পিঠে এবং শুষ্ক শূকর মাংসের ারী প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করলেন। চুন্দের বাড়ীতে শূকরমাংস খেয়ে কঠিন উদরাময়ে আক্রান্ত হলেন। রোগের যন্ত্রণা মৃত্যুযন্ত্রণার মত অসহ্য ও বুদ্ধ সংযত ও সচেতন থেকে তা নীরবে সহ্য করলেন।

তথায় বুদ্ধ আনন্দকে ডেকে বললেন, 'এসো, আমরা কুশীনগরে যাই। তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং পথিপার্শ্বে একটি বৃক্ষতলে বিশ্রামার্থ বেশন করলেন। তিনি তখন আনন্দকে বললেন, "আমার পোষাকটি করে বিছিয়ে দাও, আনন্দ! আমি অত্যন্ত শ্রান্ত হয়েছি, শুয়ে একটু াম করি।" বুদ্ধের আদেশে আনন্দ তাঁর বহির্বাস চার ভাঁজ করে মাটিতে ত দিলেন। বুদ্ধ তদুপরি বসে আনন্দকে বললেন, আমাকে একটু খাবার এনে দাও, আমি তৃষ্ণার্ত।' এই কথা শুনে আনন্দ বুদ্ধকে বল্লেন, "ভগবন্, নহ পাঁচ শত শকট নদী পার হয়ে গেছে। তাতে নদীর জল খুব ঘোলা ছে। নদী এখান থেকে বেশী দূরে নয়। তার জলও খুব পরিষ্কার ও তৃ, শীতল ও স্বচ্ছ। সহজে সেই নদীতে নামা যায়। ভগবন্, ওখানে গেলে পান ও হাতপা ধুয়ে আপনি ক্লান্তি দূর করতে পারেন।" দ্বিতীয় বার তথাগত ন্দকে জল আনবার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বারও আনন্দ ক নদীতে যাবার জন্য প্রার্থনা জানালেন। যখন তৃতীয় বার তথাগত ন্দকে জল আনতে নির্দেশ দিলেন তখন আনন্দ একটি কমণ্ডলু নিয়ে নদীতে লন। পাঁচশত শকট যাওয়াতে নদীর জল খুব ঘোলা হয়ে গিয়েছিল, ই যখন আনন্দ গেলেন তখন নদীর জল খুব নির্মল ও শীতল হয়ে গেল।

তা দেখে আনন্দ ভাবলেন, তথাগতের শক্তি ও সিদ্ধি কি অলৌকিক, আশ্চর্যময়!

আনন্দ কমণ্ডলুতে জল এনে বুদ্ধকে দিয়ে বললেন, "ভগবন্, এই জল করুন। দেবতা ও মনুষ্যের ধর্মগুরু এই জল পানে পিপাসা নিবৃত্তি করু তথাগত আনন্দ কর্তৃক আনীত জল পান করলেন। তখন নিম্নজা পুক্কশ নামক তরুণ মল্ল সেই পথ দিয়ে কুশীনগর থেকে পাভা যাচ্ছিলে পুক্কশ আরাদ কালামের শিষ্য। তিনি তথাগতকে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট ে তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁকে শ্রদ্ধাভরে প্রণামপূর্বক তাঁর এক প বসলেন। তখন বুদ্ধ পুক্কশকে বিবিধ ধর্মপ্রসঙ্গ করে উৎসাহিত ও আনি করলেন। বুদ্ধ-বাক্যে দিব্য প্রেরণা পেয়ে পুক্কশ মল্ল কোন পথচার সম্বোধন করে বললেন, "হে বন্ধু, আমার জন্য দুই জোড়া স্বর্ণময় পরিষ্কৃ ব্যবহারযোগ্য পোষাক এখনই এনে দাও।" 'তথাস্তু' বলে আগন্তুক পুক্ক সম্মতি জানালেন এবং তাঁর নির্দেশ মত দুই জোড়া স্বর্ণময় পোষাক দিলেন। পুক্কশ মল্ল সেই দুই জোড়া দুর্মূল্য পোষাক তথাগতকে উপহার দি প্রার্থনা করলেন, "ভগবন্, এই পোষাক দুই জোড়া আপনার ব্যবহারযো আপনি কৃপাপূর্বক এই উপহার গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করুন।" ত বুদ্ধ বললেন, 'পুক্কশ, আমাকে ও আনন্দকে এই দুই জোড়া পোষাক পরি দাও।' পুক্কশ তথাগতের আদেশ সানন্দে পালন করলেন। যখন তথা সেই পোষাক পরিধান করলেন তখন তাঁকে অগ্নিদেবের মত দ্যুতিমান দেখ বর্ণনাতীত স্বর্গীয় সুষমায় তিনি মণ্ডিত হলেন। আনন্দ তা দেখে আনি হয়ে তথাগতকে বললেন, "ভগবন্, তথাগতের গাত্রবর্ণ কি উজ্জ্বল, কি সু হয়েছে! যখন আমি আপনাকে এই পোষাক পরিয়ে দিলাম ত এই স্বর্ণময় পোষাকের ঔজ্জ্বল্য আপনার গাত্রবর্ণের কাছে নিষ্প্রভ হ গেল। কি অলৌকিক কাণ্ড! কি আশ্চর্য্যময় ব্যাপার!!"

তথাগত বললেন, "আনন্দ, দুই সময়ে তথাগতের গাত্রবর্ণ অগ্নিদে মত সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যে রাত্রে তথাগত বোধিলাভ করেন এবং

ত্র তিনি মহাসমাধিতে দেহরক্ষা করেন, এই দুই রাত্রে তথাগতের বর্ণ সর্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল হয়।" তথাগত পুনরায় আনন্দকে লক্ষ্য করে লেন, "এই ভেবে কেউ যেন চুন্দকে দোষী সাব্যস্ত না করে যে, তার বাড়ীতে াগত শেষ আহার করে দেহত্যাগ করেন। এইরূপে অনুশোচনা বা বদর্শন করা অনুচিত।" মৃত্যু আসন্ন জেনে বুদ্ধ এই কথাগুলি বললেন, "যিনি করেন তিনিই লাভবান্ হন। যিনি আত্মসংযম করেন তিনিই রিপুজয়ী ধার্মিক ব্যক্তি পাপ থেকে বিষবৎ নিবৃত্ত হন। কামনা, তিক্ততা াহ হৃদয় থেকে উৎপাটিত করলে নির্বাণ লাভ হয়।"

হিরণ্যবতী নদীর অন্য তীরে অবস্থিত কুশীনগর উপবর্তন মল্লদের শালবনে ন্ বুদ্ধ বহু ভিক্ষু সমভিব্যাহারে গমন করলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হয়ে ন্দকে সম্বোধন করে বললেন, "যুগ্ম শালগাছের মধ্যে খাটটি উত্তরমুখী করে এবং আমার জন্য শয্যা প্রস্তুত কর। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত, আনন্দ। আমি ে শুয়ে পড়তে চাই।" আনন্দ শ্রদ্ধাভরে উত্তর দিলেন, 'তাই হোক ন্।' এই বলে তিনি উত্তরমুখী করে খাটটি রাখলেন এবং বিছানা লেন। তখন বুদ্ধ তাতে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি সমনস্ক ও সুস্থির ন। মৃত্যু-চিন্তা তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারল না।

তখন যুগ্ম শালগাছ দুটি অকালে কুসুমিত হয়ে উঠল। আকাশ থেকে য সঙ্গীত ভেসে এল পূর্ব বুদ্ধদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিয়ে উত্তর সাধকের প্রতি। বুদ্ধ পে সম্মানিত হওয়ায় আনন্দ আশ্চর্যান্বিত হলেন। তা দেখে বুদ্ধ ন, "আনন্দ, এইরূপ ঘটনা দ্বারা বুদ্ধ সম্যক্ সম্মানিত, পূজিত বা প্রশংসিত না। কিন্তু যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুনী, পুরুষভক্ত বা স্ত্রীভক্ত উচ্চ নীচ কর্তব্যগুলি মিত ভাবে পালন করেন এবং নীতিপথে চলেন তাঁরাই তথাগতকে উৎকৃষ্ট া নিবেদন করেন। তদ্দ্বারাই তথাগত যথাযথ সম্মানিত বা আরাধিত যদি তুমি স্বীয় কর্তব্য সাধ্যমত পালন কর এবং ধর্মপথে চল তাহা তুমি আমাকে সম্যক্ শ্রদ্ধান্বিত করবে।"

তখন আনন্দ বিহারের মধ্যে গিয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আবেগের

অতিশয্যে কাঁদতে লাগলেন এবং ভাবলেন, "হায়! আমি এখনও শিক্ষার্থী আছি। আমি নির্বাণলাভ এখনও করতে পারিনি। যে গুরু আমার প্রতি এত সদয়, শীঘ্রই তিনি তিরোহিত হবেন। আমি কি করব?" তথাগত ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আনন্দ কোথায়?' কোন ভিক্ষু অন্দরে গিয়ে আনন্দকে ডেকে আনলেন। আনন্দ এসে বুদ্ধকে বললেন, "গভীর তামস জ্ঞানাভাবে চার দিক ঘিরে আছে। যখন আলোকাভাবে প্রাণিজগৎ অন্ধকারে হাতড়াইতে ছিল তখন তথাগত প্রজ্ঞা-প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলেন। সেই জ্ঞানালোক সমগ্র জগৎকে সমুদ্ভাসিত করার পূর্বেই তাঁর মহাপ্রয়াণ হবে।' তথাগত তৎপার্শ্বে উপবিষ্ট আনন্দকে বললেন, "আনন্দ, যথেষ্ট হয়েছে, আর চোখের জল ফেলো না বা শোক কোরো না। আমি কি তোমাকে পূর্বে বহু বার বলিনি যে, বস্তু বা ব্যক্তি যতই প্রিয় বা ঘনিষ্ট হোক না কেন তাদের বিয়োগ হবেই হবে। কালের গতি কেউ রোধ করতে পারে না। সকল সংহত বস্তুই বিলীন হবে, কিন্তু একমাত্র পরমার্থ সত্যই চিরস্থায়ী। যখন ধর্মকায় চিরস্থায়ী তখন এই রক্তমাংসের দেহরক্ষার চেষ্টা আমি কেন করব? আমার ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে। আমার উপর যে কর্তব্যভার অর্পিত হয়েছিল তা সুসম্পন্ন করেছি! আমি চিরবিশ্রাম লাভের জন্য ব্যাকুল। আমার পক্ষে বিশ্রাম বিশেষ প্রয়োজন। আনন্দ, তুমি দীর্ঘকাল ধরে প্রীতিপূর্ণ চিন্তায়, কার্য্যে ও বাক্যে আমার সেবা করেছ এবং ছায়ার মত আমার কাছে থেকেছ। তোমার প্রীতি কখনো বিচলিত হয় নি, তোমার প্রীতির তুলনা হয় না। তোমার জীবন ধন্য হয়েছে, আনন্দ। তুমি ধর্ম সাধনে যত্নশীল হও। তাহলে তুমি অচিরে অসদ্‌ভাব, ইন্দ্রিয়বশ্যতা স্বার্থপরতা, সম্মোহ ও অজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে।" উদ্বেলিত অশ্রু রোধ করে আনন্দ তথাগতকে এই কাতর আর্তি জানালেন, "যখন আপনি চলে যাবেন তখন কে আমাদিগকে ধর্মশিক্ষা দেবে?" তথাগত উত্তর দিলেন, "পৃথিবীতে আমি প্রথম বুদ্ধ হয়ে আসিনি, বা আমি শেষ বুদ্ধ হবো না। কালে আর এক বুদ্ধ আবির্ভূত হবেন। তিনি সম্যক্‌ সম্বুদ্ধ মৈত্রেয়। আমি

তামাদিগকে যে ধর্মশিক্ষা দিয়েছি সেই ধর্ম তিনিও তোমাদিগকে শিক্ষা দবেন। তৎপ্রচারিত ধর্ম আদিতে ও অন্তে মহিমময়, সনাতন ও সমুদার হবে। তনি যে ধর্মজীবন ঘোষণা করবেন তাহাই আমি তোমাদের কাছে ধরেছি।” ানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমরা তাঁকে কি করে চিনব?’ বুদ্ধ উত্তর দিলেন, িনি মৈত্রেয় নামে পরিচিত হবেন। কারণ তিনি মৈত্রী-মূর্তি।’

তখন মল্লগণ তাদের তরুণ-তরুণী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিয়ে দুঃখিত ও কার্ত অন্তরে উপবর্তনে গেলেন এবং ভগবান বুদ্ধকে দেখতে ও তাঁর শুভাশীষ ত চাইলেন। বুদ্ধদেব তাদিগকে লক্ষ্য করে বললেন, “ধর্মপথে যদি ত চাও তাহলে সাধ্যমত অভ্যাস ও অধ্যবসায় প্রয়োগ কর। আমাকে াই যথেষ্ট নয়। যেভাবে আমি চলতে বলেছি ঠিক সেই ভাবে চল। ত্ত দুঃখ-জাল হতে মুক্ত থাক। চরম লক্ষ্য স্থির রেখে ও কোন দিকে না । ধর্মপথে চল। রোগী ঔষধের আরোগ্য শক্তির দ্বারা সুস্থ হতে পারে; ামুক্তির জন্য চিকিৎসককে দেখবার প্রয়োজন তার নেই। যা আমি ত বলি তা যে না করে সে আমাকে শুধু দেখে কিরূপে লাভবান হবে? আমাকে দেখলে কোন ফল হয় না। যারা বহু দূরে থেকেও ধর্মপথে তারাই ঠিক ঠিক আমার কাছেই আছে। যে আমার কাছে থেকেও যার অবাধ্য হয় সে আমা থেকে বহু দূরে বাস করে। অথচ যে আমার ালন করে সে নিত্য তথাগতের সঙ্গ-সুখ উপভোগ করে।”*

তখন শ্রমণ সুভদ্র মল্লদের শালবনে গিয়ে আনন্দকে বললেন, “আমি ভ্রাতাদের নিকট শুনেছি, কদাচিৎ তথাগতগণ জগতে আবির্ভূত হন। মার গুরুভ্রাতাগণ বয়োবৃদ্ধ এবং অনুভূতিবান। তাঁদের কথা আমি খুব । করি। তাঁদের কাছে শুনলাম, অদ্য রাত্রির শেষ ভাগে গৌতম বুদ্ধ রিনির্বাণ লাভ করবেন। আমার মন সন্দেহ-সঙ্কুল। গৌতম বুদ্ধের আমার গভীর বিশ্বাস আছে। তিনি কি ধর্মশিক্ষা দিয়ে আমার

* সুত্তবিভঙ্গের পরাজিকা প্রকরণে এই অংশ বিস্তৃত ভাবে বিবৃত।

সন্দেহ দূর করবেন? আমি কি শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করতে পারি?" এই কথা শুনে আনন্দ সুভদ্রকে বললেন, "যথেষ্ট। ভাই সুভদ্র, আর তথাগতকে বিরক্ত করো না। তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত।" উভয়ের কথাবার্তা দূর থেকে শুনে তথাগত আনন্দকে ডেকে বললেন, "আনন্দ! সুভদ্রকে আমার কাছে আসতে বাধা দিও না। সে তথাগতের নিকট আসতে পারে। ধর্ম-জিজ্ঞাসু হয়ে সুভদ্র আমাকে দেখতে এসেছে। সে আমাকে বিরক্ত করতে আসেনি। তার প্রশ্নের উত্তরে আমি যা বলব সে শীঘ্র তা বুঝতে পারবে।" অনন্তর আনন্দ সুভদ্রকে বললেন, 'তুমি তথাগতের কাছে এসো। তিনি তোমাকে তৎসমীপে আসতে অনুমতি দিয়েছেন।' যখন তথাগত সুভদ্রকে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়ে উদ্বুদ্ধ, আনন্দিত ও আশ্বস্ত করলেন তখন সুভদ্র বুদ্ধকে বললেন, "হে ভগবন্, আপনার উপদেশ অতি অদ্ভুত। আপনার মুখ-পদ্ম-বিনিসৃত প্রজ্ঞা-বাক্যে চিত্তের সন্দেহ নিরাকৃত হয়, গুপ্ত তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, বিপথগামী পথিক ধর্মপথ দেখতে পান এবং অন্ধকার স্থানে জ্ঞান-দীপ জ্বলে। ভগবান স্বয়ং আমাকে ধর্মশিক্ষা দিয়েছেন। আমি সংঘ, ধর্ম ও বুদ্ধের শরণাগত হতে চাই। তথাগত আমাকে বিশ্বাসী অনুগত শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন। আজ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করলাম।"

সুভদ্র আনন্দকে বললেন, "ভ্রাতঃ, আপনার খুব সৌভাগ্য যে, আপনি এত বৎসর ভগবান্ বুদ্ধের সেবারত আছেন এবং তাঁর দিব্য সান্নিধ্য উপভোগ করেছেন।" তথাগত আনন্দকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কেহ ভাবতে পারে যে, বুদ্ধবাক্য শেষ হলো, আমাদের আর কোন গুরু নেই তোমাদের এই রূপ মনে করা উচিত নয়। ইহা সত্য যে, আমি আর দেহধারণ করব না। যদিও এই দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হবে তথাপি তথাগত থাকবেন। আমি যে ধর্ম শিক্ষা দিয়েছি, আমি যে সংঘ স্থাপন করেছি সেই ধর্ম ও সংঘই আমার অদর্শনের পরে তোমাদের শিক্ষক হবে। আমি গত হলে সংঘ ইচ্ছা করলে ক্ষুদ্র নিয়মগুলি তুলে দিতে পারে।"*

* 'মজ্ঝিম নিকায়' নামক পালিগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

তথাগত সমবেত ভিক্ষুগণকে লক্ষ্য করে বললেন, 'কোন ভিক্ষুর মনে বুদ্ধ, ধর্ম বা আর্যপথ সম্বন্ধে সন্দেহ উঠতে পারে। কেহ যেন পরে পরিতাপ না করেন যে, কেন আমি তথাগতের সম্মুখীন হয়েও তাঁকে একথা জিজ্ঞাসা করলাম না। অতএব, ভিক্ষুগণ তোমাদের মধ্যে কারুর কিছু প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা কর।' কিন্তু ভিক্ষুবৃন্দ সকলেই নীরব রইলেন। তখন আনন্দ তথাগতকে নিবেদন করলেন, 'আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি যে, সমবেত ভিক্ষুগণের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মনে বুদ্ধ, ধর্ম বা সংঘ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ আছে।' তথাগত আনন্দকে বললেন, "ষোল আনা বিশ্বাসের বলে তুমি এইরূপ বলতে পেরেছ। তথাগতও নিশ্চিত জানেন যে, কোন ভিক্ষুর চিত্তই সন্দিগ্ধ নয়। কারণ ভিক্ষুদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা পশ্চাদ্‌বর্তী বা আধুনিক সেও সত্য ধর্মে দীক্ষিত এবং সেও মুক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছে।" তখন তথাগত ভিক্ষুগণকে বললেন, 'যখন তোমরা ধর্মের স্বরূপ দুঃখের কারণ ও মুক্তির পথ অবগত আছ তখন তোমরা কি বলবে, আমরা তথাগতের প্রতি ভক্তিবশতঃ এরূপ করেছি।' ভিক্ষুবৃন্দ এক বাক্যে উত্তর দিলেন, 'না ভগবন্‌। আমরা কখনো সেইরূপ বলব না।' তখন তথাগত বলতে লাগলেন, 'যারা অজ্ঞানে বাস করে তারা যেন পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পরাধীন। আমি তাদিগকে পিঞ্জরমুক্ত করেছি। হে শিষ্যবৃন্দ, আমি বুদ্ধত্বলাভে কৃতকৃত্য হয়েছি। তোমরা ভুল না যে, মিশ্রিত বস্তু মাত্রই বিনাশ প্রাপ্ত হবে এবং একমাত্র ধর্মই থাকবে। অধ্যবসায় সহকারে তোমরা স্ব স্ব মুক্তি সাধন কর।" ইহাই তথাগতের শেষ বাণী। ইহার পর তথাগত মহাপরিনির্বাণে প্রবেশ করলেন।

মহানির্বাণ

যখন বুদ্ধ দেহরক্ষা করলেন তখন ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প ও ভীষণ বজ্রপাত হল। যে ভিক্ষুগণ নির্বাণপ্রাপ্ত হননি তাঁরা হাত পা ছুঁড়ে কাঁদতে লাগলেন। কেহ

কেহ ভূপতিত হয়ে দুঃখে-শোকে চীৎকার করে বললেন, "এত শীঘ্র তথাগ মহাপ্রয়াণ করলেন! এত শীঘ্র জগজ্জ্যোতিঃ নির্বাপিত হল! এত শী তথাগতের স্থূলদেহ পঞ্চভূতে বিলীন হল!" তখন শ্রদ্ধেয় অনুরুদ্ধ ভিক্ষুগণ সম্বোধন করে বললেন, "যথেষ্ট হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনারা আর কেউ কাঁদবেন বা শোক করবেন না! তথাগত কি বলেন নি, 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ তাহলে কি করে সম্ভব যে, তথাগতের স্থূলদেহ বিনষ্ট হবে না? যাঁরা জিতেন্দ্রি ও রিপুজয়ী তাঁরা সুশান্ত, সংযত হয়ে ধর্মভাবনা করে এই শোক স করবেন।" অনন্তর অনুরুদ্ধ ও আনন্দ বুদ্ধপ্রসঙ্গে অবশিষ্ট রাত্রি অতিবাহি করলেন।

প্রাতে অনুরুদ্ধ আনন্দকে বললেন, "ভাই আনন্দ, এখন যাও এবং কুশীনগ মল্লগণকে সংবাদ দাও যে, তথাগত দেহরক্ষা করেছেন। এখন তোমাদের করণীয় তা সম্পন্ন কর।" মল্লগণ তথাগতের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দুঃখিত, বিষন্ন মর্মাহত হলেন। তাঁরা স্ব স্ব অনুচরবর্গকে আদেশ দিলেন, 'তোমরা সুগ দ্রব্য, পুষ্পমাল্য ও বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ কর কুশীনগরে।' তাঁদের আদেশ পে অনুচরবৃন্দ বহু বাদ্যযন্ত্র ও মাল্যাদি ও পাঁচশত মূল্যবান্ পোষাক নিয়ে শালব তথাগতের শবদেহের নিকটে গেলেন এবং সারাদিন নৃত্য, গীত, বাদ্য ও বন্দন কাটালেন। তাঁরা শবদেহের উপর চাঁদোয়া খাটিয়ে মাল্যাদি দ্বারা উহা ভূষিত করলেন। অবশেষে রাজাধিরাজের মৃতদেহর ন্যায় তথাগতের শবদেহ মহাসমারোহে ভস্মীভূত করলেন।

যখন চিতাগ্নি জ্বলে উঠল তখন সূর্য চন্দ্র অস্তমিত হল, নিঃশব্দ জলস্রো প্রবল শব্দে প্রবাহিত হল, বন-জঙ্গল কেঁপে উঠল। পুষ্পবৃক্ষ ও ফলবৃক্ষ থে অসময়ে এত ফুল-ফল ঝরে পড়ল যে, সমস্ত কুশীনগরে সেগুলি হাঁটুপ্রমাণ জ গেল। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হলে দেবপুত্র সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন ক বললেন, "হে ভ্রাতৃবৃন্দ, ভগবান বুদ্ধের ভৌতিক দেহ ভস্মসাৎ হল। কিন্তু তি যে ধর্মশিক্ষা দিয়েছেন তা আমাদের মনে এখনো রয়েছে এবং আমাদিগ পাপ থেকে রক্ষা করছে। এসো, আমরা জগতের চারদিকে আমাদিগে

রুদেবের মত মৈত্রী ও করুণা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ি এবং তৎপ্রচারিত চার আর্যসত্য ও আষ্টাঙ্গিক ধর্মমার্গ প্রচার করি। তাতে মানব জাতি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিয়ে মুক্তিপথে প্রবর্তিত হবে।" যখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হল তখন নানা দেশের রাজপ্রতিনিধিগণ এসে পূত ভস্মাস্থির অংশ চাইলেন। তদনুসারে ভস্মাস্থি আট ভাগে বিভক্ত হল এবং সেগুলি সংরক্ষণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আটটি ডাগোবা নির্মিত হল। তন্মধ্যে একটী ডাগোবা মল্লগণ কর্তৃক কুশীনগরে স্থাপিত হয়। অন্য সাতটী ডাগোবা নির্মিত হয় রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবাস্তু, অল্লকপ্প, রামগ্রাম, বেষ্টদীপ ও পাবাতে।

তথাগতের মৃত্যুর পরে তাঁর শিষ্যবৃন্দ সমবেত হয়ে আলোচনা করলেন, কিরূপে ধর্মকে বিশুদ্ধ ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত রাখা যায়। উপালি উঠে বললেন, "আমাদের তিরোহিত মহাগুরু বলতেন, 'আমার মৃত্যুর পরে তোমরা ধর্মকে শ্রদ্ধা ও পূজা করবে, ধর্মকে বুদ্ধের মতই মানবে। অন্ধকারে অবস্থিত প্রদীপবৎ ধর্মই তোমাদের জীবন-পথে আলোক সম্পাত করবে। কোন মহারত্ন লাভের জন্য যেমন তোমরা প্রাণ পণ কর তেমনিই ধর্মসাধনার্থ যেন তোমরা জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাক। ধর্ম ও আমি অভিন্ন।' এই বুদ্ধবাক্য মেনে চললে আমরা দেখব বুদ্ধই ধর্মের দৃশ্য মূর্তি। তাঁর বাণী জীবনে রূপায়িত না করে ভস্মাস্থির উপর ডাগোবা নির্মাণ করে কি লাভ?"

অনুরুদ্ধ উঠে বললেন, "হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমরা যেন ভুলে না যাই যে, গৌতম আর্য ধর্মের স্থূলদেহ। শাশ্বত সত্য তাঁর দেহরূপে মূর্ত হয়েছিল। শাক্যমুনি অবতার। তিনি যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তা তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেও ছিল, তা তাঁর তিরোভাবের পরেও থাকবে। তিনি সত্যস্বরূপ ও সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ ও সর্বগুণসম্পন্ন। সত্যধর্ম সনাতন; কিন্তু ধর্মের কতকগুলি নীতি সাময়িক। বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সেগুলির ব্যবস্থা তিনি দিয়েছিলেন। ধর্মই বুদ্ধের প্রাণ। ধর্মের শরণ নিলে বুদ্ধের শরণ নেওয়া হয়।"

কাশ্যপ উঠে বললেন, "হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনারা খুব সত্য কথা বলেছেন। বুদ্ধ-ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র মতভেদ নেই। বুদ্ধের এই তিনটি দেহ

আছে—ধর্মকায়, নির্মাণকায় ও সম্ভোগকায়। বুদ্ধ যখন পরম সুখে অবস্থি থাকেন এবং সনাতন সত্যস্বরূপে সমারূঢ় হন তখন তিনি সম্ভোগকায়। যখ তিনি নির্মাণকায়ে থাকেন তখন তিনি প্রেমিক শিক্ষকরূপে প্রেতদেহ ধার করেন। যখন তিনি সংঘের প্রাণস্বরূপ হয়ে ধর্ম প্রচার করেন তখন তি ধর্মকায়। যদি তিনি গৌতম শাক্যমুনি হয়ে না আসতেন তাহলে আমরা ধ থেকে বঞ্চিত হতাম। যদি সংঘ সেই ধর্ম সংরক্ষণ না করেন তাহলে ভা নর-নারীগণ তা থেকে বঞ্চিত হবে। সুতরাং আসুন, আমরা সকলে সংঘব হয়ে বুদ্ধের জীবন ও বাণী সংরক্ষণে ব্রতী হই।' তখন ভিক্ষুবৃন্দ রাজগৃহে প্র বৌদ্ধ সংগীতি স্থাপনের সঙ্কল্প করলেন। সমবেত ভাবে বুদ্ধদেবের উপদেশ সংগ্র ও লিপিবদ্ধ করাই ছিল উক্ত সংগীতির প্রধান উদ্দেশ্য।

জাতকমালা

ধর্মার্থে প্রাণীহত্যা নিবারণই ছিল তথাগতের জীবন-ব্রত। রাজগৃহে কো ধর্মানুষ্ঠানে একটি নিরীহ ছাগশিশুকে বলি দেবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। ভগবা বুদ্ধ ছাগটির প্রাণরক্ষার্থ নিজের জীবন উৎসর্গ করতে অগ্রসর হলেন। তা যাজ্ঞিকরা প্রাণীবধে বিরত হলেন। জাতকমালা থেকে জানা যায়, পাঁচশ জীবন তিনি পরার্থে উৎসর্গ করে বোধিলাভের অধিকারী হন।

জাতকমালায় দেখা যায়, তথাগত পূর্ব পূর্ব জন্মে চার বার মহাব্রহ্মা, বিশ বা ইন্দ্র তিরাশী বার সন্ন্যাসী, আটান্ন বার রাজা ও চব্বিশ বার ব্রাহ্মণ হ জন্মেছিলেন। এছাড়া বানর, হস্তী, সিংহ, বরাহ, শশক, মৎস, বৃক্ষ, চো বাজীকর ও ভূতের রোজা প্রভৃতি বহু জন্ম তিনি লাভ করেছিলেন। কি তিনি নারীজন্ম গ্রহণ করেন নি, বা ভূত, প্রেত যোনিও প্রাপ্ত হননি। সক জন্মেই তিনি বোধিসত্ত্ব ছিলেন এবং জগতের মঙ্গল কামনায় অশেষ দুঃখ বরণ করেছিলেন। শত শত বার জন্ম-চক্রে ঘূর্ণিত হয়ে তিনি মুক্তিলাভে যোগ্যতা অর্জন করেন।

জাতকমালায় পূর্বজন্ম-কাহিনীতে বুদ্ধকে স্বার্থহীন পরোপকারী এ

।বতারক্রপে চিহ্নিত করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের এক স্থানে তথাগত ।ছেন, "আমি সাম নাম ধারণ করে উপত্যকারণ্যে বাস করতাম। সর্বভূতে ।ৃষ্টি দ্বারা আমি সকলকে বশে এনেছিলাম। সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক; বন্য ।হ, বন্য মহিষাদি হিংস্র জন্তুরা পালিত পশুর ন্যায় আমার কাছে ।স বসত। তারা আমাকে ভয় করত না এবং আমিও তাদের ভয় ।তাম না। আমি মৈত্রী-ধর্মে সদা সুরক্ষিত হয়ে নির্ভয়ে পার্বত্য প্রদেশে ।চরণ করতাম।"

বুদ্ধ-বাণীর সারমর্ম এই যে, আত্মত্যাগই চিত্তশুদ্ধির উৎকৃষ্ট উপায়। তথাগত ।শত জীবনে আত্মত্যাগের পরকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। পূর্বজন্মে বুদ্ধ যখন ।জকুমার বশ্বন্তর হয়েছিলেন তখন তাঁর বিপদের সীমা ছিল না। বশ্বন্তর ।ায্য ভাবে রাজ্য থেকে নির্বাসিত হন। তাঁর সমস্ত ধনসম্পত্তি এবং প্রিয় ।টি অশ্ব সহ দান করে তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েন। স্ত্রীপুত্রাদি সহ পদব্রজে ।সহায় হয়ে প্রখর রৌদ্রে তিনি অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পথের মধ্যে ।ছে নানা সুপক্ব ফল ঝুলে আছে দেখে তাঁর ছেলেমেয়েরা সেই ফল পাড়বার ।্য লালায়িত হল। গাছগুলি পর্যান্ত তাদের দুর্দশায় সমবেদনা দেখিয়ে স্বতঃই ।নত হয়ে তাদিগকে ফল পাড়তে সুযোগ দিল। পরে তারা বঙ্ক পর্বতে ।ধুবেশে এক পর্ণকুটীরে আশ্রয় নিলেন। উক্ত জীবন সম্বন্ধে বুদ্ধ বলেন, ।আমি রাজকন্যা মাদ্রী, দুই পুত্র, দুই কন্যা জ লি ও কৃষ্ণাজিনা—এই কয়জন ।লে সেই পর্ণকুটীরে থাকতাম এবং পরস্পরের দুঃখাশ্রু মুছে সান্ত্বনা ।তাম। আমি ছেলেমেয়ে চারটির সংরক্ষণে আশ্রমে থাকতাম, আর মাদ্রী ।ন থেকে নানা ফল কুড়িয়ে এনে আমাদিগকে খাওয়াত।

এই সময়ে একটি ভিক্ষুক এসে আমার পুত্র-কন্যা ভিক্ষা চাইল। আমি ।কটু মৃদু হেসে পুত্রকন্যা দান করে ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করলাম। কিঞ্চিৎ ।রে স্বর্গ থেকে ইন্দ্র নেমে এসে মাদ্রীকেও ভিক্ষা চাইলেন। সতী সাধ্বী ।দ্রীকেও আমি সন্তুষ্ট চিত্তে দান করলাম। এই দান দেখে দেবতারা আকাশ ।থেকে পুষ্পবৃষ্টি করলেন, বনের তরুরাজি থেকে মেরু পর্বত পর্য্যন্ত নিখিল পৃথিবী

কেঁপে উঠল। বুদ্ধত্ব লাভের আশায় আমি স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি পরিত্যাগ করল সেই মুনিজন-কাঙ্ক্ষিত মহামূল্য বোধি-রত্নের নিকট এই সকল নশ্বর বস্তু ক্ষুদ্র! কি তুচ্ছ!"

আর একটি জাতক-গল্পে আছে, বুদ্ধ পূর্ব জন্মে একটি বিজ্ঞ শশক হয়েছি তিনি শশক রূপে পার্বত্য অরণ্যে চরে বেড়াতেন। ঘাস-পাতা, ফল মূ পেতেন তাই খেতেন। সেই বনে একটি বানর, একটি শৃগাল ও একটি বি তাঁর সাথী ছিল। তাঁর সাথীদিগকে তিনি ধর্মোপদেশ করতেন, ভা শিক্ষা দিতেন। যাহা ভাল তাহা করা উচিত এবং যাহা মন্দ তাহা ছাড়া উচিত এই ছিল তাঁর মূল শিক্ষা। পূর্ণিমার উপবাস পর্বে তিনি তাঁর সঙ্গীদিগ বলতেন, "এই পুণ্য দিনে ভিক্ষুকদিগের জন্য অন্নদানের ব্যবস্থা কর, পাত্রা বিবেচনা করে ভিক্ষা দিও এবং আগে থেকে ভিক্ষার সামগ্রী প্রস্তুত রাখ।" শশকরূপী বোধিসত্ত্ব বসে ভাবতে লাগলেন, "এই উপলক্ষে কি করা যায়। কলাই, মটর, ডাল, ভাত আমার কিছুই নাই। আমি ঘাস থাকি। তা তো আর কাউকে দেওয়া যায় না। ভাল কথা মনে পড়ে কেউ এসে ভিক্ষা চাইলে আমি নিজেকেই দান করব, তাকে রিক্ত হস্তে যেতে দেব না।" ইন্দ্র আমার মনোভাব জানতে পেরে আমাকে প করবার জন্য ভূতলে নেমে এলেন। তিনি ব্রাহ্মণ-বেশে আমার বি সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, "ভিক্ষা দাও"। আমি বললাম, "আপনি চাইতে এসেছেন, ভালই হয়েছে। আমি আপনাকে এমন জিনিষ দেব যা কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না। মহাশয়, সাধুপুরুষ কাউকেও অ কষ্ট দিতে চান না। আমি আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি কিছু শু কাঠ কুড়িয়ে এনে জ্বালিয়ে ফেলুন এবং আমি নিজে সেই আগুনে আপনার আহার্য হই।" শশকের প্রার্থনা মত ইন্দ্র কাজ করলেন এবং পাশে এসে বসলেন। যখন কাঠগুলি জ্বলে উঠল তখন শশক জ্বলন্ত আ মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। জলে পড়লে যেমন গাত্রদাহ নিবারিত হয় সেই চিতানলে শশকের সকল দুঃখকষ্ট অবসিত হল। অস্থি-চর্ম, মাংস,

হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি সহ শশকের সমস্ত দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ব্রাহ্মণরূপী জর হস্তে শশক অকাতরে আত্মসমর্পণ করল।

লি ভাষায় ৫৫৫টী জাতক আছে। ব্রহ্মদেশে ৫১৫টী জাতক প্রচলিত। র্কের অধ্যাপক ফাসবোল পালি জাতকগুলি ইংরাজীতে প্রকাশ করেছেন। ঈশানচন্দ্র ঘোষ জাতকমালার বঙ্গানুবাদ করে অমর হয়েছেন। সংস্কৃত মালা আর্যশূর কর্তৃক প্রণীত। কিন্তু তাতে মাত্র ৩৪টী গল্প আছে। ইহার গল্পটী ব্যাঘ্রী জাতক। ইহা থেকে জানা যায়, বুদ্ধদেব কোন পূর্ব জন্মে ব্যাঘ্রীর ক্ষুধা নিবারণ ও প্রাণরক্ষার্থে আত্মবলি দেন। গল্পটী সংক্ষেপে —

দা বুদ্ধদেব কোন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কল্পসূত্র অনুসারে তাঁর দি সংস্কার হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত মেধাবী, কৌতুহলী ও অনলস । সেজন্য তিনি অল্প কালের মধ্যেই আঠার বিদ্যায় পারদর্শী হলেন এবং দব বিদ্যায়ও তিনি গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন। তাঁর প্রচুর প্রতিষ্ঠাও ল। তিনি গার্হস্থ্য গ্রহণ না করে প্রব্রজিত হলেন। তিনি সন্ন্যাসী ন জেনে তাঁর বন্ধুবাও সংসার ত্যাগ করলেন। তন্মধ্যে অজিত তাঁর শিষ্য হল। তিনি বনজঙ্গল ও পাহাড় পর্বতে পর্য্যটন করতে ভাল ন। অজিত সর্বদা ছায়ার মত তাঁর সঙ্গে ফিরতেন। একদিন তিনি পর্বত-গুহায় একটী ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রীকে দেখলেন। সে সবেমাত্র একটী প্রসব করেছে এবং তজ্জন্য অত্যন্ত দুর্বল, ক্ষুধিতা ও তৃষ্ণার্ত বাচ্চার দিকে তাকাচ্ছে। ব্রাহ্মণ কুমার দেখলেন, ব্যাঘ্রী ক্ষুধাকাতর জের বাচ্চাটীকে খেতে চায়। সন্ন্যাসী করুণার্দ্র হয়ে শিষ্যকে বললেন, ক্ষুধা নিবারণার্থ এখনই স্বীয় শাবককে খেয়ে ফেলবে। তুমি যদি তার জন্য শীঘ্র কিছু খাবার এনে দাও।" গুরুর আদেশে শিষ্য ব্যাঘ্রীর হার সন্ধান করতে গেলেন। ইতোমধ্যে সন্ন্যাসী ভাবলেন, "আমার শ্বর দেহ রেখে আর কি লাভ? আমিই ব্যাঘ্রীর আহার হই না কেন? থা ভেবে তিনি একটী উচ্চ স্থান থেকে লাফ দিয়ে ব্যাঘ্রীর সামনে পড়ে

দেহত্যাগ করলেন। তখন ব্যাঘ্রী তাঁকে আহার করে নিজের ক্ষুধ ও প্রাণ বাঁচাল। শিষ্য এসে দেখলেন, গুরু ব্যাঘ্রীর প্রাণরক্ষার্থে নিজে দিয়েছেন। তিনি অন্যান্য শিষ্যদিগকে এই সংবাদ দিলেন। এই ঘটন সকলেই ভাবলেন, "ইনি নিশ্চয়ই কোন জন্মে বুদ্ধ হবেন।"

পালি জাতকমালা হীনযানী বৌদ্ধদের প্রিয়। আর মহাযানী (নিকট অবদানমালা প্রিয়। জাতকে ও অবদানে বুদ্ধের পূর্ব পূর্ব জন্মের পাওয়া যায়। তবে অবদান সংস্কৃতে রচিত এবং আরো ব্যাপক অর্থে ব কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র ও আর্য্যশূর প্রভৃতি প্রণীত অনেক অবদান গ্রন্থ আর্য্যশূরের **অবদানশতকে** এক শত অবদান আছে। ক্ষে বোধিসত্ত্বাবদানে ১০৮ অবদান পাওয়া যা। মহাবস্তু অবদানের এক নিম্নে উল্লিখিত হল। কোন জন্মে বুদ্ধ কাশীরাজ অঞ্জনের পুত্র পুণ্যব আবির্ভূত হন। বীর্য্যবন্ত, শিল্পবন্ত, রূপবন্ত ও প্রজ্ঞাবন্ত নামে পুণ্যবন্তে বন্ধু ছিলেন। প্রত্যেকের গুণ নামেই প্রকাশিত। একদা পাঁচ বন্ধু স্ব স্ব গুণ পরীক্ষার্থ কাম্পিল্লে যাত্রা করলেন। পথে তাঁরা দেখলেন একটা প্রকাণ্ড বাহাদুরী কাঠ ভেসে যাচ্ছে। বীর্য্যবন্ত জলে ঝাঁপ দি কাঠ ডাঙ্গায় তুলে আনলেন এবং পরীক্ষা করে জানলেন, সেটা চন্দন সেটা বিক্রয় করে তাঁরা প্রচুর অর্থ পেলেন এবং সেই অর্থে যথেষ্ট আহ্লাদ করলেন।

একদিন শিল্পবন্ত কোন নগরের প্রান্তে বসে সপ্ত তন্ত্রী বীণা বাজাতে বীণার মধুর ঝঙ্কার শুনে দলে দলে লোক আকৃষ্ট হল। এরূপ বীণাবা কখনো শুনে নি। কিন্তু বাজাতে বাজাতে বীণার একটী তার ছিঁড়ে তা সত্ত্বেও শিল্পবন্ত সাত তারের মতই বীণাটী বাজাতে লাগল। পরে আ তার কেটে গেল। ক্রমে চার তার, তিন তার, দুই তার ও শেষে এক ত রইল। কিন্তু তাতেও বাদ্যের ব্যতিক্রম হল না, বাদ্য পূর্ববৎ চলতে নাগরিকগণ তাঁকে প্রচুর অর্থ উপহার দিলেন। রূপবন্তের দিব্যরূ নগরের এক বেশ্যা মুগ্ধ হল এবং তাঁকে বহু অর্থ দিল।

দিন প্রজ্ঞাবন্ত বাজারে গিয়ে দেখলেন, শেঠপুত্র কোন বেশ্যার সঙ্গে রছে। শেঠপুত্র পূর্বরাত্রিতে বেশ্যাকে ডেকে পাঠিয়েছিল এবং সেজন্য টাকা তাকে দিতে স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু অন্য বাড়ীতে বেশ্যার যাবার ন, তাই সে শেঠের বাড়ীতে যেতে পারেনি। পরদিন প্রাতে বেশ্যা বাড়ীতে যেতে তৎপুত্র তাকে বল্‌লে, "তোমায় আর আমার প্রয়োজন আমি গত রাত্রে তোমাকে স্বপ্নে পেয়েছিলাম।" তখন বেশ্যা বল্‌লে, মার প্রাপ্য লক্ষ টাকা আমায় দাও। কারণ তুমি ত আমায় পেয়ে

এই ঝগড়ার কোন মীমাংসা হল না। দুই দলের সমর্থক জুটে শেষে প্রজ্ঞাবন্ত মধ্যস্থ হয়ে ঝগড়াটি মিটিয়ে দিলেন। তিনি শেঠকে ক টাকা আনতে বল্‌লেন এবং তৎসঙ্গে একটী বড় দর্পণ। উভয় নীত হলে প্রজ্ঞাবন্ত বেশ্যাকে বল্‌লেন, "শেঠজী তোমার ছায়ামাত্র লেন। তুমিও দর্পণের মধ্য দিয়ে টাকার ছায়ামাত্র গ্রহণ কর।" বশ্যার মুখ বন্ধ! মহানন্দে শেঠ উক্ত অর্থ পাঁচ বন্ধুকে উপহার দিলেন। কা পেয়ে পাঁচ বন্ধুতে খুব আমোদ প্রমোদ করলেন।

ান রাজবাড়ীর সম্মুখে একদিন পুণ্যবন্ত বসে ছিলেন। এমন সময় এসে তাঁর পুণ্য জ্যোতি দেখে মুগ্ধ হলেন। তিনি পুণ্যবন্তকে রাজবাড়ীর নিয়ে গেলেন এবং উহার এক অংশে থাক্‌তে দিলেন। রাত্রিতে নিদ্রিত কে দেখে রাজকন্যাও মুগ্ধ হলেন এবং তার সেবা করতে লাগলেন। তা রক্ষকরা পুণ্যবন্তকে রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা সব খবর নিয়ে ন, পুণ্যবন্ত এবং কাশীরাজকুমারী নির্দোষ। তিনি পুণ্যবন্তের সঙ্গে স্বীয় বিবাহ দিলেন এবং তাঁকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করলেন।

ই পুণ্যবন্তই বুদ্ধ, বীর্য্যবন্ত তৎশিষ্য শোনক, শিল্পবন্ত রাষ্ট্রপাল, রূপবন্ত ও প্রজ্ঞাবন্ত শারিপুত্র।

বুদ্ধ-বাণী

প্রাণীহত্যা, অপহরণ, ব্যভিচার, মিথ্যাকথন ও সুরাপান—এই পঞ্চ হতে নিবৃত্তি সর্বসাধারণের কর্তব্য।

অকাল ভোজন, নৃত্যগীতাদিতে অনুরাগ, গন্ধমাল্যাদি ব্যবহার, কে শয্যায় শয়ন ও সোণারূপাদি গ্রহণ—এই পঞ্চব্যসন হতে সাধুগণ নি হবে। চার আর্য্য সত্যের সম্যক্ অবগতি ব্যতীত সংসৃতি-পথে : বন্ধ হয় না।

পূর্ব পূর্ব জন্মে ও ইহজন্মের কর্মফলেই মানুষ বর্তমান অবস্থায় পতি কর্মফলেই সুখ বা দুঃখ আসে।

দিব্য জ্যোতির কণামাত্র মানব হৃদয়ে লুকায়িত। ধর্মসাধন দ্বারাই (জ্যোতির পূর্ণ প্রকাশ ইহজীবনে সম্ভব।

বোধিলাভান্তে আমি শান্তিধামে বাস করছি। যে অষ্টাঙ্গ আর্য্য ধর্ম পা করবে, সেই বুদ্ধ হবে, বোধিলাভ করবে।

আমি অমৃত-হ্রদে স্নান করেছি। তাতে স্নান করলে সর্বদুঃখ নিবৃত্ত হ যে কামনা-মুক্ত হয়ে নির্বাণ-সাগরের তীরে উপস্থিত হয়েছে সে পরম সু অধিকারী। সে সুখের তুলনায় ইন্দ্রিয়-সুখ তুচ্ছ। দেবতারাও সে সু আস্বাদ পায় না।

যে বাসনার নির্বাণ করেছে সে পদ্মপুষ্পবৎ সংসার-সলিলে ভাসে; f সিক্ত হয় না। মাতা যেমন তাঁর একমাত্র পুত্রের জীবন রক্ষার্থ নিজেকে বি করে তেমনি তিনি সর্ব প্রাণীর প্রতি মৈত্রীযুক্ত হন। ইহাই মুক্তি, ইহ স্বর্গ, ইহাই অমৃতানন্দ।

যেমন গঙ্গা, যমুনা, মহী, অচিরাবতী প্রভৃতি নদনদী যেরূপই হোক না ে সাগরে প্রবেশপূর্বক স্ব স্ব পূর্ব নাম ও রূপ হারিয়ে, একই সাগর নাম ধা

তেমনি যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চার বর্ণ আমার উপদেশ অনুসারে
াগী হয়ে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হয় তখন পূর্ব নাম ও বংশ-মর্য্যাদি ত্যাগ
শাক্যপুত্রীয় ভিক্ষু নামেই কথিত হয়।

প্রমালাপ, পৌরহিত্যের প্রজ্ঞা ও সত্যপথ হতে বিচ্যুতি—এই তিনটি
র বিশেষত্বই সংগুপ্তি। যে নারী প্রেমাসক্ত সে সংগুপ্তি সন্ধান এবং
া বর্জন করে। যে পুরোহিত দেব শক্তির অধিকার দাবী করে সে গুপ্ত
ত চায়, প্রকাশিত হতে চায় না। যে সত্যপথ হতে বিচ্যুত হয় সেও
লোকসঙ্গ পরিহার করে ও গোপনে থাকে।

িনটি বিষয় জগতে গুপ্ত থাকে না, ভাস্বর হয়ে উঠে। সেই তিনটি
় কি? চন্দ্র, সূর্য্য ও তথাগত-প্রচারিত আর্য্যধর্ম। চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন
ক আলোকিত করে তেমনি আর্য্যধর্ম জগতের অজ্ঞানান্ধকার নাশ
ও উহাকে দিব্যালোকে উদ্‌ভাসিত করে। এই তিনটি বিষয় সম্বন্ধে
প্তি অসম্ভব।

াালি গ্রন্থ 'দীঘনিকায়ে'র মহাপদান সুত্তে বুদ্ধ-বাণীর সারমর্ম এই রূপে
।—সর্বপাপাচরণ ত্যাগ, নিয়ত কুশল কর্মের অনুষ্ঠান এবং চিত্তের সম্যক্
ন—ইহাই সংক্ষিপ্ত বুদ্ধানুশাসন।

ন্দন, তগর, উৎপল অথবা জুই ফুলের সুগন্ধ অপেক্ষা শীলগন্ধ (সদাচারের
) অতি উত্তম। চন্দন, চামেলি, টগর বা মল্লিকাদি ফুলের সুগন্ধ বায়ুর
ীত দিকে যেতে পারে না। কিন্তু সৌজন্য বা সাধুতার সুগন্ধ বায়ুর
ীত দিকে যায়। সৎপুরুষ দশ দিকে সদ্‌ভাব বিস্তার করেন।

াাতা যেমন প্রাণ দিয়েও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন তদ্রূপ সকল প্রাণীর
অসীম দয়া দেখাবে। ঊর্ধদিকে, অধোদিকে, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বেও
ম সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন, হিংসারহিত, শত্রুতাশূন্য হৃদয়ে দয়াভাব
ণ করবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি শুইতে যাবৎ নিদ্রিত না
তাবৎ এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকবে। ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।

লোহা থেকে উৎপন্ন মল যেমন লোহাকে ক্ষয় করে তেমনি চঞ্চল লোকের

দুষ্কর্ম তার দুর্গতির কারণ হয়। সুর সহ পাঠ না করা বেদমন্ত্রের মল। লেপা, পোছা, ঝাঁট দেওয়া বা মেরামত না করাই গৃহের মল। আলস্য দেহের মল ও রক্ষকের মল প্রমাদ। দুরাচার নারীর মল, কৃপণতা দাতার মল এবং পাপ ইহলোক ও পরলোক দুই লোকের মল। অবিদ্যা (অজ্ঞান)ই মলের মল মহামল। এই মল ত্যাগ করে নির্মল হও।

আকাশে কোন চিহ্ন থাকে না। সন্ন্যাসী বাহিরে থাকে না, দেবস্থানে ব সন্তপুরে থাকে। সকলে প্রপঞ্চে সংলগ্ন থাকে; কিন্তু সম্বুদ্ধ ব্যক্তিগণ নিষ্প্রপঞ্চ থাকেন।

বহু শাস্ত্র শ্রবণেও কেউ ধর্মধর হয় না। যে অল্প শুনেই দেহ ও মন দিয়ে ধর্মাচরণ করে ও ধর্মাচরণে সদা প্রমাদরহিত থাকে সে-ই ধর্মধর (ধর্মজ্ঞ) হয়।

যার মধ্যে সত্য, ধর্ম, অহিংসা, সংযম ও দম আছে সে-ই নির্মল, সে-ই স্থবির (সাধু)।

যে ইহলোকে পাপ ও পুণ্য ত্যাগ করে ও ব্রহ্মচর্য্যবান্ হয় এবং বিবেকের নির্দেশে বিচরণ করে সে-ই ভিক্ষু, সে-ই সাধু।

সাধু চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, দেহ, মন ও বাক্য সংযত রাখেন তিনি সর্ববিষয়ে সর্বত্র সংযত থাকেন বলে সর্বদুঃখ থেকে মুক্ত হন। ইন্দ্রি সংযমই দুঃখনাশের উৎকৃষ্ট উপায়।

মানুষ নিজেই নিজের উদ্ধারক ও প্রভু। মানুষ নিজেই নিজের সুখে বা দুঃখের বিধাতা। যেমন বণিক সুন্দর ঘোড়াকে সংযত করে তেমনি মানুষ, আত্মসংযমরূপ ভেলায় চড়ে দুঃখ-সাগর উত্তীর্ণ হও। সংযমী পুরু কখনো দুঃখে অভিভূত হয় না। হালহীন নৌকাকে বায়ু যেমন চালিত কর তেমনি অসংযম মানুষের জীবন-তরীকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করে।

হে ব্রাহ্মণ! তৃষ্ণা-স্রোত ছিন্ন কর! পরাক্রম দ্বারা সকল কামনা দূর কর কৃত বস্তুর নশ্বরতা উপলব্ধিপূর্বক অকৃত বোধি (ব্রহ্ম) বস্তুর অধিকারী হও।

যার চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত এবং যার 'আমি' ও 'আমার' ভা

যে রূপাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়-বিষয়ে অনাসক্ত ও নির্ভয় আমি তাকেই ণ বলি।

যে ধ্যানী, নির্মল, স্থির, চিত্ত-মলশূন্য ও সত্যদ্রষ্টা আমি তাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

দিনে সূর্য্য তাপ দেন, চন্দ্র রাত্রে জ্যোৎস্না দেন, সজ্জিত ক্ষত্রিয় রণে পীড়া, তপস্বী ব্রাহ্মণ তাপ দেন। আর বুদ্ধ অহোরাত্র দিব্য তেজ সর্বদা ীর্ণ করেন।

ব্রাহ্মণকে প্রহার করা অনুচিত। আর যদি কেউ তাকে প্রহার করে ব্রাহ্মণ প্রতি কোপ করেন না। ব্রাহ্মণ-হন্তা ধিক্, হন্তার প্রতি কোপকারী ণও ধিক্।

প্রিয় বস্তুসমূহ থেকে মন গুটিয়ে নাও। তাহলে শান্তি পাবে। যেখানে র মন অহিংস ভাবে নিবৃত্ত হয় সেখানেই দুঃখনাশ হয়। অনাসক্তি ও ংসা ব্রাহ্মণত্বের উত্তম লক্ষণ।

যার দেহ, মন ও বাক্য দ্বারা দুষ্কৃত হয় না এবং এই তিন ভাবে যে সংযত ক আমি তাকে ব্রাহ্মণ বলি।

জটা, গোত্র বা জাতি দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না। যে সত্যনিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ ই শুচি, সে-ই ব্রাহ্মণ।

হে দুর্মেধ তপস্বী! জটাভার বহন করলে কি লাভ হয়? আর চর্ম পরলেই বা কি ফল হয়? অন্তর যদি রাগাদি মলে পরিপূর্ণ থাকে া ত্রিসন্ধ্যা স্নান দ্বারা বহির্দেহ ধুলে কি হবে?

ব্রাহ্মণ কুলে জাত হলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় না। বর্ণগত ব্রাহ্মণরা সকিঞ্চন সংগ্রহী হয়। যে অকিঞ্চন ও অপরিগ্রাহী সে ব্রাহ্মণকুলে জাত না হলেও ণত্বের সুযোগ্য অধিকারী হয়।

যে সর্ববন্ধনমুক্ত ও অভীঃপ্রাপ্ত, যে সঙ্গাতিগ ও আসক্তিরহিত আমি কেই ব্রাহ্মণ বলি।

যে ক্রোধ, তৃষ্ণা, হিংসা ও অজ্ঞান ত্যাগ করে এবং যে ধর্মীয় মতবাদ ষ্টপাশ থেকে মুক্তি পেয়ে বুদ্ধ (জ্ঞানী) হয়েছে সে-ই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

যে অদুষ্ট চিত্তে দুর্বাক্য, শত্রুতা ও বন্ধন তিতিক্ষা করে এবং ক্ষমা-বলই :
প্রধান বল তাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

পুষ্কর-পত্রে বারিতুল্য ও আরাগ্রে সর্ষপতুল্য যে ভোগে লিপ্ত না হয় সে
আসল ব্রাহ্মণ।

অগ্রে, পশ্চাতে ও মধ্যে সর্ববস্তু ত্যাগ কর এবং ভবসাগরের পারে যা
চার দিকে যিনি মুক্ত হন তিনি জন্ম ও জরা প্রাপ্ত হন না।

সর্বদান অপেক্ষা ধর্মদান বড়। সর্বরস অপেক্ষা ধর্মরস সুমধুর। সর্ব
অপেক্ষা ধর্মরতি প্রবল। তৃষ্ণাক্ষয় দ্বারা সর্বদুঃখ দূরীভূত হয়।

দুষ্কৃত না করাই শ্রেয়। কারণ দুষ্কৃতকারী পরে অনুতাপ ভোগ ক
সুকৃত করাই শ্রেয়; কারণ তাতে মানুষের অনুতাপ আসে না।

অলজ্জাকর (সৎ) কাজে যে লজ্জা করে এবং লজ্জাকর কাজে যে ল
না করে এরূপ মিথ্যা ধারণাযুক্ত মানুষ দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। নির্ভয় কাজে
ভয় পায় ও সভয় কাজে যে ভয় পায় না এরূপ মিথ্যা ধারণাযুক্ত ম
দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। অনবদ্য কাজে যে দোষ দেখে এবং দোষদুষ্ট কাজে
দোষ দেখে না এইরূপ মিথ্যা ধারণাযুক্ত মানুষ দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। দো
দোষ এবং গুণকে গুণ বলে জান। দোষ-গুণ সম্বন্ধে ঠিক ধারণা
সুগতি লাভ হয়।

যেমন স্বর্ণকার সোণার ময়লা ধীরে ধীরে পোড়ায় তেমনি বুদ্ধিমান প
প্রতি মুহূর্তে ক্রমশঃ স্বীয় চিত্তমল দূর করে।

যে মুনি অহিংস এবং সদা কায়ে সংযত তিনি অচ্যুত স্থানে গমন করে
সেই স্থানে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না ও শোক-তাপ পেতে হয় না।

যে সদা সচেতন ও রাত-দিন উত্তম শিক্ষা লাভ করে এবং নির্বাণ প্রা
দ্বারা মুক্ত হয়েছে তার চিত্তমল চিরতরে বিনষ্ট হয়ে যায়।

যে ক্রোধমুক্ত, অভিমানরহিত ও বন্ধনশূন্য এবং নামরূপে অনাসক্ত
পরিগ্রহরহিত তাকে দুঃখশোক সন্তপ্ত করতে পারে না।

তৃষ্ণা থেকে শোক ও ভয় জন্মে। যে তৃষ্ণামুক্ত তার শোক নেই, ভয়ও নে

যে সদাচারসম্পন্ন, বিদ্যানুরাগী, ধর্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী ও কর্তব্যপরায়ণ তাকে
সকলেই ভালবাসে।

ক্রোধের সমান অগ্নি নাই, দ্বেষের সমান দোষ নাই। রূপাদি পঞ্চ স্কন্ধের
সমান দুঃখ নাই, আর শান্তির সমান সুখ নাই।

আরোগ্য পরম লাভ, সন্তোষ পরম ধন, বিশ্বাস পরম বন্ধু এবং নির্বাণ
পরম সুখ।

বিজয় বৈরভাব সৃষ্টি করে। পরাজিত পুরুষ দুঃখে নিদ্রা যায়। রাগাদি
দোষমুক্ত পুরুষ বিজয় ও পরাজয় ত্যাগ করে শান্তিতে নিদ্রা যায়।

উত্তম পুরুষ দুর্লভ। সৎপুরুষ সর্বত্র দেখা যায় না। যে কুলে তিনি জাত হন
সেই কুলের সুখবৃদ্ধি হয়।

বুদ্ধদের জন্ম সুখদায়ক। সত্যধর্মের উপদেশ সুখদায়ক। সংঘের একতা
সুখদায়ক এবং ঐক্যবদ্ধ তপশ্চর্যা সুখদায়ক।

পূজার্হ বুদ্ধগণ অথবা তাঁদের অনুগামীগণ (যাঁরা সংসার অতিক্রম করে
শোক-ভয় উত্তীর্ণ হয়েছেন) এবং মুক্ত পুরুষদের পূজা ও সেবা মহাপুণ্য।

ক্ষমা ও তিতিক্ষাই পরম তপস্যা। অন্যকে হিংসা না করা ও পীড়া না
দেওয়া, নিন্দা না করা, নৈতিক জীবন দ্বারা স্বীয় জীবন সুরক্ষিত করা,
পরিমিত আহার, একান্তে শয়ন ও উপবেশন এবং চিত্তকে যোগযুক্ত করাই
বুদ্ধের শিক্ষা।

যে ধীর ধ্যানশীল, এবং নৈষ্কর্ম্য ও উপশমে নিরত তিনিই স্মৃতিমান সম্বুদ্ধ।
দেবতাগণও তার সৎসঙ্গ কামনা করেন।

যে ধর্মত্যাগী মৃষাবাদী পরলোকচিন্তারহিত তার পক্ষে কোন পাপ
অকরণীয় নয়।

পরার্থে বহুহিতের জন্য আত্মহিত বর্জন অনুচিত। আপনার মঙ্গল অবহিত
হয়ে পরহিতে রত হবে।

যে ব্যক্তি ধর্মজীবী আর্য চরিত্র ও আর্য্য ধর্মকে নিন্দা করে সে বাঁশের তীরের
মত নিজেই নিজের সর্বনাশ করে।

অনুচিত এবং অনিষ্টকর কর্ম সুকর ; কিন্তু উচিত ও হিতকর অতিশয় দুষ্কর।

আত্মাই আত্মার প্রভু। আত্মা অপেক্ষা আর কে বড় প্রভু আছে ? সুদ আত্মার দ্বারা দুর্লভ প্রভুকে, পরমাত্মাকে লাভ করা যায়।

যেমন অন্যকে আমরা দমন করি বা করতে চাই তেমনি নিজেকে দমন ব উচিত। সত্যই আত্মজয়ী এবং সুদান্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন।

এখন তুমি বিবর্ণ পাতার মত বিশুষ্ক হয়েছ। যমদূত তোমার পাশে এ দাঁড়িয়ে আছে। তুমি প্রয়াণের জন্য প্রস্তুত হয়েছ। কিন্তু পরলোকের পা তোমার কাছে কিছু নেই। তুমি আত্মরক্ষার্থ ধর্মকে আশ্রয় কর। উদ্যোগী পণ্ডিত হও। চিত্তমল ধৌত করে দোষমুক্ত হয়ে আর্য ধর্মপদ লাভ কর।

লোকে মৌনকেও নিন্দা করে, আবার বহুভাষীকেও নিন্দা করে। নিন্দ মিতভাষীকেও নিন্দা করতে ছাড়ে না। ইহলোকে অনিন্দিত কেউ নেই একান্ত নিন্দিত বা একান্ত প্রশংসিত পুরুষ পূর্বে ছিল না, ভবিষ্যতেও হবে এবং এখনও নেই।

অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে। অসাধুকে সাধুভাব দ্বারা, কৃপণকে দা দ্বারা এবং মিথ্যাবাদীকে সত্য কথন দ্বারা জয় করবে।

যে সত্য বলে, ক্রোধ না করে, ও একবার চাইলেই দান করে সে দেবত দিগের অন্তিকে উপস্থিত হয়।

যদি সত্যই নিজেকে প্রিয় বলে জান তবে নিজেকে সর্বথা সুরক্ষি কর। পণ্ডিত রাত্রির তিন প্রহরের মধ্যে এক প্রহর জাগ্রত থাকেন আত্মরক্ষার্থ নিরন্তর সতর্ক থাক।

প্রথমে নিজেকে উচিত কর্মে নিযুক্ত কর। তখন যদি অন্যকে উপদে দাও তবে তুমি ক্লেশ প্রাপ্ত হবে না। যিনি ধর্ম আচরণ করেন তিনিই শিক্ষ হবার যোগ্য।

বজ্র যেমন অশ্মময় মণিকে মন্থন করে তেমনি আত্মকৃত পাপ এবং আত্মজা কুচিন্তা দুর্বুদ্ধিকে পীড়িত করে।

মালুয়া* লতা যেমন শালবৃক্ষকে বেষ্টিত করে দৌঃশীল্য তেমনি মানুষকে ্যা তথা বিপন্ন করে।

আত্মকৃত পাপ নিজেকেই সম্যক্ ক্লিষ্ট করে। আর পাপকর্ম থেকে বিরত কলে চিত্ত শুদ্ধ থাকে। প্রত্যেক্যের শুদ্ধি বা অশুদ্ধি পৃথক্। কেউ অন্যকে দ্ধ করতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেকে নিজেকেই শুদ্ধ করতে পারে।

কাউকে কর্কশ বাক্য বলো না। যাকে পরুষ বাক্য বল্‌বে সেও তোমার তি তদ্রূপ বাক্য প্রয়োগ করবে। দুর্বাক্য অতিশয় দুঃখদায়ক। দুর্বচন লেই দণ্ড পেতে হবে। যদি ফাটা কাঁসার মত তুমি নিঃশব্দ থাক, তুমি র্বাণ পাবে, তোমার সঙ্গে আর কারোর কলহ হবে না।

যেমন গোপাল গরুগুলিকে লাঠি দিয়ে তাড়া করে চারণ-মাঠে নিয়ে যায় তমনি জরা ও মৃত্যু প্রাণীবর্গের আয়ুক্ষয় করে মৃত্যু-মুখে টেনে নিয়ে চলেছে।

মূঢ় ব্যক্তি যখন পাপ করে তখন সে উহার কুফল বুঝতে পারে না। পরে র্মেধা অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তিবৎ স্বীয় পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়।

অলংকৃত থেকেও যে শান্ত, দান্ত, নিয়মতৎপর, ব্রহ্মচারী ও সর্বভূতে দণ্ডত্যাগী । সে-ই ব্রাহ্মণ, সে-ই শ্রমণ, সে-ই সন্ন্যাসী। মনুষ্যজন্ম দুর্লভ। মনুষ্য জীবন াপ্তি পরম সৌভাগ্য। সত্যধর্ম শ্রবণের সুযোগও বিরল। বুদ্ধগণের জন্মও র্লভ। যার বিজিত বিষয় আর কখনো অজিত হয় না, যার বিজিত গ-দ্বেষ-মোহাদি আর মাথা তুলতে পারে না, জালিনী বিষরূপী তৃষ্ণা যাঁকে াচলিত করতে পারে না, সেই অপদ অনন্তগোচর বোধি লাভই মানব জীবনের রম উৎকর্ষ।

যদি স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার বর্ষা হয় তথাপি মানুষের ভোগ-তৃষ্ণা তৃপ্ত হবে না। মস্ত ভোগ্য বস্তু অল্পাস্বাদ ও দুঃখদায়ক জেনে পণ্ডিত দেবভোগ্য বস্তুতেও রতি রেন না এবং বুদ্ধের শিষ্যের মত তৃষ্ণাক্ষয়ে সচেষ্ট হন।

প্রাণভয়ে মানুষ পর্বত, বন, উদ্যান, বৃক্ষ, চৈত্য ও দেবতাদির শরণাগত

*এই লতা যে গাছের উপর চড়ে বর্ষাকালে উহাকে জলের ভারে ভেঙ্গে ফেলে।

হয়। কিন্তু এই সব আশ্রয় উত্তম বা মঙ্গলদায়ক নয়। কারণ এই সব আশ্র মানুষ সর্বদুঃখ থেকে মুক্ত হয় না! কিন্তু যে সম্যক্ সম্বুদ্ধ, সত্যধর্ম ও ধর্মসংঘে শরণ নেয় সেই সর্বদুঃখ থেকে চির মুক্তি পায়।

শত্রুর মিত্র হবে। শত্রুদের মধ্যে মিত্রভাবে বিহার করে আমি কি সু জীবন যাপন করছি! আতুরকে অভয় দাও। আহা! আতুর মনুষ্যদে মধ্যে অনাতুর ভাবে বিচরণ করে আমি কি সুখে কালাতিপাত করছি উৎসুকদের মধ্যে অনুৎসুক হয়ে থাকবে। আহা! উৎসুকদের মধ্যে অনুৎসু থেকে আমি কি সুখে আছি! আমি নিঃসম্বল, কপর্দকশূন্য। আহা! সেইজ আমি পরম শান্তি পাচ্ছি! আমি ভাস্বর দেবতাদের মত প্রীতিভক্ষ্য হয়েছি।

ক্ষুধাই সর্বাপেক্ষা কঠিন রোগ। অসৎ সংস্কারই সর্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ ইহা অন্তরে অনুভব কর এবং নির্বাণের যথার্থ সুখলাভার্থ সচেষ্ট হও। কার নির্বাণেই পরম সুখ নিহিত।

বিবেক-রস ও শান্তি-সুধা পান করে মানুষ নির্ভয় হয়। আর সত্যধর্মে প্রীতি-রস পান করলে মানুষ নিষ্পাপ হয়।

সাধু পুরুষদের দর্শন শুভ। সাধুসঙ্গ সুখদায়ক। অসাধু মূঢ়ের অদর্শনে মানুষ সুখী হয়। অসাধুসঙ্গ দীর্ঘকাল শোকদায়ক। মূঢ়সঙ্গ শত্রুসঙ্গবৎ দুঃখদায়ক সুধীর পুরুষের সহবাস বন্ধুসঙ্গতুল্য সুখদায়ক। এইজন্য ধীর, প্রাজ্ঞ, বহুশ্রু উদ্যোগী, সুমেধ আর্য্য পুরুষের সেবা করা উচিত, যেমন চন্দ্রমা নক্ষত্র-পথে সেবা করে।

দেহকে চঞ্চলতা থেকে রক্ষা কর। দেহকে সংযত রাখ। দৈহি দুশ্চরিত ছেড়ে দৈহিক সুচরিত অনুষ্ঠান কর। বাক্যকে চঞ্চলতা থেকে রক্ষ কর। বাক্যে সংযত থাক। বাক্যের দুশ্চরিত ছেড়ে বাক্যের সুচরিত অনুশীলন কর। মনকে চঞ্চল হতে দিও না, মনকে সংযত রাখ। মানসিক দুশ্চরিত ছে মানসিক সুচরিত আচরণ কর।

প্রমাদী পরস্ত্রীগামী মানুষের এই সব পাপিকা গতি হয়—অপুণ্য লাভ পশ্বাদি যোনিতে জন্ম, অপবাদ, দুঃস্বপ্ন দর্শন এবং নরক ভোগ।

কুশের পাতা খুব ধারাল বলে কুশ ভাল করে না, ধরলে হাত কেটে যায়। তেমনি সন্ন্যাস জীবন ঠিক ঠিক যাপন না করলে নরকে গতি হয়।

যে কর্ম শিথিল, যে ব্রত ক্লিষ্ট, যে ব্রহ্মচর্য অশুদ্ধ তাহা মহাফল দান করে না। যদি সন্ন্যাসী হতে চাও তবে সুদৃঢ় পরাক্রমে সেই আদর্শ সাধনে নিযুক্ত হও। শিথিল সন্ন্যাসী সমাজে অধিক অকল্যাণ করে।

যেমন সীমান্ত নগর ভিতরে ও বাহিরে সুরক্ষিত হয় তেমনি জীবন-পুরকে যত্নে রক্ষা কর। ক্ষণমাত্র অসাবধান হলেই শত্রু প্রবেশ করবে। আদর্শানুরাগ ক্ষণমাত্র শিথিল হলে অধঃপতনের সম্ভাবনা।

অসংযমী দুরাচারী লোক দেশের অন্ন খেলে অগ্নিশিখার সমান অনিষ্টকারী হয়। সন্তপ্ত লৌহপিণ্ড এরূপ দুঃশীল ব্যক্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কারণ দুঃশীল ব্যক্তি অপেক্ষা লৌহপিণ্ডকে এড়িয়ে চলা সহজ।

যে কাজ করে বলে, আমি করিনি এবং যে অসত্যবাদী, এই দুই ব্যক্তি পরিহার্য। মৃত্যুর পর উভয়ের নিম্ন গতি হয়। বহু পাপী গলায় কাষায় বস্ত্র দিয়ে ধার্মিক সাজে। তারা যতই ধর্ম-চিহ্ন ধারণ করুক না কেন, স্বীয় পাপ-কার্যে তারা নীরয়গামী হয়।

সাধু লোক সুদূরে থাকলেও হিমালয় পর্বতের ধবল শিখরের ন্যায় তাঁকে বেশ দেখা যায়। আর অসাধু লোক কাছে থাকলেও রাত্রে ক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় তাকে দেখা যায় না।

যে মুমুক্ষু বা আদর্শনিষ্ঠ সে একাসন, একশয্য, একচর ও অতন্দ্রিত হয়ে আত্মজয়ে নিযুক্ত থাকে। সে আত্মজয়ের উদ্দেশে একক বনান্তে বিচরণ করে। কারণ নির্জন বাস ব্যতীত আত্ম-বিশ্লেষণ ও আত্মদমন অসম্ভব।

কষ্টপূর্ণ সন্ন্যাস অতিশয় দুষ্কর। দুরাবাস গৃহ দুঃখদায়ক। অপমানজনক সহবাস হানিকর। পথের মধ্যে থাকা দুঃখদায়ক। সুতরাং এই সকল দুঃখদায়ক অবস্থায় না পড়াই শ্রেয়।

যে শিষ্য গুরু, ধর্ম ও সংঘের স্মৃতি দিন-রাত বুকে ধরে থাকে সে-ই মুক্তিলাভের যোগ্য।

তৃষ্ণা, অহংকার, নিত্যতাবাদ, জড়বাদ এবং জ্ঞানের পঞ্চ আবরণ নষ্ট ব্রাহ্মণ নিষ্পাপ হয়ে যান।

যারা কর্তব্য অবহেলা করে ও অকর্তব্যে আকৃষ্ট হয় তাদের চিত্ত-ম বাড়তেই থাকে। ক্ষণভঙ্গুরতা ও মলিনতাদি দোষে দেহ দুষ্ট। এই স্মৃ যার মনে সদা জাগরিত থাকে সে কখনও অকর্তব্যে অগ্রসর হয় না। বরং কর্তব্যপালনে নিরন্তর যত্নশীল হয়। গুরুবাক্য ও শাস্ত্রোপদেশে যিনি স সচেতন থাকেন তাঁর চিত্তমল বিদূরিত হয়।

মনোযোগ থেকে ভূরি লাভ হয়, অমনোযোগ থেকে ভূরিক্ষয় হয়। লাভ ক্ষতির এই দুই পথ জেনে যে পথে ভূরিলাভ হয় সেই পথে থাক।

বন কাট, কিন্তু বৃক্ষ কেটো না। কারণ বন থেকেই 'ভয় হয়, বৃক্ষ থে নয়। বাসনার বন এবং ঝাড় কেটে নির্বাণ প্রাপ্ত হও। যাবৎ নারীর পুরু বা পুরুষের নারীতে অনুমাত্র কামনা অর্থগুিত থাকে তাবৎ সে সংসারে আব থাকে, যেমন দুগ্ধ-পোষ্য শিশু মাতার প্রতি আকৃষ্ট থাকে।

শরৎকালীন কুমুদের মত স্বহস্তে আত্মস্নেহকে উচ্ছিন্ন কর। সুগত-দেশি শান্তিমার্গ নির্বাণ আশ্রয় কর।

মূঢ় লোক ভাবে, যেখানে বর্ষাকালে থাকব সেখানেই হেমন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতু থাকব। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে একই স্থানে থাকার অন্তরায় সে বোঝে না।

পুত্রও পশ্বাদিতে যে আসক্ত তাকে মৃত্যু তেমনি গ্রাস করে, যেমন সু গ্রামকে মহাবন্যা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। পুত্র, পিতা বা বান্ধব কেউই মৃত্যু-মু থেকে কেড়ে নিতে পারে না। অন্তকের কবল থেকে জ্ঞাতিরাও র করতে সমর্থ হয় না। এই কথা জেনে বিবেকী ধর্ম-জীবনে অগ্রসর হ এবং ক্ষিপ্র গতিতে মুক্তিমার্গে বিচরণ করেন।

প্রমত্তচারী মানুষের তৃষ্ণা মালুয়া লতার ন্যায় বেড়ে যায়। বনে বান যেমন ফলের আশায় বৃথা এগাছ থেকে ওগাছে লাফ দেয় তেমনি তৃষ্ণাতু ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল হয়।

জন্ম থেকে বিষরূপী তৃষ্ণা যাকে আক্রমণ করে বর্দ্ধমান বীরণ ঘাসে

ত তার শোক বেড়েই চলে। আজন্মস্থায়ী দুরত্যয়া তৃষ্ণাকে যে ইহজীবনে রাস্ত করে তার শোক তেমনি বিদূরিত হয়, যেমন পদ্মপত্র থেকে জলবিন্দু ড়ে যায়।

যারা ধর্মপথে চল্‌ছে তাদের মঙ্গল হোক। উষীরার্থী যেমন বীরণ তৃণের ন খুঁড়ে তুলে তেমনি তোমরা তৃষ্ণামুল উৎপাটিত কর। তৃষ্ণাক্ষয় না হলে স্তি লাভ হয় না।

যেমন বৃক্ষ-মূল উত্তমরূপে কর্তিত না হলে বৃক্ষ আবার বেঁচে উঠে তেমনি ষ্ণা-মূল নিঃশেষে সংচ্ছিন্ন না হলে পুনরায় দুঃখ দেয়।

ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের স্রোত চার দিকে প্রবাহিত হয়। ইহার ফলে তৃষ্ণারূপী তা অঙ্কুরিত হয়। এই জাত লতাকে ভাল করে জেনে প্রজ্ঞারূপ অসি রা উহার মূল ছিন্ন কর।

তৃষ্ণা-নদীর স্নিগ্ধ ও শীতল সলিল বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে ক্ষণিক সুখ দেয়। ই জন্যই মানুষ ইহার স্রোতে আবদ্ধ হয়, সুখের সন্ধান করে ও জন্ম-জরার দে পড়ে।

তৃষ্ণাবদ্ধ মানুষ বদ্ধ খরগোসের মত ঘুরে বেড়ায় এবং মায়াজালে পড়ে র্ঘকাল দুঃখ ভোগে। সেইজন্য ধার্মিক ব্যক্তিগণের উচিত, বৈরাগ্য অবলম্বন র্বক তৃষ্ণা পরিহার করা। নির্বাণার্থী পুরুষ তৃষ্ণামুক্ত হয়। কিন্তু নির্বাণার্থী দি তৃষ্ণাত্যাগ না করে সে বন্ধনমুক্ত ব্যক্তির ন্যায় বন্ধনই খোঁজে।

লৌহশৃঙ্খল বা কাষ্ঠময় বন্ধন বা দড়ির বন্ধন শক্ত নয়। বুদ্ধিমান্‌গণ বলেন, ণিকুণ্ডল ও পুত্রদারাদির বন্ধন সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ও দুশ্ছেদ্য। এইজন্য এই য়াবন্ধন ছিন্ন করে. ভোগসুখ ছেড়ে শান্তিকামী ধর্মপথে বিচরণ করে।

মাকড়সা যেমন আপনার জালে আপনি পড়ে তেমনি তৃষ্ণাসক্ত ব্যক্তি খাত সলিলে ডুবে মরে। সেইজন্য ধীর পুরুষ তৃষ্ণার স্রোত রুদ্ধ করে ঃখাতীত হন।

যে সংশয়কে শান্ত করতে চেষ্টিত হয় অশুভ বিষয়ে সতর্ক থাকে সে ারের বন্ধন ছিন্ন করে ও মায়াতীত হয়।

যে তৃষ্ণামুক্ত, মলরহিত, পাপবর্জিত ও অসন্ত্রস্ত সে সমস্ত ভব-শল্য উৎপা[টন] করে। ইহাই তাহার শেষ জন্ম।

'যে তৃষ্ণামুক্ত, পরিগ্রহরহিত, ভাষাবিৎ ও কাব্যজ্ঞ এবং বর্ণমালার পূর্বা[পর] সন্নিপাত জানে সে নিশ্চয়ই অন্তিম শরীরধারী ও মহাপ্রাজ্ঞ।

ধর্মদান সর্বদানকে জয় করে। সর্ব রস ধর্ম-রসকে জয় করে, সর্বর[তি] ধর্মরতিকে জয় করে, তৃষ্ণাক্ষয় সর্বদুঃখকে জয় করে।

ভবসংসারের পারে যাবার জন্য যে সুবুদ্ধি যত্নশীল না হয় তাকে ভোগই [নষ্ট] করে। ভোগের তৃষ্ণায় পড়ে সেই দুর্মতি পরের মত নিজেই নিজের অনিষ্ট ক[রে]।

ক্ষেত্রের দোষ ঘাস, মানুষের দোষ আসক্তি। সেইজন্য অনাস[ক্ত] বৈরাগ্যবান পুরুষকে দান করলে মহাপুণ্য হয়।

যে সাধু ধর্মারাম, ধর্মরত, ধর্মসাধক ও ধর্মদাতা সে কখনো সদ্ধর্ম থে[কে] বিচ্যুত হয় না।

স্বীয় লাভকে অবহেলা করা উচিত নয়। অন্যের লাভকে স্পৃহা ক[রা] কর্তব্য নয়। যে ভিক্ষু অন্যের লাভ আকাঙ্ক্ষা করে সে সমাধিপ্রাপ্ত [হয়] না। স্বীয় লাভ অল্প হলেও তাহা উপেক্ষা করা অনুচিত। যে সদা পারমা[র্থিক] কল্যাণে একনিষ্ঠ থাকে সে দেবতাদেরও প্রশংসনীয় এবং প্রণম্য। যার জীবি[কা] বিশুদ্ধ ও যার আলস্য তিরোহিত সে-ই নির্বাণ লাভের যোগ্য।

যে সাধু মৈত্রী ভাবনা করে তিনি বুদ্ধের উপদেশে শ্রদ্ধাবান্ থাকেন। সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে প্রশান্ত সুখময় বোধি-পদ প্রাপ্ত হয়। হে সাধু, তোম[ার] নৌকার জল সেচন করে দূরে ফেল। তাহলে উহা লঘু হয়ে যা[বে]। আমাদের জীবনতরী রোগদ্বেষরূপ জলে পরিপূর্ণ। রোগদ্বেষমুক্ত না হ[লে] নির্বাণ লাভ হয় না।

প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির ধ্যান হয় না, আর ধ্যানহীন ব্যক্তির প্রজ্ঞা হয় ন[া]। যে ধ্যান ও প্রজ্ঞা উভয়ে আরূঢ় থাকে সে-ই নির্বাণপ্রাপ্ত হয়!

সর্ববস্তু অনাত্মা, অনিত্য। যখন প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে মানুষ ইহা বুঝতে পা[রে] তখন তার দুঃখান্ত হয়। ইহাই বিশুদ্ধি মার্গ।

যে উদ্যোগের সময় উদ্যোগী হয় না, যে যুবা বলিষ্ঠ হয়েও আলস্যযুক্ত হয়, মনের সঙ্কল্প ত্যাগ করে এবং যে দীর্ঘসূত্রী সে প্রজ্ঞা-মার্গের পথিক হতে :র না।

যে স্ববাক্য রক্ষা করে, মনে সুসংস্কৃত থাকে, এবং কায়ে অকুশল কর্ম করে না এইরূপ তিনটি কর্মপদ বিশুদ্ধ রাখে সে ঋষি-প্রদর্শিত মার্গ সেবনে সমর্থ হয়।

হে প্রাণিহিংসা করে সে আর্য্য হয় না। যে সর্বপ্রাণীর প্রতি অহিংসা ও ংসা রক্ষা করে সে-ই আর্য্য।

কেবল শীল ও ব্রত দ্বারা বা দীর্ঘ ধ্যান দ্বারা বা নির্জন শয়ন দ্বারা নৈষ্কর্ম্য- অনুভূত হয় না। যতক্ষণ না চিত্তমল ক্ষয় হয় ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হইও না।

অবিদ্বান্ ও বিমূঢ় মৌন থাকলে মুনি হয় না। যে পণ্ডিত তুলাদণ্ডের ভারী বস্তু গ্রহণ করে এবং পাপকর্ম ত্যাগ করে সে-ই মুনি হয়। এই ায়েই মুনি হওয়া যায়, অন্য উপায়ে নয়। যে ব্রতচ্যুত ও মিথ্যাভাষী সে ুণ্ডমস্তক হলেও সাধু হয় না। যার চিত্ত বাসনা-বহুল সে কি করে সাধু ব?

যার পাপরাশি শমিত সে-ই শ্রমণ হয়, সাধু হয়। অন্যের কাছে গিয়ে ক্ষা করলেই কেউ ভিক্ষু হয় না। যে দুনিয়ার অসৎ কার্য অনুষ্ঠান করে ভিক্ষু হয় না।

যে ঈর্ষালু, মৎসর ও শঠ সে সুবক্তা ও সুদর্শন ব্যক্তি হলেও সাধু হয় না। দোষমুক্ত, মেধাবী ও সৎকর্মপরায়ণ এবং যার অজ্ঞান সমুচ্ছিন্ন সে-ই কৃত সাধু।

শুধু পলিতকেশ ও বয়োবৃদ্ধ হলে স্থবির হয় না, জ্ঞানী হয় না। জ্ঞানবৃদ্ধ হলে বৃদ্ধেরও বার্ধক্য ব্যর্থ হয়।

যে অশ্রদ্ধা এবং অপ্রসন্নতা সহকারে দান করে এবং অন্যে সুখী হলে সে সন্তুষ্ট হয় সে সমাধি লাভ করতে পারে না। কিন্তু যে অপ্রীতি ও অহিংসার ণাচ্ছেদ করে এবং করুণা ও মৈত্রীতে হৃদয় পূর্ণ রাখে সে-ই সমাধি লাভের াগ্য।

যে পূর্বে ভুল করেও পরে আর ভুল করে না সে মেঘ-মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় প্রকাশিত হয়। যে স্বকৃত পাপ স্বকৃত পুণ্যের দ্বারা আবৃত করে সে মেঘমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় সমুজ্জ্বল থাকে।

যেমন লোকে বুদ্‌বুদকে বা মরীচিকাকে দেখে তেমনি যে ইহলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাকে মৃত্যুরাজ ভয় দেখাতে পারে না।

এস, বিচিত্র রাজপথের মত এই জগৎকে দেখ। এই সুদৃশ্য জগৎ লোকে মূঢ় এতে আসক্ত হয়, কিন্তু জ্ঞানী এতে অনাসক্ত থাকে।

যেমন মালী মর্দিত পুষ্পকে চয়ন করে না, হে ভিক্ষুগণ, তেমনি তোমরা রাগদ্বেষ ত্যাগ কর। যারা বুদ্ধবাক্যে পরিতৃপ্ত তারা অনিত্য বস্তু ত্যাগ করে সুখময় শান্ত পদ প্রাপ্ত হয়। যে যৌবনে বুদ্ধ-বাণী বরণ করে ও তৎপালনে অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গ করে সে মেঘমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় ইহলোকে ধর্মালোক বিতরণ করে।

পরিশিষ্ট

এক

গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম*

স্বামী বিবেকানন্দ

বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মের পূর্ণ পরিণতি। বৌদ্ধগণ গৌতম বুদ্ধকে ঠিক চিনতে রন নি! ইহুদি ধর্ম ও ঈশাহি ধর্মের মধ্যে যে পার্থক্য তাহাই প্রাচীন ক ধর্ম ও আধুনিক বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে বিদ্যমান। জিশুখ্রীষ্ট ছিলেন ইহুদি, শাক্য মুনি ছিলেন হিন্দু। ইহুদিরা জিশু খ্রীষ্টকে পরিত্যাগ করেছিল, তাই নয়, তাঁকে ক্রুশবিদ্ধও করেছিল। কিন্তু হিন্দুরা শাক্যমুনিকে গ্রহণ বতাররূপে পূজা করছে।

শাক্যমুনি নূতন কিছুই প্রচার করেন নি। তিনি পূর্ণ করতে এসেছিলেন, করতে আসেন নি। শাক্যমুনি স্বয়ং সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁর এই মহিমা তাঁর বিশাল প্রাণতার বলে তিনি গুপ্ত বেদ থেকে তত্ত্বগুলি বার করে বিশ্বে ছড়িয়ে দিলেন। তিনিই জগতে প্রথম গুরু, যিনি ধর্মপ্রচার আরম্ভ লন। শুধু তাই নয়, তিনি সর্বপ্রথম ধর্মান্তরিতকরণ পরিকল্পনা করেন।

তথাগতের মহামহিমা এই ছিল যে, সকলের জন্য, বিশেষতঃ অজ্ঞ ও দ্রদের জন্য, তাঁর অদ্ভুত সমবেদনা ছিল। তাঁর কতকগুলি শিষ্য ব্রাহ্মণ ন। তিনি যখন ধর্মশিক্ষা দিতেছিলেন তখন সংস্কৃত কথ্যভাষা ছিল না। শুধু পণ্ডিতদের পুস্তকে লিপিবদ্ধ থাকত। তাই তিনি প্রাদেশিক ভাষায় উপদেশ দিলেন। তাঁহার কয়েকটি ব্রাহ্মণ শিষ্য তাঁর উপদেশ তে অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবে বললেন, "আমি

---

*স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী থেকে সংগৃহীত।

গরীবদের জন্য, সর্বসাধারণের জন্য। আমাকে জনগণের ভাষায় ব
বলতে দাও।"

দার্শনিক দিক থেকে গৌতম বুদ্ধের শিষ্যগণ বেদের সনাতন ভিত্তির বিরু
যুদ্ধ ঘোষণা করলেন; কিন্তু তা ভাঙ্গতে পারলেন না। অন্য দিকে তাঁরা
থেকে শাশ্বত ঈশ্বর তুলে ফেলে দিলেন। সেই ঈশ্বরকে প্রত্যেক হিন্দু নরন
প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে। তার ফল এই হল যে, বৌদ্ধধর্ম ভারতে স্বাভা
ভাবে মৃত হল।

কিন্তু একই সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বৌদ্ধধর্মের নির্বাসনে অনেক কিছু হারাল
সেই সংস্কার-স্পৃহা, সেই অদ্ভুত সমবেদনা ও সম্প্রীতি, সেই অমূল্য সম্পদ,
বৌদ্ধধর্ম জনসাধারণের মধ্যে এনেছিল। ইহা ভারতীয় সমাজকে এত উ
ও মহান্ করেছিল যে, গ্রীসীয় ঐতিহাসিক তৎকালীন ভারত সম্বন্ধে লিখ
গিয়ে বলেছিলেন, "কোন হিন্দুকে অসত্য বলতে জানা যায়নি, কোন হিন্দু
অসতী বলে শোনা যায়নি।"

হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্ম ছাড়া বাঁচতে পারে না. আর বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম ছাড়া থাক
পারে না। ব্রাহ্মণদের মস্তিষ্ক ও দর্শন ব্যতীত বৌদ্ধগণ দাঁড়াতে পারে না।
ব্রাহ্মণগণও বৌদ্ধদের হৃদয়বত্তা ব্যতীত চলতে পারে না। ব্রাহ্মণগণ
বৌদ্ধগণের মধ্যে বিচ্ছেদই ভারতের পতনের কারণ। আমাদের ক
ব্রাহ্মণের অদ্ভুত মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধের বিশাল হৃদয় সংযুক্ত করে অপূর্ব মানব
করা।

গৌতম বুদ্ধের মত নৈতিক মানুষকে আমি দেখতে চাই, যিনি সা
ঈশ্বরে বা জীবাত্মায় বিশ্বাসী নন এবং সে বিষয়ে কখনো প্রশ্ন করেননি;
তিনি সম্পূর্ণ সন্দেহবাদী ছিলেন। তথাপি তিনি প্রত্যেকের জন্য প্রাণ দি
প্রস্তুত ছিলেন, সারা জীবন জগদ্ধিতায় কাজ করে ছিলেন এবং অপ
কল্যাণের চিন্তায় অভিভূত ছিলেন। তাঁর জীবনী-লেখক তাঁর জন্ম-ব
করতে গিয়ে ঠিকই বলেছেন যে, বহুজনসুখায় বহুজনহিতায় তিনি জন্মেছিলে
তিনি স্বীয় মুক্তির জন্য ধ্যান করতে বসে যাননি। তিনি অনুভব করে

গগৎ দুঃখের আগুনে জ্বলছে এবং ইহার প্রতিকারের একটা উপায় তিনি
ান করবেন। তাঁর সমগ্র জীবনে এই একই প্রশ্ন প্রভাব বিস্তার
ছিল, জগতে এত দুঃখ কেন? তোমরা কি মনে কর, আমরা বুদ্ধের
নীতিনিষ্ঠ ও সমুদার হয়েছি?

যে ধর্ম-বন্যা ভারতকে সহস্র বৎসর ধরে প্লাবিত করেছিল তার শীর্ষদেশে
রা আর এক মহাপুরুষ গৌতম শাক্যমুনিকে দেখতে পাই। তিনি
ম কর্মযোগী ছিলেন। নৈতিকতার এমন সাহসী প্রচারক জগৎ আর
দেখে নাই। যেন একই কৃষ্ণ নিজেই নিজের শিষ্যরূপে দেখাতে এলেন,
পে তাঁর বাণী জীবনে কার্যকরী করতে হয়।

বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিনাশক ছিলেন না। বৌদ্ধধর্ম ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম
তপূজা সৃষ্টি করেছিল।

বুদ্ধ ছিলেন ধর্মজগতের ওয়াশিংটন। ওয়াশিংটন যেমন মার্কিন জাতিকে
াসন দিয়ে গেছেন তেমনি বুদ্ধ একটি সিংহাসন অধিকার করলেন শুধু
কে দেবার জন্য। তিনি নিজের জন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেননি।

বুদ্ধ ছিলেন মহাবৈদান্তিক; কারণ প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধধর্ম বেদান্তের শাখা
প্রশাখা মাত্র। সেইজন্য শঙ্করকে প্রায়ই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হয়। বুদ্ধ
লন বিশ্লেষণ এবং শঙ্কর তা থেকে সমন্বয় করলেন।

বুদ্ধ বেদ, বর্ণ, পুরোহিত বা প্রথা কোন কিছুর নিকট মাথা নোয়াননি।
র যুক্তি নিয়ে যেতে পারে ততদূর তিনি নির্ভয়ে যুক্তি চালালেন। এরূপ
ক যুক্তিবাদী সত্য-সন্ধানী, এরূপ প্রাণীপ্রেমিক জগতে আর আসেননি।

বুদ্ধের হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত কর। এমনকি, একটি ছাগশিশুর
রক্ষার্থ তিনি স্বীয় জীবনদানে সদা প্রস্তুত! বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়
নদানের কথা আর কি বলব! দেখ, তাঁর কি বিশালপ্রাণতা, কি অসীম
ণা!

কেবল নিষ্কাম কর্মের দ্বারাই সেই পথ লাভ করা যায়, যা গৌতম বুদ্ধ
নিতঃ ধ্যানের দ্বারা বা যীশুখ্রীষ্ট প্রার্থনার দ্বারা পেয়েছিলেন। বুদ্ধ ছিলেন

জ্ঞানী, আর খ্রীষ্ট ছিলেন ভক্ত। কিন্তু উভয়ে ভিন্ন পথে একই লক্ষ্যে পৌঁছেছিলেন।

দুঃখভাক্ জগৎকে সাহায্য করাই যে মস্ত বড় কাজ, তাতে বুদ্ধই সর্বপ্র অধিক মূল্য দিলেন। ধর্মের অন্যান্য দিক তিনি কিছু কালের জন্য একেব বাদ দিয়ে দিলেন। স্বার্থপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে আঁকড়ে ধরার অসারতারূপ মহা উপলব্ধি করবার জন্য তাঁকে ছয় বৎসর কঠোর তপস্যা করতে হয়েছি তাঁর চেয়ে নিঃস্বার্থ অক্লান্ত কর্মী আমাদের প্রিয়তম কল্পনারও অতীত।

বুদ্ধ কোন ঈশ্বর প্রচার করেননি, তিনি আত্মত্যাগ ব্যতীত কিছুই প্র করেননি। সেইজন্য গোঁড়া খ্রীষ্টানরাও এডুইন আর্ণল্ডের 'লাইট অফ্ এশি পড়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়। কারণ নিঃস্বার্থপরতাই ঈশ্বরত্ব।

বুদ্ধবাণী শোন। কি অদ্ভুত বাণী। তাঁর বাণী আমাদের হৃদয় অধি করে। বুদ্ধ বলেন, "সমস্ত স্বার্থপরতা পরিহার কর। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হ তাহলে আত্মজয়ে সমর্থ হবে। জগজ্জয়ের চেয়ে আত্মজয় বড়।"

গৌতম বুদ্ধের জীবনে আমরা সর্বদা লক্ষ্য করি যে, তিনি বলছেন, 'অ পঞ্চবিংশ বুদ্ধ।' তাঁর পূর্বে চব্বিশ জন বুদ্ধ এসেছিলেন। কিন্তু তাঁরা ইতিহ অজ্ঞাত। ইতিহাসে সুবিদিত বুদ্ধ পূর্ববর্তী চব্বিশ জন বুদ্ধের ভিত্তির উ দাঁড়িয়েছিলেন।

জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা অজ্ঞাত থেকেই চলে গেছেন। যে মহত্তম পুরুষ সম্বন্ধে জগৎ কিছুই জানে না তাদের তুলনায় যে ঐতিহাসিক কৃষ্ণগণ, বুদ্ধ ও খ্রীষ্টগণকে আমরা জানি তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাপুরুষ। প্রত্যেক দে শত শত অজ্ঞাত মহাবীর নীরবে কাজ করে জগতে কোন দাগ না রেখে গেছেন। নীরবে তাঁরা থাকেন, নিরবেই কাজ করেন এবং কালে তাঁ ভাবরাশি বুদ্ধগণ বা খ্রীষ্টগণের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁরাই আমাদের নি বিদিত হন।

কর্মযোগের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ গৌতম বুদ্ধ। গৌতম বুদ্ধ ব্যতীত জগ অন্যান্য আচার্য্যগণ নিঃস্বার্থ কর্মে প্রবৃত্ত হবার জন্য বাহ্য মতলব রেখেছিলেন।

যে নাম-যশাদির আকাঙ্ক্ষা না রেখে নিঃস্বার্থভাবে মানবসেবা করে সে কালে হয় এবং তাঁর মধ্যে এমন শক্তি আসে, যা পৃথিবীতে যুগান্তর আনে।

বুদ্ধ নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন, "আকাশবৎ অনাদি অনন্ত বোধির নামই। আমি গৌতম সেই বুদ্ধাবস্থা লাভ করেছি। সাধনার দ্বারা তোমরাও বুদ্ধত্ব লাভ করতে পার।" আহা! যদি বুদ্ধ-হৃদয়ের এক কণাও আমার ত। তিনি নাস্তিক ছিলেন, কি আস্তিক ছিলেন তাতে কিছু যায় আসে তাঁর জীবন প্রমাণিত করে, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, যার কোন নিক মতবাদ নেই, যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নয়, যে কোন মন্দিরে বা গীর্জায় না এবং স্বীকৃত জড়বাদী সেও মহাবোধির, পরা প্রজ্ঞার অধিকারী পাবে।

বুদ্ধ ছিলেন হিন্দুধর্মের সংস্কারক। ভাল হতে ও ইন্দ্রিয় দমন করতে তিনি মাদিগকে বেত মেরে শিক্ষা দিলেন। জিতেন্দ্রিয় ও সৎস্বভাব হলে বোঝা দ্বৈতবাদ সত্য, কি অদ্বৈতবাদ; এক সত্য, কি বহু।

বুদ্ধ তাঁর প্রথম উপদেশে বলেছেন, "তোমরা নিজেদের দোষেই দুঃখ ভুগছ। তোমাদিগকে দুঃখ ভুগতে বাধ্য করছে না। তুমি যে জন্মাচ্ছ ও মরছ এবং চক্রে ঘূর্ণিত হচ্ছ এবং জীবনের দুঃখকে দ্বেষ করছ এবং সুখকে কামনা ছ এবং উহার চক্র-বেষ্টনীরূপ অশ্রুজল ফেলছ এবং উহার শূন্যতারূপ নাভিতে হচ্ছ এর জন্য দায়ী কেবল তুমিই।

বেদান্তনীতিকে কার্যে পরিণত করবার জন্য বুদ্ধের আবির্ভাব। তিনি সমস্ত ষ সুবিধা চুরমার করে দিলেন। তিনি আভিজাত্য, সুবিধাবাদ ধ্বংস করে বাদ প্রচার করলেন। সাম্যবাদ প্রচার সত্ত্বেও বৌদ্ধ সংঘে বৈষম্য ছিল। মহাযান বৌদ্ধগণ আস্তিক ছিলেন; কিন্তু হীনযানবাদীরা নাস্তিক লেন। যদি বৌদ্ধরা ঈশ্বরে বা আত্মায় বিশ্বাস না করে তবে কিরূপে তাদের ইন্দ্রিয়াতীত নির্বাণাবস্থা থেকে উৎপন্ন হয়? তারাও সেজন্য এই সনাতন তিক নিয়ম বা ধর্ম মানতে বাধ্য হয়েছে। সেই নৈতিক নিয়ম হিন্দু অর্থে দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়। বুদ্ধ সেই নিয়ম প্রত্যক্ষ করলেন, আবিষ্কার করলেন।

নির্বাণ তুরীয় ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থা। বোধিবৃক্ষতলে সমাধিমগ্ন অবস্থায় বুদ্ধদে সাধারণতঃ চিত্রিত হন। ইন্দ্রিয়-মনাতীত অবস্থায় গিয়ে সদ্ধর্ম তিনি প্রত্য করলেন, শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তিবিচার দিয়ে নয়।

বুদ্ধ পরিপক্ক বৃদ্ধাবস্থায় মারা যান। আমার এক মার্কিণ বৈজ্ঞানিক বন্ধ কথা মনে পড়ছে, যিনি বুদ্ধের জীবনী পড়তে খুব ভালবাসতেন। তিনি বুদ্ধে মৃত্যু পছন্দ করতেন না ; কারণ তিনি খ্রীষ্টবৎ ক্রুশবিদ্ধ হননি! কি ভ্রান্ত ধারণা মহৎ হতে হলেই ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে—এরূপ ধারণা ভারতে কখনো প্রভ বিস্তার করেনি। এই মহাবুদ্ধ সমগ্র মহাভারতে ভ্রমণ করেছিলেন সম দেবদেবীকে এবং এমন কি জগতের ঈশ্বরকে নির্বাসন দিয়ে। তথাপি তি প্রবৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তিনি আশী বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এ অর্ধ দেশ সদ্ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন।

একমাত্র সে-ই ধার্মিক হতে পারে, যে সাহস করে বলে, যা শক্তিশালী ব একদা বোধিবৃক্ষতলে বলেছিলেন, 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং' ইত্যাদি।

বুদ্ধই বেদান্তকে অরণ্য থেকে সমাজে নিয়ে এলেন এবং জনসাধারণের মে প্রচার করলেন। তাই সমগ্র দেশ বৌদ্ধ হয়ে গেল।

বেদান্তের নীতি-অংশের উপর বুদ্ধ বেশী জোর দিলেন ; আর শঙ্কর দার্শনি অংশ সমৃদ্ধ করলেন। বুদ্ধ বেদান্তকে দিবালোকে এনে সমাজে প্রচার পূর্ব ভারতকে রক্ষা করলেন। কিন্তু হাজার বছর পরে তাঁর ধর্ম ভারতে বিকৃ হয়ে গেল। সেজন্য শঙ্করের আবির্ভাব প্রয়োজন হল।

মহাবুদ্ধ দ্বৈতবাদীদের ঈশ্বরে বিশ্বাসী হলেন না। তাই তাঁকে নাস্তিক জড়বাদী বলা হয়। কিন্তু তত্রাপি তিনি একটি ছাগ শিশুর জন্য আত্মব দিতে প্রস্তুত ছিলেন! সেই মহামানব যে সর্বোচ্চ নৈতিক ভাবরাশি সমা গতিশীল করলেন তা অন্য দেশে হয়নি। জগতের যে যে স্থানে কোন নীতিরা দৃষ্ট হয় তাহা এই মহামানবের জ্ঞান-সূর্য থেকে বিকীর্ণ।

বুদ্ধবাণীতে আছে, কিরূপে তিনি উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে, উর্ধে, নি মৈত্রী ভাবধারা প্রেরণ করেছেন, যতক্ষণ না সমগ্র বিশ্ব এই মৈত্রীতে পরিপ

র। সেই মৈত্রী কি অদ্ভুত, কি অসীম! যখন তোমার হৃদয় সেই মৈত্রী
বে পূর্ণ হবে তখন তোমার আসল ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠবে।

বুদ্ধ কয়েকটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। যখন
হ্মণরা ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হলেন তখন বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন,
াপনারা কেউ কি ব্রহ্ম দেখেছেন?' ব্রাহ্মণরা উত্তর দিলেন, 'না'। বুদ্ধ—
াপনাদের পিতারা? উত্তর—না, তাঁরাও না। প্রশ্ন—কিম্বা আপনাদের
মহরা? উত্তর—না, সম্ভবতঃ তাঁরাও দেখেননি। তখন বুদ্ধ তাঁদের
ন, 'যাকে আপনারা বা আপনাদের পিতারা বা পিতামহরা দেখেননি তাঁর
নির্ধারণে আপনারা এত ব্যস্ত কেন?' সমগ্র ধর্ম জগতে এই ব্যাপারই
।

াদি বৌদ্ধগণ প্রাণীহত্যার বিরুদ্ধে ক্রোধে বৈদিক যজ্ঞাদি নিন্দা করলেন।
তখন প্রত্যেক গৃহে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হত এবং পশুবলিও চলত। যখন
 উঠে গেল তখন তার স্থানে বড বড মন্দির, মূর্তি ও উৎসব সৃষ্ট হল।
নক কালে ভারতে আমরা সেই সবই দেখতে পাচ্ছি।

বকৃত বৌদ্ধধর্ম ভারতে যে নারকীয় দৃশ্য সৃষ্টি করেছিল তা অভূতপূর্ব।
ম অনুষ্ঠান ও অশ্লীল গ্রন্থ, যা মানুষের হাতে সম্ভব বা মানুষের মাথায়
ত পারে বা সর্বাপেক্ষা পাশবিক কার্য, তা ধর্মের নামে চলতে লাগল। তাই
আবির্ভূত হয়ে বৌদ্ধ যুগের অধঃপতন থেকে ভারতকে রক্ষা করবার জন্য
স্ত প্রচার করলেন।

জনসাধারণকে সংস্কৃত ভাষা পড়তে নিষেধ করে বুদ্ধদেব মহাভুল করে
ন। তিনি দ্রুত ও শীঘ্র ফল লাভের আশায় কথ্য ভাষা পালিতে ধর্ম প্রচার
লন। তা সত্যই অদ্ভুত। তিনি কথ্য ভাষায় উপদেশ দিলেন বলেই
ধারণ তাঁকে বুঝতে পারল। তার ফলে ভাবরাশি ক্ষিপ্র বেগে দেশের
কে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু তার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা প্রচার করাও
ছিল।

ষ্কামভাবে কাজ করার ভাব সর্বাপেক্ষা বেশী সমৃদ্ধ হয়েছে বৌদ্ধধর্মে।

প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের একটি সম্প্রদায়। তৎকালীন জটিল ধর্মানুষ্ঠান জাতিভেদ এবং বৃথা দার্শনিক বিচারে তিনি বিরক্ত হয়ে ধর্মের নৈতিক অংশের উপর বেশী জোর দিলেন। ভাল হও এবং ভাল কর, এই হল তার মর্ম ব ণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি নীরব থাকতেন। সেজন্য তাঁকে সম্পূর্ণ সন্দেহবাদী বলা হয়। তিনি মৃত্যুকালে বলেছিলেন; 'মানুষ নিজে নিজের উদ্ধারক। তার অন্য কেউ উদ্ধারক নেই। কি অভয় বাণী।

ভারত এখনো বুদ্ধের ভাবরাশি মজ্জাগত করতে পারেনি। সে বুদ্ধের ব শুনে সম্মোহিত হয়েছে; কিন্তু সেই বাণীকে জীবনে কাযকরী করতে পারেনি।

ভগবান্ বুদ্ধ ছিলেন সবশ্রেষ্ঠ মানব, অদ্ভুত সংঘস্রষ্টা। তিনি পৃথিবী তাঁর ভাবরাশি দ্বারা প্লাবিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ধর্ম ছিল ভিক্ষুধর্ম। ফলে ভারতের সর্বত্র আজ ভিক্ষুবেশ সমাদৃত হয়। তিনিই সবপ্রথম সংঘ জী প্রবর্তিত করলেন। কিন্তু তার সংঘে ভিক্ষুণী অপেক্ষা ভিক্ষুর আধিপত্য অ ছিল। তাই পরবর্তী যুগে ভারতীয় সমাজে পুরুষের কাছে নারী নি প্রতিপন্ন হল। সেই কুফল আমরা এখনো এড়াতে পারিনি।

বুদ্ধ ছিলেন বেদান্তিক সন্ন্যাসী। তিনি একটি নূতন সম্প্রদায় স্থ করলেন, ঠিক যেমন অনেকে এখন করছেন। যে ভাবরাশিকে বৌদ্ধধর্ম বলা হয় তাহা তাঁর নিজস্ব নয়। সেগুলি আরও প্রাচীন। সেই ভাবরাশিকে শক্তিশালী করলেন, কার্যকারী করলেন। সাম সাম্যই বুদ্ধের অসামান্য অবদান।

আধুনিক হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম একই বৃক্ষের দুই শাখা মাত্র। বৌ যখন অধঃপতিত হল তখন শঙ্কর আবির্ভূত হয়ে বৈদিক ধর্ম পুনঃ প্র করেন। লোকে বলে, বুদ্ধ বেদ অগ্রাহ্য করেন। কারণ বেদে পশুহ বিহিত। বৌদ্ধধর্মের প্রত্যেক গ্রন্থে বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ যায়। কিন্তু বোধ হয়, বৈদিক ধর্মের প্রতিবাদে তাঁর অধিকার ছিল স্পষ্টতঃ বুদ্ধ সন্দেহবাদী ছিলেন।

তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ বলেন, "ভগবান্ বুদ্ধ ছিলেন বামাচারী। 'প্রজ্ঞাপারমি

তত্ত্বগাথা' প্রভৃতি বহু সুন্দর উপদেশের কদর্থ তাঁরা করে থাকেন। ইহার ফলে বৌদ্ধগণ দুই দলে বিভক্ত। ব্রহ্মদেশীয় ও সিংহলী বৌদ্ধগণ সাধারণতঃ তন্ত্র বর্জন করেছেন এবং তৎসঙ্গে হিন্দু দেবদেবীগণকে নির্বাসন দিয়েছেন। মহাযান বৌদ্ধগণ যে অমিতাভ বুদ্ধকে এত শ্রদ্ধা করেন হীনযানীরা তাঁকেও ত্যাগ করেছেন। ইহার অর্থ এই যে, অমিতাভ বুদ্ধ প্রভৃতি যে সমস্ত দেবতাকে মহাযানীরা পূজা করেন তাঁরা 'প্রজ্ঞাপারমিতা' গ্রন্থে উল্লিখিত নেই। কিন্তু উহাতে অন্যান্য বৌদ্ধ দেবদেবী পূজার্থ প্রশংসিত। হীনযানীরা তাদের শাস্ত্র-বাণী অগ্রাহ্য করে দেবদেবীগণকে বাদ দিয়েছেন। বৌদ্ধ ধর্মের যে অংশ ঘোষণা করে সবই পরার্থে এবং যাহা সমগ্র তিব্বতে প্রচারিত তাহা আধুনিক ইউরোপকে প্রভাবান্বিত করেছে। যে ধর্ম উপনিষদে আবদ্ধ এবং বিশিষ্ট বর্ণের নিকট উন্মুক্ত ছিল তাহাই বুদ্ধ সর্বসাধারণের জন্য প্রচার করলেন। অতুলনীয় সমবেদনাই ছিল তাঁর মহত্ত্ব। য ধ্যান বা সমাধির কথা বৌদ্ধ শাস্ত্রে এত আলোচিত তাহা পূর্ব থেকে বদেই ছিল। যে মস্তিষ্ক ও হৃদয় বৈদিক যুগে দেখা যায়নি তাহা বুদ্ধের মধ্যে পাওয়া গেল। হৃদয়বত্তার এইরূপ দৃষ্টান্ত সমগ্র বিশ্বেতিহাসে অদৃষ্টপূর্ব। বৈদিক ধর্ম, ইহুদি ধর্ম এবং অন্যান্য ধর্মে যজ্ঞাদি বাহ্য অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি বিহিত ছিল। বুদ্ধই প্রথম এর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। কিন্তু সারাংশ পূর্ববৎই রইল। তিনি বেদের পবিত্রতে হতে বিশ্বাস করতে শিষ্যদিগকে বললেন। বুদ্ধ কাপিল দর্শন গ্রহণ করেছিলেন। বেদ-বিরোধী হওয়ায় বুদ্ধকে বিধর্মী বলা হত। শাক্যমুনি বুদ্ধ প্রাচীন প্রথাকে পরিবর্তিত করে নূতন ভাবধারা প্রচার করলেন। তাতে যে প্রতিক্রিয়া সুরু হল তার ফলে সুবিধাভোগী পুরোহিত সম্প্রদায় স্থানচ্যুত হলেন, বৈদিক দেবতারাও মানুষের ভৃত্যপদে নিক্ষিপ্ত হলেন। বৌদ্ধ ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল, প্রাণীহত্যা'মূলক ধর্মানুষ্ঠান সংস্কার করা, এবং পুরুষানুক্রমিক আভিজাত্য ও পৌরহিত্য প্রভৃতি ভেঙ্গে ফেলা। কিন্তু ইহা বৈদিক ধর্ম ধ্বংস করতে বা হিন্দু সমাজ উল্টে দিতে পারেনি। বুদ্ধ ভিক্ষু-সংঘ ও ভিক্ষুণী-সংঘ স্থাপন করে তাদের হাতে ধর্মসাধন ও ধর্ম প্রচারের ভার দিলেন।

বৌদ্ধের সংখ্যা ভারতে অতি অল্প। আদি বৌদ্ধরা জাতিভেদ মানতে না। বুদ্ধ ছিলেন অসামান্য সমাজ-সংস্কারক। বৌদ্ধ দেশসমূহে আধুনি যুগে বর্ণ সৃষ্টির খুব চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হয়নি বৌদ্ধদের জাতিভেদ কার্যতঃ অর্থহীন।

সাকার ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বুদ্ধ যে নিরন্তর প্রতিবাদ করলেন তার প্রতিক্রিয় রূপে ভারতে মূর্তি-পূজা সৃষ্টি হল। বেদে মূর্তিপূজা নাই। কারণ ঋষি সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন করতেন। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুদ্ধ কর্তৃক অস্বীকৃ হওযায় ভীষণ প্রতিক্রিয়া সুরু হল এবং তার ফলে অসংখ্য মূর্তি দেখা গেল যে বুদ্ধ ও জীশু ঈশ্বরের মূর্তি মানলেন না তাঁদেরই মূর্তি পূজিত হতে লাগল মূর্তিপূজার সীমা কাষ্ঠ ও প্রস্তর থেকে জীশু ও বুদ্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত। কি ধর্মজগতে মূর্তিপূজা থ কবেই থাকবে।

বৌদ্ধধর্ম অতিশয় দার্শনিক এবং সেজন্য ভারতের সর্বত্র প্রসারি হয়েছিল। পঁচিশ শতক পূর্বে আর্যদের মধ্যে কি অদ্ভুত সংস্কৃতি ছিল, যা বলে তারা বুদ্ধ-বাণী বুঝতে পেরেছিল। বুদ্ধই একমাত্র ভারতীয় মহাদার্শনিক যিনি জাতিভেদ স্বীকার করেননি। বৌদ্ধদের সংখ্যা ভারতে এখন নগণ বলা যায়। অন্যান্য দার্শনিকরা অল্পবিস্তর সামাজিক কুসংস্কারের প্রশ দিয়েছিলেন ; কিন্তু বুদ্ধ তা করেননি।

বুদ্ধ অন্য যে কোন ধর্মগুরু অপেক্ষা সাহসী ও একনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি বললেন, "কোন ধর্ম-গ্রন্থে আস্থা রেখো না। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড অমূলক তারা আমাদের সঙ্গে যদি সম্মত হয় তবে ভাল এবং তা তাদে পক্ষেই ভাল। আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ বেদ। যজ্ঞ ও প্রার্থনা নিরর্থক।" বুদ্ধ প্রথম মানুষ, যিনি জগৎকে সম্পূর্ণ নীতি-বিজ্ঞান শিক্ষা দিলেন। তিনি ভালর জন্যই ভাল ছিলেন এবং ভালবাসার জন্যই ভালবাসতেন মানুষকে, পশুকে পর্যন্ত।

বৌদ্ধ সাহিত্যে নানা স্থানে বেদান্তের উল্লেখ আছে এবং এমন কি বৌদ্ধ-ধর্মের মহাযান শাখা ও অদ্বৈতবাদ ভিন্ন নয়। বৌদ্ধ অমর সিংহ তাঁ

র-কোষ' গ্রন্থে বুদ্ধের অন্যতম নাম রেখেছেন অদ্বয়বাদী। আমার মতে ষানই হীনযান অপেক্ষা প্রাচীনতর এবং বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা উপনিষদ ীনতর।

নানা প্রকার শিবপূজা সম্ভবতঃ বৌদ্ধ যুগের পূর্বে উৎপন্ন। বৌদ্ধরা শৈব গুলি অধিকার করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কৃতকার্য না হয়ে স্থানের সমীপে বৌদ্ধতীর্থ স্থাপন করলেন। বুদ্ধগয়া ও সারনাথে তার র্শন পাওয়া যায়।

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে অগ্নিপুরাণে গ াসুরের যে কথা আছে তা কই লক্ষ্য করেছে। কিন্তু আমি তাহা বিশ্বাস করি না। উহা কোন ন প্রাচীন কাহিনীর পুনরুল্লেখ মাত্র। বুদ্ধ গয়াশীর্ষ পাহাড়ে বাস করতে রছিলেন। ইহার দ্বারাই উক্ত স্থানের পূর্বাস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

গয়া পূর্ব থেকেই পিতৃপূজার স্থান ছিল। বৌদ্ধরা পাদপূজা হিন্দুদের নিকট ক নকল করেছিল।

বৌদ্ধধর্মের একটি দোষ এই যে, ইহা ধর্মজীবনে ধারাবাহিক ক্রম-বিকাশের বুঝতে অক্ষম ছিল। এই জন্য উহা প্রাচীন ধর্মের সহিত কোন সমন্ধ যন করলে না। সেগুলি নিষ্প্রয়োজন ও অনিষ্টকর বলে পরিত্যক্ত হল।

ভারতের আধুনিক অধঃপতনের কারণ বিকৃত বৌদ্ধধর্ম। যারা বৌদ্ধ-র উন্নতি ও পতনের ইতিহাস পড়েননি তাঁরাই বলেন, বৌদ্ধধর্মের র গৌতম বুদ্ধের অদ্ভুত নীতি ও অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের বলে হয়েছিল। ান্ বুদ্ধের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভক্তি কোন বৌদ্ধের চেয়ে কম নয়। আমার কথা মনে রাখুন। বৌদ্ধধর্মের প্রসার বুদ্ধের বাণী বা ব্যক্তিত্বের য়নি। যে সব বড় বড় মন্দির নির্মিত ও তন্মধ্যে বড় বড় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত বং তাতে যে সমস্ত জমকাল অনুষ্ঠান হতে লাগল তা দেখেই জাতি হল। এইরূপে বুদ্ধধর্ম প্রসারিত হয়েছিল। কিন্তু কিছু কাল পরে র্মে যে ব্যভিচার ঢুকে পড়ল তার নিদর্শন আমরা দক্ষিণ ভারতের ' মন্দিরগাত্রে দেখতে পাই।

ধর্ম ব্যতীত ঐহিক বিদ্যা বিপজ্জনক। এমনকি, বৃহৎ বৌদ্ধ আন্দোলন অংশতঃ এই জন্যই নিষ্ফল হল।

ভারতে যে সকল ধর্ম সম্প্রদায় উপনিষদ্‌কে অমান্য করে তারা টিকে পারে না। উপনিষদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করায় ভারত ভূমি থেকে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম বহিষ্কৃত হল।

বৌদ্ধ আন্দোলনে ক্ষত্রিয়গণই আসল নেতা ছিলেন এবং সমগ্র বৌদ্ধ সমাজ ক্ষত্রিয় ধর্ম গ্রহণ করল। ধর্ম সংস্কার ও ধর্মান্তরিতকরণের আগ্রহে কথ্য ভাষাগুলি প্রধানতঃ চর্চিত হল সংস্কৃত ভাষাকে উপেক্ষা করে। অধিকাংশ ক্ষত্রিয়ই বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃত বিদ্যা থেকে বঞ্চিত ছিল।

মূর্তিপূজার উৎস বৌদ্ধ ধর্ম। প্রথমে এল চৈত্য, দ্বিতীয়তঃ হল স্তূপ এবং শেষে হল বুদ্ধ মন্দির। বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে এই বিষয়ে প্রতিযোগিতা করবার জন্য যেন হিন্দুরা বড় বড় মন্দির নির্মাণ করল তাদের দেবতাদের জন্য।

বৌদ্ধরা প্রত্যেক ভারতবাসীকে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী করতে চেষ্টা করে। সেই উচ্চ আদর্শ প্রত্যেকে অনুসরণ করতে পারে না। ক্রমশঃ ভিক্ষু-ভিক্ষুণী মধ্যে ধর্মানুরাগ কমে গেল ও ব্যভিচার ঢুকে পড়ল। ধর্মের নামে তিব্বতী অন্যান্য বর্বর-প্রথা অনুকরণও ইহার অন্যতম কারণ। বৌদ্ধরা তি... প্রভৃতি দেশে ধর্মপ্রচারার্থ গিয়েছিলেন এবং সেখানে গিয়ে তাদের ব্যভি... হজম করে সেগুলি ভারতে আমদানি করলেন।

বৌদ্ধ ও বৈদিক ধর্মের লক্ষ্য অভিন্ন। কিন্তু বৌদ্ধগণ কর্তৃক অবল... উপায় সত্য নহে। যদি বৌদ্ধ উপায় সত্য হত তাহলে আমরা হতাশ... পতিত ও বিধ্বস্ত হতাম না। যদিও বৌদ্ধদের লক্ষ্য এক ছিল তথাপি প্র... উপায়ের অভাবে তারা ভারতকে অধঃপতিত করেছে।

বৌদ্ধ সংস্কার এবং উহার প্রধান কর্মক্ষেত্র পূর্বে ছিল ভারত। ... রাজারা এই নূতন আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের ভক্তি... যেমন মৌর্য্য রাজগণকে ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট করেছিল তেমনি সাম্রাজ্যশক্তিও বৌদ্ধধর্মকে বিশ্বব্যাপী করেছে।

প্রচারের আগ্রহে বৌদ্ধধর্ম অন্য ভাবধারা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। ই অসামান্য গ্রহণশীলতার জন্য ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম পরিশেষে উহার স্বাতন্ত্র্য জায় রাখতে পারেনি। জনপ্রিয় হবার অসীম আগ্রহে বৌদ্ধধর্ম কয়েক তকের মধ্যেই হিন্দু ধর্মের বিচারশক্তির নিকট পরাজিত হল। ধর্ম যতই নপ্রিয় হয় ততই উহা অগভীর হয়ে পড়ে।

পাছে হিন্দুরা বৌদ্ধ হয়ে যায় সেজন্য সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ হল। সমুদ্র-াত্রা নিষেধের অন্যতম কারণ ইহাই। বৈদিক পৌরহিত্যের বিরুদ্ধে নবোত্থিত াত্রশক্তির বিদ্রোহের নামই বৌদ্ধধর্ম। হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মের সারভাগ গ্রহণান্তে হাকে ফেলে দিল। তখন বৌদ্ধধর্মের কত প্রভাব ছিল তাহা শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলী পড়লে বোঝা যায়।

বুদ্ধ ঘোষণা করেন, এই পরিবর্তনশীল জগতের পশ্চাতে যে ঐক্য অবস্থিত তা জানার প্রয়োজন নেই। এই প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব জানলেই দুঃখহানি হয়। কিন্তু বৈদান্তিক বলেন, ঐক্যই সত্য, নানাত্বই মিথ্যা। শুধু বৈচিত্র্য দেখে লাভ নেই। কারণ ঐক্যেই পরম তৃপ্তি ও শান্তিলাভ হয়।

বৌদ্ধরা বেদ-বিরোধী হলেও তাদের দার্শনিক গ্রন্থাবলীতে শ্রুতির সাহায্য গ্রহণ করেছেন। অন্ততঃ কয়েকটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্রন্থে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর অধিকাংশ জৈনগ্রন্থে শ্রুতির প্রামাণ্য গৃহীত।

ক্ষাত্রশক্তির অভ্যুত্থানই বৌদ্ধ সংস্কারে পরিণত হল। ধর্মের দিক্‌ দিয়া ইহা অনুষ্ঠান বর্জন করল, এবং রাজনীতির দিক দিয়া ব্রাহ্মণ পৌরহিত তিরোহিত হল। বৌদ্ধধর্মের প্লাবনে দেশে পৌরোহিত্যশক্তি নষ্ট হল; কিন্তু রাজশক্তি বেড়ে গেল। বৌদ্ধ ধর্ম যজ্ঞভোজী দেবতাগণের সিংহাসন টলিয়ে দিল এবং তাহাদিগকে স্বর্গচ্যুত করল। ব্রহ্মা বা ইন্দ্রের পদ অপেক্ষা বুদ্ধত্ব উচ্চতর। ইন্দ্রাদি দেবতারা দেবমানব বুদ্ধের পাদপূজার্থে প্রতিযোগিতা করতে লাগলেন। বুদ্ধত্ব লাভে সকলের অধিকার আছে এবং ইহ জন্মেই লাভ করা যায়। দেবতাদের পতনের ফলেই পৌরোহিত্যের প্রাধান্য কমে গেল। কিন্তু রাজশক্তির অভ্যুত্থানও দেখা গেল। কারণ

সংসারত্যাগী বৌদ্ধ পুরোহিতরা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মত রাজশক্তি করতলগ করতে পারলেন না।

আধুনিক বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন অসভ্য জাতির মধ্যে পড়ে সন্ন্যাস-ধর্মকে বিকৃ করেছে। যে অসভ্য জাতিরা পরিণয়ের ক্রমবিকাশ লাভ করেনি তা ভিক্ষুধর্ম কি করে পালন করবে? যদি জাপানে পরিণয় সম্বন্ধে সুমহৎ বিশুদ্ধ আদর্শ সমৃদ্ধ না হয় তা হলে জাপানে উত্তম ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী সৃষ্টি হ না। অবশ্য একথা সব বৌদ্ধ দেশের পক্ষেই প্রয়োজ্য।

বস্তুতঃ বৌদ্ধ ধর্ম ভারতে অবনত হয়নি। কারণ ইহা কেবল এক বিরাট সামাজিক আন্দোলন মাত্র ছিল। বুদ্ধের পূর্বে লোকে যজ্ঞার্থ ও অন্যা উদ্দেশ্যে প্রাণীহত্যা করত এবং খুব মদমাংস খেত। বুদ্ধের শিক্ষায় মদ্যপা মাংসাহার ও প্রাণীহত্যাদি দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে।

জীবে দয়া, সুমহৎ নৈতিক ধর্ম প্রচার এবং আত্মার অস্তিত্ব বা অনস্তি সম্বন্ধে চুলচেরা বিচার সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্মের সমগ্র সৌধ খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙ্গে পড় এবং উহার ধ্বংস অতি ভীষণ। সেই ধ্বংসের কুফল হিন্দু ধর্মকে দীর্ঘকা ভুগতে হল।

বৌদ্ধরা ছিলেন সর্বাপেক্ষা যুক্তিসম্পন্ন সন্দেহবাদী। প্রকৃতপক্ষে শূন্যবা পূর্ণবাদের মধ্যে কোথাও থামা যায় না। বৌদ্ধরা যুক্তির দিক দিয়ে সর্বধ্বং ছিল। তারা তাদের মতবাদকে যুক্তিবাদের শেষ সীমায় টেনে নিয়ে হাজি করল। অদ্বৈতবাদীরাও যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। বৌদ্ধ বেদান্তী উভয়েই ভেদ ও অভেদ এক সময়েই স্বীকার করে। বৌদ্ধরা জো দিলেন মিথ্যাত্বের উপর, আর বেদান্তীরা ধরে রইলেন বহুত্বের পশ্চাদ্বর্ত একত্বকে।

বৌদ্ধরা প্রাণীহত্যা করলেন না; কিন্তু দুনিয়ার ⅓ অংশ শুদ্ধ মৈত্রী দ্বা ধর্মান্তরিত করলেন। এদের মত মৈত্রী ভাব দুনিয়ায় আর কেউ দেখাত পারেনি।

বৌদ্ধধর্মের অধঃপতন বুদ্ধ-বাণীর ফলে হয় নি, বৌদ্ধদের দোষেই হল

ধিক দার্শনিক হযেই তারা হৃদয়ের উদারতা হারাল। ক্রমশঃ বামাচার পড়ল এবং বৌদ্ধধর্মকে বিনষ্ট করল। কোনও আধুনিক তন্ত্রে এরূপ চার দেখা যায না। পুরী ছিল বৌদ্ধধর্মের একটি মূল কেন্দ্র। জগন্নাথ ়র যে সকল বীভৎস চিত্র অঙ্কিত আছে তা দেখলে বোঝা যায, বৌদ্ধ ত অধঃপাতে গিযেছিল। রামানুজের সময থেকে পুরী বৈষ্ণব প্রভাবের ন হল।

আমি সম্পূর্ণরূপে এখন বিশ্বাস করি যে, আধুনিক হিন্দু ধর্মে যে সকল র ঢুকেছে তা বিকৃত বৌদ্ধধর্মের কুফল। যদি হিন্দুরা এটি পরিষ্কাররূপে ত পাবে তাহলে সহজে বর্জন করতে পারবে। বুদ্ধের ব্যক্তিত্ব ও বাণীর আমার গভীরতম শ্রদ্ধা আছে। সেজন্যই হিন্দুরা বুদ্ধকে অবতার পূজা করে। সিংহলী বৌদ্ধরাও ধর্মচ্যুত হয়েছে। তারা অত্যন্ত রোপীয় ভাবাপন্ন। তারা ইউরোপীয নামও গ্রহণ করেছে। সর্বত্র ইখানা খুলে বৌদ্ধরা প্রাণীহত্যাবর্জন পালন করছে এবং পুরোহিতবাদ বের সমর্থক। এখন আমি বুঝতে পারি, কেন বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে ড়িত হল।

বেদান্তের নেতিবাদকেই বৌদ্ধধর্ম আঁকড়ে ধরল। কিন্তু তার শেষ সীমায় না। মহাযানী বৌদ্ধদের অধিকাংশই মুক্তিবাদী এবং বস্তুতঃ বেদান্তী। নীরা শূন্যবাদ ভালবাসে। বাঙ্গালী বিজযের বংশধর বলে তারা এখনো অনুভব করে।

সিংহলের প্রধান বৌদ্ধ তীর্থ কান্দি শহরস্থ দন্ত-মন্দির বা দালদা মালিগাবা। বুদ্ধের একটি বৃহৎ দন্ত রক্ষিত। সিংহলীরা বলে, এই দন্তটি প্রথমে জগন্নাথ মন্দিরে ছিল এবং বহু কষ্টে সিংহলে এসেছে। সিংহলীরা প্রাচীন হরফে বৌদ্ধ শাস্ত্র সযত্নে রক্ষা করেছে। সিংহল থেকে বৌদ্ধধর্ম ব্রহ্মদেশ, অন্যান্য দেশে প্রসারলাভ করেছে। সিংহলী বৌদ্ধরা তাদের শাস্ত্রে ত শাক্যমুনিকেই স্বীকার করে এবং তাঁর উপদেশ পালন করে। , সিকিম, ভুটান, লাদক, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধদের মত

সিংহলীরা শিবপূজা করে না এবং তারা প্রভৃতি দেবীর মন্ত্রজপ করে কিন্তু তারা ভূত-প্রেতে খুবই বিশ্বাস করে। বৌদ্ধধর্ম দুই সম্প্রদায়ে বি —হীনযান ও মহাযান। সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম প্রভৃতি দেশে হীনযান প্র আর মহাযান চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে প্রভাবশালী। মহাযা নামে মাত্র বুদ্ধ পূজা করে। কিন্তু আসলে তারা তারা দেবী ও অবলোকি শ্বরের উপাসক। তারা অনেক রহস্যমূলক ক্রিয়া ও মন্ত্রজপাদি ক তিব্বতীরা শিবের প্রকৃত ভূত। তারা হিন্দু দেবদেবীগণকে উপাসনা ক ডমরু বাজায় মরা মানুষের মাথার খুলি কাছে রাখে। তারাই মৃত হাড়ে নির্মিত শিঙ্গা বাজায়, খুব মদ-মাংস খায়, এবং সর্বদাই মন্ত্রাদি উচ্চ করে ভূতপ্রেত তাড়ায় ও রোগ সারায়। চীনে ও জাপানে মন্দিরগাত্রে বি একাক্ষর মন্ত্র বড় বড় উজ্জ্বল হরফে লেখা দেখেছি। সেই অক্ষর হরফের সঙ্গে এত সাদৃশ্যযুক্ত যে, সেগুলি সহজে পড়া যায়।

বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবে সম্পূর্ণভাবে ধর্ম অবহেলিত হল এবং চতু মধ্যে কেবল মোক্ষই প্রধান হয়ে দাঁড়াল। বৌদ্ধরা ঘোষণা করলেন, "ত মোক্ষ ব্যতীত অন্য কিছু কাম্য নেই। তোমরা যে যেখানে আছ এস ও মুক্তি চল।" কিন্তু তা কি সকলের পক্ষে সম্ভব? সকলকে মুক্তিমার্গে আহ্বান বুদ্ধ এই দেশের সর্বনাশ করলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বধর্মের উপর জোর সকল শ্রেণীর মানুষকে ধর্মপথে টেনে আনলেন।

বৌদ্ধধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম দুইটী ভিন্ন জিনিষ নহে। ভারতে বৌদ্ধ অধঃপতনের সময় হিন্দুধর্ম কয়েকটি মূলনীতি গ্রহণপূর্বক নিজস্ব করে নিল তাকেই এখন বৈষ্ণব ধর্ম বলা হয়। অহিংসা নামক বৌদ্ধনীতি অতি উ কিন্তু সরকারী আইনের সাহায্যে মানুষের যোগ্যতা বিচার না করে তা স উপর প্রয়োগ করে বৌদ্ধধর্ম ভারতের সর্বনাশ করেছে। আমি অনেক ধ ভণ্ড দেখেছি, যারা পিঁপড়াগুলিকে চিনি খাওয়ায় এবং অর্থলোভে ভ্রাতার সর্বনাশ করতে ইতস্ততঃ করে না।

বৌদ্ধধর্মের সহিত বেদান্তের কোন বিবাদ নেই। বেদান্তের আদর্শ

মহাযানী বৌদ্ধ ও অদ্বৈতবাদী বেদান্তী এক পথের পথিক। কিন্তু ·
ানী বৌদ্ধরা ভিন্ন পথে চলে। তারা দৃশ্যমান প্রপঞ্চ নিয়েই ব্যস্ত।
ুদ্ধ যজ্ঞে প্রাণীহত্যা জোরে বন্ধ করবার জন্য সমাজকে যে ধাক্কা মারলেন
সমাজ তা থেকে এখনো সেরে ওঠেনি। বুদ্ধ বললেন, গাভী হত্যা কোরো
সেজন্য গাভীহত্যা এখনো হিন্দু সমাজে অপ্রচলিত।

বৌদ্ধধর্ম থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ই ভারতে জাতিভেদ অস্বীকার
ছে। কিন্তু ফল হয়েছে বিপরীত। যতই জাতিভেদ তোলবার চেষ্টা
ছ ততই জাতিভেদ বেড়ে গেছে।

বৌদ্ধরা প্রপঞ্চাতীত কোন নিত্যসত্তা স্বীকার করেন না। তারা বলেন,
পরিবর্তনশীল বিশ্বপ্রপঞ্চই আমরা দেখতে ও জানতে পারি। তদতিরিক্ত
স্বীকৃতি নিষ্প্রয়োজন। ইউরোপীয় অজ্ঞেয়বাদীরা প্রায়শঃ এই মতানুবর্তী
প্রভাব ইউরোপে সুগভীর।

বৌদ্ধদের ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ মতে এই দেহ সতত প্রবহমান জড়
৳। পরিবর্তনশীল ও প্রবহমান নদী-স্রোতের মধ্যে যেমন কোন
হীন সত্তা খুঁজে পাওয়া যায় না তেমনি দেহরূপ জড়-স্রোতের পশ্চাতেও
া নিত্য আত্মা নেই। ইহার দ্বারা জড় জগতের অনিত্যত্ব নিঃসংশয়ে
পিত হলেও সন্দেহবাদ ও অজ্ঞেয়বাদ এসে পড়ে। তাই বেদান্ত বৌদ্ধ
র পরিপূরক।

বৌদ্ধধর্ম ব্যতীত পৃথিবীর অন্য সব ধর্মই বলে, মানুষ পরিবর্তনহীন নিত্য
া। বৌদ্ধ বলেন, এই দেহ পঞ্চ স্কন্দের সংঘাত মাত্র, পরিবর্তন-প্রবাহ।
ফলে আদি বৌদ্ধরা জড়বাদী হয়ে পড়েছেন।

বৌদ্ধদের মতে দুঃখের মূল বাসনা এবং বাসনা নাশ দ্বারা দুঃখনাশ হয়।
মারতে গিয়ে মানুষকে মেরে ফেলার মতই তারা দুঃখনাশের আগ্রহে
আত্মাকে মেরে ফেলেছে! অনাত্মবাদ জড়বাদের একটি ছদ্ম রূপ। তাই
ান্ত বৌদ্ধমত খণ্ডন করেছে।

অতীত ভারতের ধর্মপ্রচার-শক্তি অসীম ছিল। ইংলণ্ড খ্রীষ্টান ধর্মে

দীক্ষিত হবার শত শত বৎসর পূর্বে বৌদ্ধ প্রচারকগণ ভারত থেকে এশি
প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

লঙ্কা বৌদ্ধ হবার বহু পূর্বে বাংলার বিজয় সিংহ সেখানে যান ও উপনি
স্থাপন করেন। তাঁর নামানুসারে লঙ্কার নাম হয়েছে সিংহল। পরে স
অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রা সিংহলে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম প্র
করেন। অনুরাধাপুরে তাঁদের দ্বারা স্থাপিত বোধি বৃক্ষ অদ্যাপি বিদ্যমা
তথায় তাঁদের পাষাণ মূর্তিও দেখা যায়।

দুই

বেদ ও বুদ্ধ*

হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম অক্ষয় বেদ-বৃক্ষের দুইটী প্রাচীন শাখা। আর্য জ্ঞ
গঙ্গার এই দুটী বিভিন্ন স্রোত ভারত ও মরুসদৃশ ভারতেতর বহু দেশকে উ
ও শস্য-শ্যামল করিয়াছে। কিন্তু অতিশয় আক্ষেপের বিষয় এই যে, উ
ধর্মের নব্য অবলম্বীগণ তাহাদের সাধারণ উৎস ভুলিয়া গিয়াছেন। অপ্র
ও নগণ্য বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পরস্পরের মধ্যে তাহারা এ
তথাকথিত ব্যবধান ও বিরোধের দুর্লঘ্য প্রাচীর তুলিয়াছেন। কিন্তু এই সম
ও ঐক্যের যুগে হিন্দুগণ ও বৌদ্ধগণকে উভয়ের মিলনস্থান খুঁজিয়া বা
করিতে হইবে। নচেৎ উভয়ের অকল্যাণ অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যম্ভাবী ব
মনে হয়।

অখণ্ড সমষ্টিরূপে ভারতীয় চিন্তার ইতিহাস ও অভিব্যক্তি প্রকৃতপ
আলোচনা এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের অন্তরে প্রবেশ করিলে দেখা যায়
অসম্ভব না হইলেও উভয়ের মধ্যে একটা প্রভেদ রেখা টানা সত্যই কষ্টক
কলিকাতা আর্টস্কুলের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব বর্তমানে ভার

* 'বিচিত্রা' মাসিকে ১৩৩৯ সালের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

।কলার অনৈক শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। তিনি তাঁহার ভারতীয় শিল্পকলা বিষয়ক
।কাবলীতে[১] এই মূল্যবান্ বাক্যটি প্রচার করিয়াছেন যে, বৈদিক আদর্শের
সূত্র শুধু হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, মোগল ও সারাশেন শিল্পকলার ভিত্তি
; পরন্তু উহা চীন, জাপান, বালী, পার্শী, আরব, সংক্ষেপে সমগ্র এশিয়ার
ল্প-তরুরও মূল। উক্ত ইংরাজ পণ্ডিত মহাভারতে এইরূপ ইঙ্গিত পাইয়াছেন
মিশর, ক্রীট ও প্রাক্‌ফিডীয় গ্রীক সভ্যতা বহু বিষয়ে প্রাচীন ভারতের
ট ঋণী।

তিনি আরও বলেন যে, বাবিলন ও মেসোপটেমিয়া প্রায় ছয় শতাব্দী
ং আর্য্য শাসনের অধীন ছিল। কাশাইট নামক কোন আর্য্য জাতির দলপতি
গ্রাশ তথায় রাজত্ব করিতেন। তখন তাহাদের প্রধান দেবতা ছিল বৈদিক
তা সূর্য্য। ইউফ্রেতিশ ও তাইগ্রিস নদীর মধ্য ভূভাগ মিট্টানী নামক
্য এক আর্য্যজাতির অধীন ছিল। বরুণ, ইন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতি বৈদিক
তাগণ ছিলেন তাহাদের (মিট্টানীদের) উপাস্য। উক্ত মিট্টানীদের সহিত
র ও এসিরিয়ার যোগাযোগ হইয়াছিল। প্যারিসের অন্তর্গত লুভারে,
বার রাজা শাতুনীর পরাজয়সূচক যে ধাতু মূর্তিটি (২৭৫০ খ্রীষ্ট পূর্ব) আছে,
ট দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভারতীয় শিল্পকলার সহিত, মেসোপটেমিয়ার
কলার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "হিন্দুধর্ম (হিন্দুধর্ম অর্থে বৈদিক ধর্মকে নির্দেশ
তেছি) ও প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে প্রভেদ ইহুদী ধর্ম ও খ্রীষ্টান ধর্মের
প্রভেদের মত। প্রভেদ মাত্র এই যে, ইহুদীগণ জীশু খ্রীষ্টকে শুধু বর্জন
য়া ক্ষান্ত হয় নাই, তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিল। আর হিন্দুগণ
্যমুনিকে ঈশ্বরের আসনে তুলিয়া দেবমানব জ্ঞানে পূজা করিল। ভগবান্
কিছুই ধ্বংস করিতে আসেন নাই। তিনি বৈদিক ধর্মের ন্যায়-সঙ্গত বিকাশ

১ Ideals of Indian Art, Hand Book of Indian Art,
ian Art and Sculpture ইত্যাদি।

করা হইয়াছে।" ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামীর[১] মতে সাংখ্যের সহিত বৌদ্ধ ধর্মের মূল পার্থক্য এই,—উহা সাংখ্যের পুরুষ অস্বীকার করে মাত্র, কি সাংখ্য ও বেদান্তের সহিত এই কথা স্বীকার করে যে, সুখ-দুঃখ উভয়ই কষ্টক ও যন্ত্রণাদায়ক। আনন্দোৎসবে অস্থিপঞ্জর দর্শনের ন্যায় সুখের স্থায়িত্ব অলীক অধিভূত, অধ্যাত্ম ও অধিদৈব—এই দুঃখত্রয়াভিঘাত হইতে পরিত্রাণ লাভ সাংখ্যের উদ্দেশ্য। শুধু সাংখ্য নহে, যোগদর্শন কর্তৃকও বৌদ্ধধর্ম বিশেষ ভা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। যোগদর্শনের ধ্যান প্রাচীন বৌদ্ধগণ 'ঝান' (Jhan পালি কথা) রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ডাঃ কার্পেণ্টার[২] বলেন, উহা হই চীন দেশের 'চান' (chan) এবং জাপানের জেন (Zen) সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে জাপানে প্রচলিত আটটি প্রধান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে জেন একটি প্রাচীন প্রভাবশালী সম্প্রদায়। বৌদ্ধ ধ্যান-প্রণালী প্রায়শঃ পাতঞ্জল যোগসূত্র হই গৃহীত। 'আনাপান সতী' নামক বৌদ্ধ প্রাণায়ামও বৈদিক প্রাণায়ামে অনুকরণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সার এইচ. এস. গৌর[৩] বলেন যে, বৌ ও সাংখ্য দর্শন উভয়ের ভিত্তি বেদান্ত। তাহারা যেন দুইটি শাখা-নদী বেদা রূপ প্রধান নদীতে প্রবাহিত হইয়া উভয় তীর ভঙ্গপূর্বক নূতন পথ সৃষ্টি করি লইয়াছে এবং কিছু দূর স্বতন্ত্র ভাবে প্রবাহিত হইবার পর পুনরায় উৎপত্তিস্থান মুখ্য স্রোতধারায় মিলিত হইয়াছে।

বুদ্ধ ছিলেন বৈদিক 'প্রোটেস্ট্যাণ্ট' (protestant)। কারণ তিনি বৈদি যাগ-যজ্ঞ ও ক্রিয়া-কাণ্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বৈদিক ধ 'কালা পাহাড়' ছিলেন না। তিনি কেবল তাঁহার শিষ্যগণকে বৃথা শুষ্ক দার্শ আলোচনা হইতে নিবৃত্ত করিয়া সৎভাবে জীবন যাপন ও সাধু কর্ম দ্বারা জীব

১ "Buddha and Gospel of Buddhism' (পৃঃ ১৯৬)।

২ ডাঃ জে. ই. কার্পেণ্টার প্রণীত 'Buddhism and Christiani (পৃঃ ২৮৮)।

৩ সার এচ্. এস্. গৌর—'Spirit of Buddhism' (পৃঃ ২৮)।

াবিকাশের বেগ বৃদ্ধি করিতে উপদেশ দিযাছিলেন। নাটেলাই রকোটফ[১] লন, "বুদ্ধের উপদেশ ও তাঁহার অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ ছিল না। গৃভীর নসম্ভূত সতর্কতা দ্বারা প্রণোদিত হইযা তিনি নিজের গভীরতম অনুভূতি বারণে প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন। কারণ তৎসমূহ বিকৃতভাবে হণ করিলে বিপজ্জনক।" ছান্দোগ্য উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদে হা স্পষ্টই হৃদযঙ্গম হয। ঋষি সনৎকুমারের উপদেশ অন্যভাবে গ্রহণ করিয়া বোচন নিজেকে এবং অপরকে বিপথগামী করিযাছিলেন।

একদা কৌশাম্বীস্থ শিংশপা বনে তথাগত নিকটস্থ বৃক্ষ হইতে কয়েকটি াতা ছিঁড়িযা লইযা সমবেত ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, 'আমার হস্তস্থিত পত্রের লনায বৃক্ষস্থ পত্রাবলী যেমন অসংখ্য গু ণ অধিক, তদ্রূপ যাহা আমি তোমাদিগকে িয়াছি তাহা অপেক্ষা যাহা আমি অনুভব করিয়াছি ও বলি নাই তাহা হস্র গুণে অধিক।" অন্তরঙ্গ, সঙ্ঘ-সভ্য ও সাধারণ—এই তিন শ্রেণীতে াহার শিষ্য-বিভাগেব প্রবাদ আছে। তিনি শরীর-মনের আপেক্ষিকতা াচার করিযা মানব আত্মা বা চরম সত্যের বিষযে নীরব ছিলেন। কিন্তু তিনি খনও আত্মাব অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। বুদ্ধের নীরবতা সন্দেহবাদী । নাস্তিকেব নীরবতা নহে, উহা অপরোক্ষ অনুভূতি জনিত, যাহাকে পনিষদের ভাষায অনির্বচনীয়, 'অবাঙমনসোগোচরম্' কহে। বেদান্ত-কেশরী ঙ্করাচার্য্য তাঁহার কোন উপনিষদের ভাষ্যে বলেন, "পরব্রহ্ম বা পারমার্থিক ত্যকে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রূপে যে বর্ণনা করা হয় তাহার কারণ আমাদের রীর, মন ও ইন্দ্রিযের সসীমতা। কিন্তু উক্ত লক্ষণের দ্বারা সত্যের প্রকৃত স্বরূপ নির্দেশ করা যায় না—যেহেতু চরম সত্য নির্বিশেষ।" প্রাগ্‌বৌদ্ধ গেব কেন উপনিষদের বর্ণনাই সমীচীন। তাহা (তৎ) "বিজ্ঞাতম্ াবিজানতাম্, অবিজ্ঞাতম্ বিজানতাম্"। অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন বলেন নি তাঁহাকে জানেন না এবং যিনি ব্রহ্মানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন া, প্রকৃতরূপে তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ। ব্রহ্ম জ্ঞান ও অজ্ঞানের পারে। আচার্য্য শঙ্কর

[১] নাটেলাই রকোটফ্—'Foundations of Buddhism' (পৃঃ ৩০)।

বেদের একটি প্রাচীন আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, বাস্কলী বাহ্ব ঋষিকে ব্রহ্মস্বরূপ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি মৌনাবলম্বন করেন। বাস্কলী দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, "আমি ব্রহ্মের স্বরূপ তোমাকে ইঙ্গিত করিয়াছি। বস্তুতঃ তুমি তাহা বুঝিতে পার নাই। 'মৌনমেব ব্রহ্ম', ব্রহ্ম অনির্বচনীয়।"

বুদ্ধদেবের ধর্ম প্রকৃত পক্ষে বৈদিক জ্ঞানমার্গ। সিংহল দেশীয় ভিক্ষু আনন্দ মৈত্রেয় বলিয়াছিলেন, "বুদ্ধের সমসাময়িক এক পুরাতন পালি সূত্রে এইরূপ একটি উপাখ্যান আছে যে, বুদ্ধ জনৈক নাস্তিকের নিকট মনও শরীরাতীত আত্মার সত্তা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন, এবং আমার মনে হয়, ত্রিপিটকের বিস্তৃত ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষ হিন্দু পুরাণ হইতে তাঁহার অধিকাংশ 'মাল মশলা' সংগ্রহ করিয়াছিলেন।" ত্রিপিটকোক্ত খরগোস ও চন্দ্রের উপাখ্যানটি বিষ্ণুপুরাণ হইতে গৃহীত। কিন্তু পুরাণগুলি প্রচলিত ধর্মের 'খতিয়ান' মাত্র। হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠাংশ জানিতে হইলে ষড় দর্শন, গীতা, উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতিতে তাত্ত্বিক অন্বেষণ করিতে হইবে। যে নির্বাণ বা বিমুক্ত অবস্থায় স্বর্গ ও নরক উভয় হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, তাহা শূন্য নহে। বুদ্ধ বলিতেন, "যে ভিক্ষু অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা মুক্তিলাভ করিয়াছে সে দেখিতে পায় না, জানে না বা শুনে না—এইরূপ ব অসঙ্গত।" বৌদ্ধ নির্বাণ ও বৈদিক সমাধি উভয়েই এক অবস্থা। উভয় বাক্যমনাতীত তুরীয় অবস্থা। উপনিষদে উক্ত অবস্থার এইরূপ বর্ণনা আছে "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে অস্তং গচ্ছতি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বা নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"[১] উপনিষদের 'ভূমা' ত্রিপিটকের নির্বাণ একই। নির্বাণ অর্থে শরীর ও মনের বন্ধন হইতে চিরমুক্তি নির্বাণ অর্থে স্বরাজ, যখন আত্মা 'স্বে মহিম্নি বিরাজতে।' সমাধি ও নির্বা উভয়েই অখণ্ড আনন্দের, পরম সুখের অবস্থা। বৌদ্ধগণও নির্বাণকে চর শান্তির অবস্থারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মহাযান শাখায় বুদ্ধের স্থান বে

১ যেমন নদীসমূহ নানা দেশে প্রবাহিত হইয়া নামরূপ বিসর্জনপূর্বক সমুদ্রে মিলিত হয় তদ্র জ্ঞানী নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম দিব্য ব্রহ্ম পুরুষে একীভূত হন।

ব্রহ্মের মত। বেদে যেমন ব্রহ্মকে 'নেতি' 'নেতি' রূপে ঋষিগণ বর্ণনা করিয়াছেন তদ্রূপ পাশ্চাত্য মিষ্টিক্ বা অতীন্দ্রিয়বাদীগণও বলেন, ঈশ্বরকে শূন্য বলিলে মিথ্যা বলা হয় না।

রকোটফ্ সাহেব[১] বলেন, "অসীম বিস্তারশীল, জ্যোতির্ময় ও অনন্ত জীবনের দ্বার এই নির্বাণ। নির্বাণ শূন্য নহে।" মহাপরিনির্বাণ সূত্রে উল্লিখিত আছে, মৃত্যুর প্রাক্কালে তথাগতের চিন্তা সুন্দর বস্তুর অভিমুখী ছিল। তিনি যে সকল মনোরম স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন তৎসমুদয় তখন স্মরণ করিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন; "আহা! রাজগৃহ কি সুন্দর! বৈশালী কি সুন্দর!" ইত্যাদি।

বেদ ও বুদ্ধের মধ্যে কোন মৌলিক ব্যবধান বা আন্তরিক পার্থক্য বা প্রকৃত বিরোধ নাই। বুদ্ধ বেদের প্রাকৃত পরিণতি। প্রত্যেক ধর্মকে বিকাশের চরম সীমায় পৌছিতে হইলে উক্ত অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়। ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামী[২] বলেন, "বেদের বিশাল চিন্তারাশির মধ্যে বুদ্ধ একটি অংশগ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু যদি বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যাতাগণ বুদ্ধ-বাণীতেই বৌদ্ধ ধর্মকে পর্যবসিত করিতে জিদ্ করেন, তবে আমাদেরও স্পষ্টভাবে বলিতে হইবে যে, বৌদ্ধধর্ম একটি আংশিক ও সঙ্কীর্ণ আদর্শের পক্ষপাতী। উহা জীবন ও দর্শনের র্ণ ব্যাখ্যা নহে। পূর্ণ এবং অংশের সহিত যা প্রভেদ বেদ ও বুদ্ধের মধ্যে দ্রূপ পার্থক্য।" তাই বিজ্ঞানভিক্ষু বৌদ্ধদর্শনকে সপ্তম বৈদিক দর্শন রূপে র্দেশ করিয়াছেন। বেদ ও বুদ্ধের মধ্যে প্রভেদ যতই হউক না কেন উহা াবগত ও ভাষাগত ও বাহ্যিক; কিন্তু মৌলিক ও আন্তরিক নহে। সমস্ত ধান বিষয়ে বুদ্ধকে বেদ মূর্তি বলিলে ভুল হয় না। বৌদ্ধ ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম ভয়েই একটি পূর্ণ দর্শনের দুইটী ভিন্ন শাখা।

দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণের ধারণা এই যে, হিন্দু ষড়দর্শন বুদ্ধদেবের

১ বাটেলাই রকোটফ্—'Foundations of Buddhism' (পৃঃ ১০০)।
২ 'Buddha and the Gospel of Buddhism', পৃঃ ২১৯।

পরে সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীতে প্রায়ই দেখা যায়, ছয়জন দার্শনি পণ্ডিত সর্বদা বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আমাদের ধারণা, উহারা অন্য কে নহেন, ছয়টি হিন্দুদর্শনের ছয়জন পণ্ডিত।

বৌদ্ধের সময়ে বৈদিক ধর্মের প্রকৃতভাব 'বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী', ক্রিয়াকাণ্ড প্রভৃতিতে এত জটিল হইয়া ছিল যে, পৌরহিত্যবাদ ও কুসংস্ক ধর্মের নামে চলিত। বুদ্ধদেব এই ব্যাপক বহিরঙ্গ ধর্মকে আঘাত দিয়াছিলে তখনও আত্ম-তত্ত্ব শিষ্য-পরম্পরায় মুষ্টিমেয় সাধুদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। ত বুদ্ধদেব তাঁহার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হন নাই। তিনি কেবল প্রচলি সাধারণ ধর্মের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। এই জন্য ডাঃ আনন্দকু স্বামী বলেন, "বৌদ্ধ বিতণ্ডার অধিকাংশই বাতাসের সহিত যুদ্ধ করি ব্যয়িত হইয়াছে। তাই দেখা যায়, ঔপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যার সারভাগ প্রাচি বৌদ্ধগণ বুঝিতে পারেন নাই।" এতৎ সম্পর্কে এ. উর্‌শ্ল[১] সাহেব সত বলিয়াছেন যে, যদি বুদ্ধদেব তাঁহার প্রব্রজ্যার প্রথম ভাগে বেদবিদ্যায় পারদ দুইজন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির পরিচয় পাইতেন তাহা হইলে প্রাচীন জগতে ইতিহাস সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া যাইত। তদ্ব্যতীত বুদ্ধ ক্ষত্রিয় বং রাজকুমার ছিলেন বলিয়া ক্ষত্রিয়-সুলভ সমরবিদ্যায় শিক্ষিত হইয়াছিলে কিন্তু বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীতে এমন কিছু পাওয়া যায় না যে, তিনি ব্রাহ্মণ-বিদ্যায় দর্শন-শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।

ভারতের পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের আর এক মারাত্মক ভ্রম এই তাঁহারা বলেন, বৈদিক যুগে শিল্পকলা প্রভৃতির চর্চা ছিল না; তৎসমুদয় বৌদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু উক্ত বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হ্যাভেল সাহেব বলেন ভারতীয় আর্টের জন্ম বৈদিক যুগেই হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল কাষ্ঠ

---

১ এ. ওরস্‌লির 'Concepts of Monism', পৃঃ ১৯৭।—"It possible had Gautama chanced to meet in his earlie wanderings two teachers of the highest Vedic truth whe history of the Buddhist world might have been changed

অন্যান্য অস্থায়ী দ্রব্যজাত ছিল বলিয়া তাহাদের সামান্য মাত্র চিহ্ন পাওয়া যায়। বৈদিক আর্যগণের ধর্মসম্বন্ধীয় প্রথাগুলি এত পবিত্র ছিল যে, তাঁহারা ভাষায় বা কোন শিল্প-কলায় সে সকল নিবদ্ধ করিতে চাহিতেন না। কারণ তাহাতে মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকৃতির সম্ভাবনা অধিক। হিব্রু জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহামানব মুসা যেমন বলিয়াছিলেন, "স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা আছে তাহার কোন মূর্তি বা ছবি করা উচিত নহে।" বৈদিক ঋষিগণও উহা অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিতেন। শ্রুতির মত বৈদিক আর্টের মূলসূত্রগুলি গুরু-শিষ্য পরম্পরায়, পুরুষ-পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিত। বৈদিক আর্ট ছিল সমন্বয়সূচক ও ভাবমূলক (subjective and idealistic), বাস্তব বা বিশ্লেষণমূলক (objective) নহে। প্রাচীনতম বৌদ্ধ স্তূপের আকার ও পরিমাপ প্রভৃতি বৈদিক যজ্ঞবেদী হইতে গৃহীত। বৌদ্ধ আর্টে প্রাচীন ভারতীয় সূর্য-প্রতীক ধর্ম-প্রতীকে পরিণত হইল। প্রাচীন বৌদ্ধ ক্রিয়াকাণ্ড সমূহ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড, কেবলমাত্র তাহাতে হোতা, উদ্গাতা প্রভৃতি ছিল—ব্রাহ্মণ, যাজ্ঞিক ও পশুবধাদি ছিল না। উভয়ের মধ্যে অন্য কোন তারতম্য নাই।

প্রায় পঞ্চদশ বৎসর পূর্বে ভারতীয় আর্টের পুরাবৃত্তকার হ্যাভেল সাহেব যাহা বলিয়াছিলেন আজ তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন, সিন্ধু, ও গঙ্গানদীর উভয় পার্শ্বে, রাজপুতানার মরুর নিম্নে এবং কনৌজ, রাজগৃহ প্রভৃতি প্রাচীন নগরের নিম্নে প্রাচীন বৈদিক আর্টের নিদর্শন প্রোথিত আছে। উত্তর ভারতীয় ভূ-খনন কার্য্যে কিছু কিছু চিহ্ন সত্যই পাওয়া যাইতেছে। তিনি আরও বলেন, "রামায়ণে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় যে, বৈদিক শিল্পকলা ও কারুকার্য্য সমস্তই যজ্ঞকাষ্ঠ-নির্মিত ছিল। তাই তাহারা ভারতীয় আবহাওয়ার রুদ্র প্রভাব ও কীট-পতঙ্গের উপদ্রব সহ্য করিতে পারে নাই। মাটীর দেওয়ালে ফ্রেস্কো-চিত্র. কাষ্ঠময় কারুকার্য্য পুরাবৃত্তের অতি অস্থায়ী চিহ্ন। তাই অশোকের পূর্বের সেইরূপ কোন আর্ট-রেকর্ড পাওয়া যায় নাই। তথাপি মধ্যপ্রদেশের রায়গড় স্টেটে এবং যুক্তপ্রদেশের মির্জাপুর স্টেটে প্রাগৈতিহাসিক যুগের যৎকিঞ্চিৎ ড্রয়িং ও চিত্র পাওয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধ স্মৃতি-স্তম্ভের রেলিংগুলির নাম ছিল বেদিকা। বেদিকা এক সংস্কৃত শব্দ। উহা বৈদিক যজ্ঞভূমির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। রেলিংয়ে সমান্তরাল কাষ্ঠগুলিকে শুচি বলা হয়। শুচিও আর একটি বৈদিক শব্দ শুচি অর্থে একগুচ্ছ শুদ্ধ কুশ। কুশ যজ্ঞভূমিতে পাতিয়া রাখা হইত। যাত্রীদে পরিক্রমার জন্য স্তূপ-মূলে নির্দ্দিষ্ট বিস্তৃত পথকে মেধী বলা হইত। মেধ মা যজ্ঞ। যথা অশ্বমেধ। বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদের গোলাকারে স্তূপ-পরি-ভ্রমণে প্রথা বৈদিক সূর্য্যোপাসনা হইতে গৃহীত। বর্তমান কালেও হিন্দুদের মধ উক্ত প্রথা যথেষ্ট প্রচলিত। কোন কোন বৈদিক ক্রিয়াতে একটি ব্রাহ্ম একটি স্তম্ভে রথের চাকা বাধিয়া উহা ডান দিক হইতে ঘুরাইতে ঘুরাই সামগান করিতেন। তাহা হইতেই বৌদ্ধগণ 'ধর্মচক্র প্রবর্তনে'র ভাব ও ভা পাইয়াছেন। বৈদিক আর্য্যদের রাজকীয় সমাধি-মন্দির হইতেই বৌদ্ধস্তূপে উৎপত্তি। স্তূপ পূজা বৌদ্ধদের একটি অতি প্রাচীন ও প্রধান অনুষ্ঠান। এ স্তূপ-পূজা নিঃসন্দেহে বৈদিক নরপতিগণের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট লায়ার্ড সাহেব নিনোভায় অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত সেনাচেরিবে রাজপ্রাসাদে আবিষ্কৃত রিলিফে অঙ্কিত গৃহগুলির সহিত ভারতীয় শিকার স্তূপের সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, বৈদিক আর্ট আদর্শ বৌদ্ধধর্মের মধ্য দিয়া সুদূর ইউরোপেও বিস্তৃত হইযাছিল। হ্যাভে সাহেব বলেন, গুজরাট, বিজাপুর, দিল্লী প্রভৃতির মোগল আর্ট এবং কারুকার্যে বৈদিক আর্ট-আদর্শ অটুট আছে।

মহম্মদের পূর্বে বৌদ্ধ মহাযান শাখা পশ্চিম এশিয়াতে বিস্তৃত হইয়াছিল হ্যাভেল সাহেব বলেন যে, মুসলমান জগতের পবিত্রতম মন্দির ও মসজিদে প্রথম আদর্শ কাবা মন্দির। আরব লেখকগণ উহার যে বর্ণনা দিয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায়, কাবা পূর্বে খ্রীষ্ট, মেরী ও মহাযান মূর্ত্তি প্রভৃতিতে পূ একটি বৌদ্ধ মন্দির ছিল। আরবীয় অসুরগণ যেমন কাশী, গুজরাট প্রভৃ ভারতীয় তীর্থে ধ্বংসের তাণ্ডব-নৃত্য করিয়াছে কাবাতেও তদ্রূপ করে এব উহাকেও একটি মসজিদে পরিণত করে। হ্যাভেল সাহেব বলেন, শুধু ভারতে

আরব, তুর্কী, মিশর, স্পেন, কনস্তান্তিনোপল, কায়রো, কর্ডোভা ও
ঞ্চাস প্রভৃতি ভারতবহির্ভূত দেশেও আর্ট ও কারুকার্য্য বৈদিক
র্শের বৌদ্ধ সংস্করণ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে।
:বৌদ্ধধর্মের প্রতীক সমুদয় বৌদ্ধদের অভিনব আবিষ্কার নহে। উহা বৈদিক
জাতের সাধারণ সম্পত্তি। সাঁচির কারুকার্য্যগুলিকে বৈদিক চিন্তা ও
:জব ভাষ্য ও টীকারূপে বুঝিলে উহার প্রকৃত অর্থ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ
সমূহে গৌতম-জননী মায়াদেবীর সহিত যে দ্রায়াদের (Diyad) সম্পর্ক
হ তাহাকে বেদে অরণ্যানী বলিত। বৈদিক আর্য্য সমাজের আদর্শ হইতে
সংঘের সৃষ্টি। বৌদ্ধ কারুকার্য্যের একটি সাধারণ প্রতীক শীকার। উহা
:ন ভারতের পাহাড়-পর্বত উপাসনার বৌদ্ধ সংস্করণ। বর্তমান হিন্দুগণও
মানিয়া চলেন। ভারতের প্রত্যেক পর্বত-শৃঙ্গে একটি দেব বা দেবীর
দৃষ্ট হয়। সিংহলের উচ্চতম শিখর এডাম্‌স্ পিক (Adam's Peak)
:বৌদ্ধ ও মুসলমানগণের প্রধান তীর্থ। হিন্দুগণ হিমালযের উচ্চতম
ক মহাদেবের বাসভূমি কৈলাস বলিয়া বিশ্বাস করেন।
উরাস (Taurus) নক্ষত্রমণ্ডলে সূর্য্য প্রবেশ করিলে বৎসর আরম্ভ হয়।
অতি প্রাচীন শৈব প্রবাদ। বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের জন্মতিথির চিহ্নস্বরূপ
Zodiac signরূপে উহা ব্যবহার করিয়াছে। বৈদিক আর্য্যগণের
ায় সংঘ হইতে বুদ্ধ যে ভিক্ষু সংঘ স্থাপন করিলেন তাহা ভারতীয় জীবনের
ও ওতপ্রোতভাবে নিহিত ছিল। অবশ্য শাক্যমুনিই সর্বপ্রথম উহার সুদৃঢ়
ষ্ঠা করেন। বৌদ্ধ চৈত্যের পরিকল্পনা, ও সংঘ-গৃহ আর্য্য একান্নবর্তী
বারের সাজ; কিন্তু সুদৃঢ় বন্দোবস্ত অনুযায়ী স্থাপিত। দ্বিতীয় শতাব্দীতে
ত নাসিকের পর্বতগাত্রে খোদিত মঠগুলি সেরূপ ভাবে প্রস্তুত
াছিল, যেরূপভাবে তখন প্রকৃত ভারতীয় গৃহগুলি নির্মিত হইত। প্রাচীন
মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্র অজন্তা ও ইলোরার বৌদ্ধ বিহারগুলি সেই
কল্পনায় নির্মিত। থামের বন্দোবস্ত, কাষ্ঠের উপর কারুকার্য্য ও ছাদের
র-কার্য্য সমস্তই প্রাচীন বৈদিক প্রবাদের আদর্শের মধ্যে, বাহিরে নহে।

ভারতীয় পঞ্চরত্ন মন্দিরের আদর্শেই জাভাস্থ (পাঁচ শতাব্দী পূর্বের) সেবা-মন্দির নির্মিত। অজন্তার স্তুপ-মন্দিরেও তাহাই। পদ্মপত্র ও ভারতীয় কাব্য, আর্ট প্রভৃতির সার্বজনীন প্রতীক। মহাযান শাখা বোধিসত্ত্বের শির-জ্যোতিঃরূপে গ্রহণ করিয়াছে। অনন্ত নাগের উপর যে নিদ্রাভিভূত নারায়ণের নাভি-পদ্ম হইতে উদ্ভূত প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রতীক প্রজ্ঞাপারমিতা রূপে মহাযান গ্রহণ করিয়াছে। তন্ত্র-তত্ত্ব অনুসারে মূলে ব্রহ্ম-বৃন্তে মায়া, ফুলে জগৎ, এবং ফলে মুক্তি।

বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের মধ্যে মিশিয়া যাওয়ার ফলে ভারতে বৈষ্ণব ও শৈব ধ উৎপত্তি হয়। নেপালের মহাযান মূর্তিগুলি এবং অজন্তা ও এলিফ্যাণ্টার শৈব মূ গুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। ভারতেও বৈষ্ণব ধর্ম মহাযানের উত্তরাধিকার রক্ষা করিতেছে। সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ ও ভারতের গুপ্তবংশীয় র সমুদ্রগুপ্ত যখন বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন তখন, অর্থাৎ প্রায় খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী জনৈক উত্তর ভারতীয় বিখ্যাত মগধী ব্যক্তির দ্বারা সিংহলের প্রসিদ্ধ সাইগিরি আর্ট ও অজন্তার চিত্রাবলী অঙ্কিত হয়। গুজরাট ও উড়িষ্যার (কোণারক) দেবতার সহিত গৌতম বোধিসত্ত্বের অদ্ভুত নিকট সাদৃশ্য আছে। অ সূর্য-দেবতাই আদর্শ রাজা বা বোধিসত্ত্বে পরিণত হইয়াছেন। সর্বত্র শিল্পকলা, কারুকার্য প্রভৃতির বৈদিক আদর্শবাদের অখণ্ড পরিণতি দৃষ্ট হয়। জ্ঞ মার্গে মুক্তি অন্বেষণকারী বৈদিক ব্রাহ্মণ হইতে বৌদ্ধগণ বুদ্ধকে মুক্তিদাতা গুরুভ গ্রহণ করিয়াছে। অভয়-মুদ্রাযুক্ত বুদ্ধদেব গুরুরূপে শিষ্যদের ভয় দূর করিতেছেন এইরূপ একটি প্রস্তর মূর্তি বাংলার সুলতানগঞ্জের ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধ বিহ পাওয়া গিয়াছে। উহা ঠিক সিংহলের বিখ্যাত অনুরাধাপুরস্থ বুদ্ধের ক্ষত্রিয় বা বোধিসত্ত্বরূপে বুদ্ধ এক আর্যবীর। ইহাই বৌদ্ধ ভক্তিবাদের প্রধান ম ভক্তিবাদও ভিন্ন আকারে মহাযানে প্রবেশ করিয়াছে। 'মজ্ঝিম নিকা বাইশ সূত্রে বুদ্ধ বলিতেছেন, "যাহারা আমার ধর্ম এখনো গ্রহণ করে নাই তা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিবে, যদি তাঁহারা আমার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করে তাঞ্জোর মন্দিরে পিত্তলনির্মিত কলার মূর্তিতে বুদ্ধকে গুরুরূপে দেখা যায়।

বৌদ্ধ ও বৈদিক আর্টের প্রতীকদ্বয় পৃথক্ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। উদাহরণ
প হিন্দু রাজা হূয়্সূর্যবর্মা কর্তৃক দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত কাম্বোডিয়ার
ঙ্করভাট মন্দিরে যে সমুদ্র-মন্থনের চিত্র আছে তদ্রূপ চিত্র মাদ্রাজের মামাল্লা-
রর মন্দির-গাত্রে দেখা যায়। রামায়ণ এবং মহাভারত জাভা ও কাম্বোডিয়াতেও
হৃত হইয়াছিল। জাভার বৈষ্ণব মন্দির প্রাম্বাননের গাত্রেও রামায়ণের
াখ্যান চিত্রিত। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণের প্রতীকস্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু,
ব এই ত্রিমূর্তিকে বৌদ্ধগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘরূপ ত্রিরত্নে পরিণত করিয়াছে।
লিফ্যাণ্টার বৌদ্ধ ত্রিরত্ন এবং নেপালের মহাযান ত্রিমূর্তি হিন্দু প্রতীক
'তে সংকলিত।

মহাযান শাখা হিন্দুর সমস্ত দেবদেবীকে তাহাদের ধর্মে স্থান দিয়াছে।
:দ ব্রহ্মার শক্তি যেমন সরস্বতী তেমনি মহাযান আদি বুদ্ধকে প্রজ্ঞাপারমিতা
মক শক্তিযুক্ত করিয়াছে। বৌদ্ধ হারিতি ও হিন্দু অদিতি অভিন্ন। জাভায়
দ্ধর শক্তির নাম তারা। বৈদিক উষা সাঁচীতে লক্ষ্মী এবং অন্যত্র বুদ্ধ-জননী
ধাতে পরিণত হইয়াছেন। শিব ও শক্তির ধাতু-মূর্তি দুর্গার (মাদ্রাজ
উজিয়ামে রক্ষিত) সহিত জাভাস্থ বরবুদুরের অবলোকিতেশ্বর এবং সিংহলের
রাধাপুর বুদ্ধের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। হিন্দু শিব এবং বৌদ্ধ মঞ্জুশ্রী এক। জাভার
মামাল্লাপুরের মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার চিত্রদ্বয় একই। জাভার বিশাল-বপু
ণশ একটি বৈদিক দেবতা। বৌদ্ধ শিল্প-প্রতিভা ভারতীয় যোগদর্শন কর্তৃক
দ্ধ হয়। তাই বারহুত, বরবুদুর, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ আর্ট সমৃদ্ধ
য়াছে। নাগার্জুন বৌদ্ধ ধর্মে এই পাতঞ্জল যোগ গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ আর্ট
ন উপনিষৎ-কলিকার প্রস্ফুটিত কুসুম। বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণি বৈদিক ইন্দ্র।
ন্তিদেব তাঁহার 'বোধিচর্যাবতার' নামক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থে বুদ্ধের এই
ন প্রকার শরীরের বর্ণনা দিয়াছেন—ধর্মকায়, সম্ভোগকায় এবং নির্মাণকায়।
ক শরীরত্রয় বৈদিক নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং
বতারের মতই। এই বিদ্বান্ গ্রন্থকার তাঁহার 'শিক্ষা-সমুচ্চয়' নামক
স্কৃত পুস্তকে সংবৃত্তি সত্য ও পারমার্থিক সত্যের বর্ণনা দিয়াছেন, যাহা

বৈদিক ব্যবহারিক (Relative), এবং পরমার্থ (Absolute) স
তুল্য।

বৌদ্ধ যুগ এক মহাপরিবর্তনের যুগ। ইউরোপীয় মধ্যযুগের ন্যায়
বিস্তার ও উদ্‌বোধনের যুগও বটে। এই যুগের কৃতিত্ব এই যে, উহা
এশিয়ার নানা স্থান হইতে বিভিন্ন দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহপূর্বক বৈদিক আর্টের f
ও সমন্বয় আনিযাছে। ভগবান্ বুদ্ধ সূক্ষ্ম বৈদিক চিন্তাগুলিকে বিশাল বি
দ্বারা মানুষের জীবনও চরিত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বৌদ্ধ যুগে বৈ
সমাজ স্বীয ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া নূতন সামাজিক আদর্শের সহিত
স্থাপন করে। আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিয়া উহা বর্ধিত ও বিস্তৃত হইয়া নবজীবন
করে। বৌদ্ধ যুগে বিভিন্ন চিন্তা, সভ্যতা ও আদর্শের সমাগমে ভারত স
ধর্ম-সঙ্কর (বর্ণ সঙ্করের তো কথাই নাই) উপস্থিত হইয়াছিল। বুদ্ধ বৈ
দর্শন ও ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজে প্রাচীন আদর্শ প্রতিষ্ঠা ক
তথাপি বৌদ্ধ চিন্তা ও সভ্যতার ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও নূতন ব্যাখ্যা হিসাবে ব
কিছু গবেষণা করিবার বাকী আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, বৌদ্ধ ধর্ম বেদের একটি সন্তান ;
'বিদ্রোহী সন্তান'। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডাঃ ওয়াডেল (Dr. Wad
সাহেব বলেন যে, সভ্যতা অর্থে aryanisatian মাত্র। ভগবান বুদ্ধ
এশিযাকে বৃহত্তর ভারতে পরিণত করিযাছেন, সমস্ত এশিযাকে
করিয়াছেন! উপরি উক্ত বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য বৌদ্ধধর্ম বা বুদ্ধকে
অংশে ছোট করা নয। জন্মস্থানে বৌদ্ধ ধর্ম সতেজ সজীব ছিল
উহা বেদান্তে পরিণত হইযাছে। কারণ ভারতের বেদান্ত বৌদ্ধধর্মের log
পরিণতি মাত্র। তাই চীনে ও জাপানে প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধধর্মের স
ভারতীয় বেদান্তের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যায়। মহাযান ও বেদান্ত উভযে
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সিংহলে, ব্রহ্মদেশে ও শ্যামে প্রচলিত হী
বৌদ্ধ ধর্ম নিস্তেজ ও নির্জীব বলিয়া ভয়ানক সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

নবযুগে বৌদ্ধ ধর্ম ও হিন্দুধর্মকে আবার জাগ্রত করিতে হইবে। ব

র দর্শন বা বিজ্ঞানের সত্যকে ভয় করিলে বৌদ্ধধর্ম বাঁচিবে না। জাগ্রত ত হইলে হীনযান ও মহাযান উভয়কেই জন্মস্থান বেদের প্রতি লক্ষ্য তে হইবে। মূল নদী শাখানদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে যেমন বেশী দূর দূর হইতে পারে না, বা ডাল যেমন বৃক্ষ হইতে ছিন্ন হইলে বহুকাল বাঁচে না রূপ বৌদ্ধধর্ম বেদ-ভিত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হইলে, ও হিন্দুধর্মের সহিত ার্দ্য স্থাপন না করিলে উহার মারাত্মক বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী। ভারতের রে বৌদ্ধধর্ম Indianisation এড়াইয়াছে বলিয়া দুর্বল। কিন্তু হিন্দুধর্ম ন শক্তিশালী ও পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। তাই হিন্দুধর্ম প্রত্যেক ব্দীতে বহু জগদ্‌বিখ্যাত ব্যক্তি সৃষ্টি করিয়াছে, আর বর্ত্তমান যুগের তো ই নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত দশ শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম উল্লেখ-্য কোন ব্যক্তি সৃষ্টি করিতে পারে নাই। রবীন্দ্র, গান্ধী, অরবিন্দ, মোহন, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি হিন্দু প্রতিভার ং-আলোড়নকারী শক্তি। বৌদ্ধধর্মকে বাচিতে হইলে পুনরায় হিন্দুধর্মের ত মিলিত ও বেদ-ভিত্তিতে দাঁড়াইতে হইবে।

তিন

বুদ্ধ ও উপনিষৎ *

ডাক্তার মিসেস্ রাইজ্ ডেভিড্স সমগ্র পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠতম পালি-যা ও পালি শাস্ত্রবিৎ বিদুষী ইংরাজ মহিলা। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পালির ্যাপক ও ইংলণ্ডের পালি টেকস্‌ট্ সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট। প্রায় পঞ্চাশ

* 'ভারতবর্ষ' মাসিকে ১৩৪১ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত ও স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্ত্তৃক লিখিত।

বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্বামী পালি-পণ্ডিত টি. ডবলিউ. রাইজ্ ডেভিডস্ এ সমিতি স্থাপন করিয়া আজীবন ইহার সভাপতি রূপে পশ্চিমে পালি-প্রচ করিয়াছেন। সিংহলে সিভিলিয়ান রূপে অবস্থান কালে তিনি পলিভাষা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার বুদ্ধিমতী ও বিদুষী স্ত্রীকে পরে পা শাস্ত্রের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। এই জগদ্-বিখ্যাত দম্পতী-যুগে প্রত্যেকেই প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া সমানভাবে পালি সাহিত্য গভীর ভা অধ্যয়ন, অনুবাদ, সমালোচনা ও প্রচার করিয়াছেন। মিসেস রাইজ ডেভিড বর্ত্তমানে তাঁহার বৃদ্ধ বয়স সত্ত্বেও পালি ত্রিপিটকের একটী Concordan প্রণয়নে নিযুক্তা আছেন। পালি ভাষায় হীনযান বা থেরাবাদ বৌদ্ধ ধ সমস্ত শাস্ত্র বর্ত্তমান। তিনি তাঁহার মূল্যবান জীবনের প্রায় সমগ্র সম পালি শাস্ত্র সম্বন্ধে যে সমস্ত চিন্তা, গবেষণা ও অধ্যয়ন করিয়াছেন, তা তিন খানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি জীবনব্যাপী সাধনার ফলস্ব পালি বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হইয়াছেন, তাহা যে কে নিঃসন্দেহে নির্ভুল ও খাঁটি সত্য, তাহা বলা বাহুল্য ; এবং তাহার এই সিদ্ধ গুলির প্রতিবাদ করিতে দ্বিতীয় কোন পণ্ডিতের সাধ্য ও যোগ্যতা নাই।

মিসেস্ রাইজ্ ডেভিড্স তাঁহার "Gotama, the Man", "Sak origins" এবং "Manual of Buddhism" এই তিনখানি গ্রন্থে, বিশেষ শেষখানিতে হীনযানের মূল সত্যগুলি ইতিহাসের আলোকে ও ভারতীয় চিন্ত সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এমন সুন্দর ভাবে সমাবেশ করিয়াছেন যে, পা দর্শন অধ্যয়নার্থীর পক্ষে তাহা অতিশয় আবশ্যক। পালি-সাহিত্যরূপ অ সাগরের মধ্যে তাঁহার এই পুস্তকখানি দিক্-নির্ণয় যন্ত্রের মত সহায়ক হইবে কারণ অধিকাংশ লোকই স্বাধীন ভাবে অধ্যয়ন করিতে যাইয়া হীনযান সম্ব একটী ভুল ধারণা করিয়া বসিয়াছেন। ভারতীয় চিন্তাজগতের এক অবিচ্ছে অঙ্গরূপ পালি চিন্তা অধ্যয়ন না করিলে বিকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হও স্বাভাবিক। পালি ত্রিপিটক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বুদ্ধ ঘোষ কর্তৃক সিংহ মাতালের 'আলু বিহারে' লিখিত হয়।

বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে সিংহলে আসিয়াছে, সিংহল হইতে শ্যামে ও দেশে গিয়াছে। কিন্তু উহা সিংহল হইতে ভারতে যায় নাই। কাজেই ৱতীয় দর্শনের আলোকে, বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনা না করিলে পূর্ণকে অবহেলা ৱিয়া অংশ গ্রহণের ন্যায় সে প্রচেষ্টা পণ্ড হইবে। বৌদ্ধধর্ম বহির্ভারতে উৎস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। ডাঃ রাইজ্‌ ভিড্‌স পালি ত্রিপিটকের ২৮ খানি প্রধান গ্রন্থ টীকা, টিপ্পনী ও চূর্ণী সহ লোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, বুদ্ধবাণী এত বিকৃত, বিমিশ্রিত ও বিরুদ্ধ বাপন্ন হইয়াছে যে, বুদ্ধবাণীর ঐতিহাসিক মূল ভিত্তি খুজিয়া পাওয়া সাধারণ ক্ষার্থীর পক্ষে এখন কষ্টকর। ভারতীয় ভিত্তিতেই বৌদ্ধদর্শন গড়িয়া ঠিয়াছে আর বুদ্ধদেব নিজেই ছিলেন ভারতের সাধনার পরিপূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি। তরাং তাঁহাকে ভারতের আলোকেই বুঝিতে হইবে।

বুদ্ধদেব বেদ-বিদ্রোহী বা ব্রাহ্মণদ্বেষী ছিলেন না। তিনি বেদের কর্ম্ম-কাণ্ডের ীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি বৈদিক জ্ঞানমার্গ স্বীয় জীবনে পালন রিয়া জনসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। স্বীয় শ্রমণ শিষ্যদের হিত তিনি ব্রাহ্মণদিগকে সমান চক্ষে দেখিতেন। আর তিনি ব্রাহ্মণদের পদতলে সিয়াই ত বাল্যকালে ভারতীয় ধর্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শারীপুত্র, মৌদগল্যায়ন ও কাশ্যপ প্রভৃতি তাঁহার প্রধান শিষ্যগুলি ছিলেন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত াহ্মণ। তিনি হিন্দু ভাবেই ভূমিষ্ঠ ও প্রতিপালিত হন, এবং দেহত্যাগ করেন। দ্ধ ত আর বৌদ্ধ ছিলেন না। তিনি সর্ব্বতোভাবে হিন্দু সন্ন্যাসীর আদর্শ নিজ ীবনে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম প্রথমে হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক্‌ ভাবে ল না। যত দিন উহা ভারতে ছিল তত দিন উহা ভারতীয় ধর্ম্মের এক অংশ পেই ছিল। কিন্তু যখন হিন্দু ভারত ধর্মে ও দর্শনে প্রসার লাভ করিয়া দ্ধদেবের নববাণী অঙ্গীভূত করিয়া লইল এবং বুদ্ধ-বাণী বহির্ভারতে প্রচারিত ইল, তখনই ভারতের সকল প্রদেশেই বৌদ্ধধর্ম নামে একটী পৃথক ধর্মের সৃষ্টি ইল। ভারতের উদার ও বিশাল বক্ষে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মমতেরই স্থান আছে। র্ত্তমান ভারতেই যখন তাহা সম্ভব, প্রাচীন ভারতে তাহা আরও অধিকভাবে

সম্ভবপর ছিল। ইহুদী ধর্ম্ম ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মধ্যে যে পার্থক্য বা সম্বন্ধ, হিন্দু বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে ঠিক তাহাই। তবে ইহুদীগণ ভগবান ঈশাকে ক্রুশবিদ্ধ পরিত্যাগ করিলেন; আর হিন্দুগণ বুদ্ধদেবকে দেবমানব জ্ঞানে পূজা করি হৃদয়ে রাখিলেন। যদি হিন্দুধর্ম মূল ও কাণ্ড হয় বুদ্ধবাণী তাহার শাখা প্রশাখা মাত্র। বৌদ্ধধর্ম্মকে তাই জনৈক মহাপুরুষ ভারতীয় ধর্ম্মের 'বিদ্রোহ শিশু' বলিয়াছেন।

পালিগ্রন্থ বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমগ্র শাস্ত্র নহে; সুতরাং পালি সিদ্ধান্তগুলির বৌ ধর্ম্মের সার বা শেষ কথা নহে। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের অধিকাংশ পুস্তক সংস্কৃতে বর্ত্তমান। আর মহাযানের সহিত হিন্দু বেদান্তের অদ্ভুত সাদৃশ্য থেরাবাদীগণ মুখে যতই বলুন না কেন যে, তাঁহারা নাস্তিক—সিংহল, ব্রহ্মদে বা শ্যামে গিয়া প্রত্যক্ষ দেখিলে বোঝা যায়, জনসাধারণ বুদ্ধদেবকে ঈশ্বর পূজাই করে হিন্দুদের মত এবং ফুলচন্দন, ধূপধূনা, ফল ও অন্যান্য নৈবে দিয়া পূজা করে ও ভোগ দেয়। তবে তফাৎ এই, হিন্দুগণ নিবেদিত নৈবেদ্যে প্রসাদের সবই নিজেরা গ্রহণ করে; কিন্তু বৌদ্ধগণ ঐগুলি পশু-পক্ষীদে মধ্যে বিতরণ করিয়া দেয়। পালিতে বুদ্ধদেবের একটী নাম বোধিদেব আর মহাযানীগণ ত বুদ্ধকে অতিমানব অবতার জ্ঞানেই পূজা-আরাধনা করি থাকেন। বুদ্ধদেব উপনিষদোক্ত মূল সত্যগুলি জনসাধারণের উপযোগী করি প্রচার করিয়াছিলেন মাত্র। বুদ্ধের মত মহামানবগণের লোকসংগ্রহার্থ আগম কাজেই তাঁহারা কোন কিছু ভাঙ্গেন না। তাঁহাদের জীবনের মিশন ছিল গঠনমূলক কার্য্য। বুদ্ধদেব শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মকে দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনে আনিয়া স্থ দিলেন। তাই তিনি ধর্ম্মসংক্রান্ত দার্শনিক প্রশ্নগুলিতে মাথা না ঘামাইয়া ধর্ম্মে কিরূপে জীবনে পরিণত করিতে হইবে তাহা পালন ও প্রচার করিয়া গেলেন অর্হৎ তথাগত সম্যক্ সম্বুদ্ধ স্বীয় ধর্ম্মকে মন্দিরে বা পুস্তকে নিবদ্ধ না রাখি জীবনে জীবন্ত করিয়া তুলিলেন।

উপনিষৎ মন্ত্রই বুদ্ধ-মন্ত্র। হিন্দুর পরমার্থ, অবিদ্যা প্রভৃতি শব্দগুলি হুবহু বৌদ্ধ শাস্ত্রে সৌগতগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। উপনিষদে মানু

গুণ সৎস্বরূপের উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে, আর বুদ্ধদেব মানুষের গুণ ভাব-স্বরূপের বর্দ্ধমান আত্মার উপর জোর দিলেন। তিনি অনাত্মা বলিতে ই প্রকাশ করিতেন যে, রূপ, নাম, ও জগতের দ্রব্যরাজি অনাত্মা ও অনীশ্বর; স্তু তাই বলিয়া তিনি পরমাত্মাকে কোথাও অস্বীকার করেন নাই। হিন্দু স্ত্রে যেমন জীবাত্মাকে পরমাত্মার প্রতিবিম্বরূপে বলা হইয়াছে ও জীবাত্মার নন্ত অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া সান্ত অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে, তেমনি বুদ্ধদেব নবাত্মার জীবত্ব অস্বীকার করিয়া ঈশ্বরত্বই আরোপ করিয়াছেন। তিনি াত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব থাকিতেন; এই জন্যে নয় যে, তিনি নাস্তিক, নাত্মবাদী বা সন্দেহবাদী ছিলেন। পরন্তু এই সকল পারমার্থিক বস্তুর উপলব্ধি তীত বাক্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়; তাই তিনি মৌন থাকিতেন। তাঁহার ৌভাব অনুভূতিলব্ধ ও ভাবপূর্ণতার ফলে প্রসূত।

উদানে আছে, একবার বুদ্ধদেবের জনৈক শিষ্য তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন মাধি বা নির্ব্বাণের অনুভূতির বিষয় স্পষ্টভাবে তাঁহাকে বলিয়া দিতে হইবে। থাগতকে ঈশ্বর বা আত্মা সম্বন্ধে কেহ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ান উত্তর দিতেন না। যদি কোন শিষ্য বলিতেন, তবে কি ঈশ্বর বা াত্মা নাই? বুদ্ধদেব উত্তর দিতেন, 'আমি কি বলিয়াছি, নাই?' আবার দি কেহ 'মৌনং সম্মতিলক্ষণং' মনে করিয়া বলিতেন, 'তবে কি ঈশ্বর ও াত্মা আছেন?' বুদ্ধদেব বলিতেন, আমি কি বলিয়াছি, আছে?' যাই হাক উপরি উক্ত উদান-কথিত শিষ্যটী 'নাছোড়বান্দা' হইয়া তথাগতকে নির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, "ভিক্ষু, যদি অসৃষ্ট, অজাত, অবিকৃত । অসংস্কৃত বস্তু কিছু না থাকে—তবে সৃষ্ট, জাত, বিকৃত ও সংস্কৃত সংসার ইতে মুক্তিলাভের যে কোন উপায় থাকিবে না।" নবীন ভারতে হীনযান বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনাত্মবাদ ও নিরীশ্বরবাদ আবার মাথা তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। িংহলী বৌদ্ধগণ আবার ভারতে নির্ব্বাসিত ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া বৌদ্ধরাজ স্থাপনে যত্নশীল। এই সময়ে হিন্দুদের পক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সারতত্ত্বগুলি ানিয়া রাখা আবশ্যক। হিন্দু ভারত বুদ্ধকে গ্রহণ করিবে; কিন্তু থেরাবাদের

বিকৃত বুদ্ধ-বাণী অর্থাৎ অনাত্মবাদ ও নাস্তিকবাদ আদৌ গ্রহণ করিবে : বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ যেন ভুলিয়া না যান, হিন্দু ধর্ম্ম-বিরোধী এই দুইটি বাদ প্রা করার জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল।

নাটেলাই রকোটফ সাহেব তাঁহার "Foundations of Buddhist নামক গ্রন্থে বলেন যে, বুদ্ধবাণী বৌদ্ধ ধর্ম্মে নিবদ্ধ নহে। ধর্ম্মের গভ অনুভূতিসমূহ সাধারণের প্রকাশ করিলে তাহা বিকৃত হইবে। তাই তথা' আধ্যাত্মিক বিষয়ে মৌনভাব অবলম্বন করিতেন। একদা কৌশা শিংশপাবনে তথাগত উপরিস্থ বৃক্ষ হইতে কয়েকটী পাতা আনিয়া সমা' শিষ্যদের বলিলেন, "বৃক্ষোপরিস্থ পাতাসমুহের তুলনায় যেমন আমার হা' পাতাগুলি অতি সামান্য, তেমনি হে ভিক্ষুগণ, আমি যাহা তোমাদের নি বলিযাছি উহা যাহা নিজে অনুভূতি করিয়াছি তাহার তুলনায় যৎকি মাত্র।" তাঁহার তিন প্রকারের শিষ্য ছিল; একদল অন্তরঙ্গ, অপব সঙ্ঘের সমস্ত ভিক্ষু এবং তৃতীয় দল সঙ্ঘের বাহিরের ভক্তগণ। বুদ্ধ 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' বা ক্ষণিকবাদকে একটী চক্রের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলে বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এইরূপ ভাবটী পাওয়া যায। শ্বেতাশ্বতর উপনি 'ব্রহ্ম-চক্র' শব্দটী দেখা যায। বৌদ্ধ যুগের প্রথমেও 'ভাব-চক্র' 'ধর্ম্ম-চ শব্দগুলি ব্যবহৃত হইত। হাভেল সাহেব তাঁহার "Ideals of Indian A পুস্তকে বলেন যে, বৈদিক ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞের সহিত সামগান করিবার স একটী চক্র ডান দিকে ঘুরাইতেন। তাহা হইতেই বৌদ্ধ ধর্ম্মে 'ধর্ম্মচক্রপ্রব শব্দটী আসিয়াছে! মহাযান ও বেদান্তের মধ্যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বিদ্যমা পরিভাষার পার্থক্য বাদ দিলে উভয় দর্শনই এক। বেদান্তে যেমন বলে এক পরমাত্মার প্রতিবিম্ব স্বরূপ বহু জীবাত্মা, তেমনি বসুবন্ধু ও অশ্ব বলেন যে, এক বিশ্বমনের বহু অংশ এই ব্যষ্টি মানব মনসমূহ। শান্তি "বোধিচর্য্যাবতারে" বলেন যে, বুদ্ধদেবের ত্রিকায় আছে, যথা ধর্ম্মক সম্ভোগকায় ও নির্ম্মাণকায়। এই ধর্ম্মকায় বেদান্তের ব্রহ্মের ন্যায় নিগু নির্ব্বিশেষ, সম্ভোগকায় ঠিক ঈশ্বরের ন্যায় সগুণ ও সবিশেষ এবং নির্ম্মাণ

মানব শরীরধারী বুদ্ধ অর্থাৎ অবতার। শান্তিদেব তাঁহার 'শিক্ষাসমুচ্চয়' গ্রন্থে বলেন যে, সত্য দুই প্রকার, পারমার্থিক ও সম্বৃত্তি সত্য। সত্যের এই দুই বিভাগ উপনিষদোক্ত পারমার্থিক ও ব্যবহারিক সত্যের ন্যায়।

সার এস. রাধাকৃষ্ণান্ বলেন যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মোক্ত চারিটী প্রধান সত্যের সহিত সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্যের খুব সাদৃশ্য আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবিদ্যা, সংস্কার, অবিজ্ঞান, নামরূপ, সদায়তন, প্রতীত্য সমুৎপাদ প্রভৃতি সাংখ্যের প্রধান, বুদ্ধি, অহঙ্কার, তন্মাত্রা, ইন্দ্রিয় ও প্রত্যয়সংঘের ন্যায়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের জেন শাখাটী পাতঞ্জল যোগের বিভিন্ন নামমাত্র। যোগের ধ্যান শব্দটীকে পালিতে 'ঝান', চীনে 'চান' এবং জাপানে 'জেন' বলে। কার্পেণ্টার সাহেব তাঁহার "Buddhism and Christianity" নামক গ্রন্থে বলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মের ধ্যানগুলি রাজযোগ হইতে গৃহীত। পাতঞ্জল প্রাণায়ামকে পালিতে আনাপান সতী বলে। সার এইচ. এস. গৌর তাঁহার Spirit of Buddhism" নামক গ্রন্থে বলেন যে, সাংখ্য ও বৌদ্ধ দর্শন যেন দুইটী স্রোতস্বতীর মত বেদান্ত-নদীতে মিশিয়া পরে তীর উছলিয়া খানিক দূর গিয়া আবার একই নদীতে পতিত হইয়াছে। ব্রহ্মার যেমন শক্তি সরস্বতী তেমনি আদিবুদ্ধ ও অবলোকিতেশ্বরের শক্তি যথাক্রমে প্রজ্ঞাপারমিতা ও মঞ্জুশ্রী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব হিন্দুর এই ত্রিত্ববাদ বৌদ্ধ ধর্ম্মের বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঙ্ঘে পরিণত হইয়াছে।' বৌদ্ধ ধর্ম্মের উভয় শাখা এই বিষয়ে একমত যে, মানব মাত্রেই অব্যক্ত বুদ্ধ। আর উপনিষদে আছে, 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি'—ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মই হইয়া যান এবং আত্মা মাত্রই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বুদ্ধ ও ব্রহ্ম প্রায় সমানার্থ বাচক। জাপানের বিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার সুজুকি বলেন, "জাপানস্থ বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান দুটী শাখার অন্যতম শিংগন মহাবৈরোচন সূত্র এবং বজ্রশেখর সূত্রের উপর স্থাপিত এবং কোবো দৈশি নামক ভিক্ষু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহার মতে মানিশেনই সত্য। অর্থাৎ সত্য একই, বহু নহে।" ইহা ঠিক ঋগ্বেদের 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'র ন্যায়। এই শিংগন ধর্ম ঠিক বেদান্তের অনুরূপ। বেদান্তে যেমন আছে যে, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—তেমনি শিংগনের মত সর্ব্ব

প্রাণী, মানব ও জন্তুর অন্তরে এই এক ধর্ম্মকায় বুদ্ধ বিরাজমান। নির্ব্বা
লাভ করার অর্থ এই যে, বুদ্ধত্ব লাভ করা, সম্বুদ্ধ হওয়া। বুদ্ধ ধর্ম্মের বো
এবং 'বেদান্তের চিৎ একার্থবাচক। ধর্ম্মপদে আছে, 'নির্ব্বাণং পরমং সুখং'-
আবার বেদান্তেও বলে, 'আনন্দং ব্রহ্ম'—ভূমানন্দ লাভই ব্রহ্মানুভূতি। বস্তু
উপনিষদিক সমাধি এবং বৌদ্ধ নির্ব্বাণ একই তুরীয় অবস্থার বিভিন্ন নামমাত্র।

ভিক্ষু সাইকো প্রতিষ্ঠিত এবং সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরিকের উপর স্থাপিত জাপানে
টেণ্ডাই শাখার মতে বহুর পশ্চাতে একাত্মানুভূতিই নির্ব্বাণ। সেই পরমা
সৎ এক, কখনও বহু নহে। ইন্দ্রিয়-দৃষ্টিতে তাহা বহু প্রতিভাত হয়
জাকোবি সাহেব বলেন, "গৃহহীন সন্ন্যাসের আদর্শ বুদ্ধদেবের নবাবিষ্কা
নহে ; খ্রীষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে ভগবান বুদ্ধদেবের অনেক পূর্ব্বেও ইহা ভারত
সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।" হাভেল সাহেব বলেন, বুদ্ধ প্রচারিত আর্য্য অষ্ট মা
বুদ্ধের পূর্ব্বেও ভারতে ছিল। 'অষ্টমার্গ' কথাটীও সুরক্ষিত আর্য্য উপনিবেশে
আটটী ফটক হইতে গৃহীত। বৌদ্ধ সঙ্ঘের নিয়মগুলিও ব্রাহ্মণশাস্ত্র হই
আনীত। বৌদ্ধ স্তূপবাদ—যাহা হইতে বৌদ্ধ জগতে অসংখ্য ডাগোবা
পাগোডার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বৈদিক যজ্ঞবেদী হইতে গৃহীত হইয়াছে
এই স্তূপ মৃত আর্য্য অধিপতিগণের মনুমেণ্ট। ডাগোবা অর্থে ধাতুগর্ভ
বৌদ্ধস্তূপ আরাধনা আর্য্য বৈদিক শ্রাদ্ধের ভিন্ন সংস্করণ মাত্র। আর বৌ
ও বৈদিক যুগেও সন্ন্যাসীরাই সমাজের গুরু ও নেতা ছিলেন।" ডাঃ রাই
ডেভিড্‌স ও জাকোবী সাহেব উভয়ে একমত যে, বৌদ্ধ দর্শন সাংখ্যের টী
ও টিপ্পনি মাত্র।

অশ্বঘোষ তাঁহার 'বুদ্ধ-চরিতে' বলেন যে, বুদ্ধদেবের জন্মস্থান কপিলবা
সহরটী সাংখ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কপিল মুনির স্মরণার্থে স্থাপিত হইয়াছে
ওয়েবার সাহেব বলেন, কপিল মুনি ও গৌতম বুদ্ধ সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি
ছিলেন। উইলসন সাহেবের মতে বৌদ্ধ দর্শনের অনেকগুলি মত সাংখ্য হই
গৃহীত। এমন কি, বুদ্ধদেব নিজে পূর্ব্বাচরিত বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানগুলি
হস্তক্ষেপ করেন নাই। একদা শৃগাল নামক জনৈক ব্যক্তি পৈতৃক অনুশাস

য় দিক মন্ত্রপূত করিয়া কোন অনুষ্ঠান করিতেছিল। বুদ্ধদেব তাহা দেখিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা না করিয়া বা তাহার অনুষ্ঠানগুলির সমালোচনা না করিয়া এইগুলির গুহ্যার্থ বলিয়া দিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন যে, সৎ কর্ম এবং ২ৎ চিন্তাই উহার ভাবার্থ। বৌদ্ধ ধর্মের কর্মবাদ ও পুনর্জন্মবাদ উপনিষদ হইতে গৃহীত। পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করিলেই জন্মমরণশীল একটী মানবাত্মা স্বীকার করিতে হয়। বুদ্ধদেব নিজে তাঁহার বহু পূর্ব্ব জন্ম স্মরণ করিতে পারিয়াছিলেন। যদি সংসরণশীল আত্মা এক না হয়, বা কর্মফল ভোক্তা জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করা হয়, তবে পুনর্জন্মবাদ ন্যায-সঙ্গত হয় না। বেদান্তে যেমন জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তির কথা আছে, তদ্রূপ বৌদ্ধধর্মেও নির্বাণ ও পরিনির্বাণের উল্লেখ আছে। ফলতঃ মুক্তি ও নির্বাণ একই অবস্থা।

নাগার্জুন 'মাধ্যমিক কারিকা'তে নির্বাণ ও পরিনির্বাণকে জনশূন্য গ্রাম ও ভস্মীভূত গ্রামের সহিত তুলনা করিযাছেন। নির্বাণে সর্ববাসনা-মুক্তি লাভ হয়। সিদ্ধ শস্যের যেমন আর অঙ্কুরোদ্গম হয় না, তেমনি বাসনাহীন নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি আর জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয় না। তাহার সংস্কারের 'পুঁটলিটি' ভস্মীভূত হয়। নিবাণ সমাধির ন্যায় 'অবাঙমনসগোচরম্' অবস্থা। উপনিষদেও আছে, 'মৌনমেব ব্রহ্ম'—ব্রহ্ম অনির্বচনীয ও ধ্যানগম্য।

শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে একটী বৈদিক আখ্যায়িকা বলিয়াছেন। একদা কোন শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্রহ্ম কি?" গুরু মৌন রহিলেন। শিষ্য দুই তিন বার প্রশ্নটী কবিলে গুরু বলিলেন, "আমি তোমাকে বলিয়াছি, ব্রহ্ম কি, কিন্তু তুমি বুঝিতে পার নাই। ব্রহ্ম বাক্যমনাতীত।" বৌদ্ধ শাস্ত্রেও ঠিক এইরূপ একটী গল্প আছে। একবার মঞ্জুশ্রী বিমলকীর্ত্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নির্বাণ কি?' তিনি কিছু না বলিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন। তখন মঞ্জুশ্রী আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "বিমলকীর্ত্তি, তুমিই নির্বাণানুভূতি লাভ করিয়াছ। বাক্যে নির্বাণ প্রকাশ করা যায় না।" শ্রীরামকৃষ্ণ একবার বলিয়াছিলেন, "ব্রহ্ম ব্যতীত দুনিয়ার সব বস্তুই মানব মুখে উচ্ছিষ্ট হইয়াছে—ব্রহ্মকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে নাই। উহা মূকের আনন্দ প্রকাশের মত

অসম্ভব।" মোক্ষমুলার ও চাইল্ডারস সাহেব পালি শাস্ত্র তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিয়াছেন যে, কোথাও নির্বাণকে শূন্য রূপে ব্যাখ্যা করা হয় নাই। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে আছে, পরিনির্বাণ লাভের প্রাক্কালে ভগবান বুদ্ধ যে সকল সুন্দর স্থান নিজে ভ্রমণ করিয়াছিলেন সেই সব স্মরণ করিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন 'আহা, রাজগৃহ কি সুন্দর, বৈশালী কি সুন্দর!' ইত্যাদি। আনন্দ একবার তথাগতকে বলেন যে, "ভগবান্, সুন্দরের চিন্তা, সুন্দরের সংসর্গ, এবং সুন্দরের (lovely) স্মৃতি ধর্মজীবনের অর্দ্ধেক।" ভগবান তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া বলিলেন, 'আনন্দ, উহা ধর্ম-জীবনের অর্দ্ধেক, এ কথা বলিও না, উহা ধর্মজীবনের সম্পূর্ণ। এ. ওর্স্‌লে (Worsley) সাহেব তাঁহার "Concepts of Monism" পুস্তকে সত্যই বলিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব যদি যৌবনে দুইজন বেদজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞানীর পূত সঙ্গ লাভ করিতেন তবে প্রাচ্যের পুরাবৃত্ত নূতন আকার ধারণ করিত।

আমরা উপরে যাহা বর্ণনা করিলাম—তাহা স্বকপোলকল্পিত বা মনগড়া নহে। ডাঃ রাইজ্‌ ডেভিড্‌স্‌ ও এডমণ্ড হোম্‌স্‌ প্রভৃতি বিখ্যাত বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদ্‌গণ যাহা যাহা সমস্ত জীবন অধ্যয়ন ও গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলাম। বুদ্ধদেব অনাত্মবাদ বা নিরীশ্বরবাদ প্রচার করেন নাই; তিনি উপনিষদোক্ত আর্য্যধর্মই জনসাধারণের নিকট প্রাঞ্জল ভাষায় বলিয়াছেন। আমার মনে হয়, ডাঃ রাইজ্‌ ডেভিড্‌স্‌ বৌদ্ধ জগৎকে এই গবেষণা প্রকাশের দ্বারা অনাত্মবাদ ও নাস্তিক্যবাদরূপ নরক হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

চার

ভগবান্ বুদ্ধদেব *

ভগবান্ বুদ্ধদেব যখন আবির্ভূত হন, তখন ভারতের ধর্ম্ম-গগন বহুবিধ বিরুদ্ধ তবাদে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছিল এবং কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি সাধারণের আস্থা দেহবাদ ও ভ্রান্ত অজ্ঞেয়বাদে দোলায়মান হইতেছিল। একপক্ষ শাশ্বতবাদ অপর পক্ষ উচ্ছেদবাদ সমর্থন করিয়া সমাজে এক তুমুল নাস্তিক আন্দোলন ষ্টি করিল; ইহাতে জনসাধারণ আত্মা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইল। সেই বিশৃঙ্খলা বিপ্লব হইতে মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য যুগগুরু বুদ্ধদেব যুক্তিবাদের াশ্রয় গ্রহণ করেন। ভারতীয় ধর্ম্মজগতে যুক্তিকে শীর্ষস্থান প্রদানই তাঁহার শষত্ব; অবশ্য তাঁহার উপায়ান্তর ছিল না। অথচ মীমাংসকগণ কর্ম্মকে সর্ব্বময় রূপে ধর্ম্মজীবনে প্রতিষ্ঠা করিয়া সুফলের সঙ্গে সঙ্গে যে কুফল পাইয়াছিলেন া অনেকেই জানেন। ইহার দ্বারা ভগবান্ বুদ্ধদেব সমাজের সাধন-স্রোত বিপরীত মুখে প্রবাহিত করিলেন।

ধর্ম্মসাধনে সাধারণতঃ লোকে আচার্য বা ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া চেষ্টার অন্ত করিয়া বসেন। প্রকৃত নির্ভরশীল বা কৃপাপ্রার্থী কখনও শচষ্ট হন না। নির্ভরতার কদর্থ করিয়া বিপদের সম্মুখে চক্ষু বুজিয়া থাকিয়া মরা অলসতারই প্রশ্রয় দেই। তাহাতে 'ইতো নষ্টঃ ততো ভ্রষ্টঃ' হয়, ব সাধনপথে অগ্রসর হইতে পারে না এবং ধর্ম্মের প্রতি তাহার অনাস্থা, শ্রদ্ধা জন্মে। এই জন্য বুদ্ধদেব আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব বিষয়ে কবারে নীরব রহিলেন এবং শিষ্যবৃন্দ ও ভক্তগণকে এই বিষয়ের বিতণ্ডায় া সময়ক্ষেপ না করিয়া যুক্তিবাদী ও বিচারশীল হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিলেন। হার দ্বারা তিনি মানুষকে ধর্মজীবনের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করিয়া সাধনে সদা

* "উদ্বোধন" মাসিকে ১৩৪৫ আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত ও স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক লিখিত।

সচেষ্ট হইতে বলিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে সফলতার সমস্ত দায়িত্ব সাধকের স্ব চাপাইয়া ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিলেন। মহানির্ব্বাণের সময় বুদ্ধদে তাই অন্তিম বাণী হইল, 'সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল হও'। আত্মা ও ঈশ্ব কথা বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে, কেহ করিবে না। সুতরাং মতদ্বৈধ অনিবা আবার যাঁহারা বিশ্বাস করে বলেন, তাঁহারা অনেকেই মুখস্থ কথা ব তাঁহাদের অনেকের বিশ্বাস ও কার্য্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজিযা পাওয়া যায় না।

আত্মা ও ঈশ্বর ব্যতীতও ধর্ম্ম সম্ভব, এই অভিনব বাণী বুদ্ধদেব প্র করিলেন। আত্মা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস অনেকের আবশ্যক নাও হইতে প কিন্তু মানবমাত্রেরই ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা আছে। মানুষ আত্মা ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে পারে ; কিন্তু ধর্ম্মকে অস্বীকার কবিতে পারে কে দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইতে না চায় ? মৃত সন্তানেব উন্মাদিনী জ যখন বুদ্ধদেবকে ধরিয়া বসিলেন তাহার মৃত পুত্রকে পুনর্জীবন দান ক হইবে, তখন জ্ঞানী বুদ্ধ ঈষৎহাস্যমুখে মাতাকে যে গৃহে মৃত্যু প্রবেশ নাই সেইরূপ কোন গৃহ হইতে এক মুষ্টি সরিষা আনিতে আদেশ কবিে ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, মানব জীবনে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যে মনে প্রশ্ন উঠে, 'এই দুঃখত্রয় হইতে মুক্তির উপায় কি ?' এই প্রশ্নেব যে সনাতন সমাধান করিয়াছেন তাহা জগতে অতুলনীয়। জগতের যুগাচার্য্যই এইরূপ অদ্ভুত বাণী মানব জাতিকে শোনাইতে পারেন নাই।

'কণ্টকেনৈব কণ্টকং' অর্থাৎ কাঁটা দিয়াই কাঁটা তুলিতে হয়। অনাত্মবাদ ও নাস্তিকবাদ অবলম্বন করিয়াই দুঃখনাশের উপায় আবি করিলেন। দুঃখের কারণ বাসনা। এই বিষয়ে বেদ ও বৌদ্ধশাস্ত্র স একমত। কিন্তু বাসনানাশের উপায় উভয়ের একবারে বিপরীত। বাস আশ্রয় হইতেছে আত্মা (জীবাত্মা)-র অস্মিতা বা অহংভাব। বেদান্ত ম জীবাত্মা ছায়ার ন্যায় অলীক। আর পরমাত্মা আছে কি না সেই বিষয়ে বুদ্ধ মৌনাবলম্বনই করিয়াছেন। তাই তিনি অনাত্মবাদ প্রচার করিে তাঁহার মতে আত্মা (জীবাত্মা) প্রজ্ঞপ্তিসৎ (Idea) মাত্র, দ্রব্য-সৎ বা বস্তু

ntity) নহে। রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংস্কার ও সংজ্ঞা এই পঞ্চ স্কন্ধের সমষ্টি সংহতিই এই শরীর। প্রত্যেক স্কন্ধও যে আত্মা নহে তাহা 'রূপ' স্কন্ধ রা বুদ্ধদেব এইভাবে উপদেশ দিতেন, "রূপম্ অনাত্মা", আত্মা রূপ নহে। নয় পিটকের 'মহাবগ্‌গ' নামক গ্রন্থে ভগবান্ বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদিগকে পদেশ দিতেছেন যে, এই পাঁচটী স্কন্ধের কোনটীই আত্মা নহে।

আত্মা আছে বিশ্বাস করিলে 'অহঙ্কার' কিছুতেই যায় না। এই অহং বলম্বন করিয়া কামনা উৎপন্ন হয়। তাই নাগার্জুন বলিয়াছেন, "যঃ পশ্যতি াত্মানং তস্যাহম্ ইতি শাশ্বতস্নেহঃ," অর্থাৎ 'যিনি আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী াহার 'আমি' এই শাশ্বত স্নেহ থাকে'। আর একটী বৌদ্ধ গ্রন্থে নিম্নলিখিত াকটী আছে—

"সাহংকারে মনসি ন শমং যাতি জন্মপ্রবন্ধঃ।
নাহংকারশ্চলতি হৃদয়াদাত্মদৃষ্টৌ চ সত্যাং॥"

অনুবাদ—অহংকার থাকিলে জন্ম-স্রোত বন্ধ হয় না। আত্মার ভাব াকিলে মন হইতে অহংকারও বিদূরিত হয় না।

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভাষ্যকার চন্দ্রকীর্ত্তি দ্বিতীয় বুদ্ধ নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিককারিকার উপর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। বেদান্তে যেমন গৌড়পাদ, বৌদ্ধ দর্শনে তেমনি াগার্জ্জুন। চন্দ্রকীর্ত্তি বলেন—

"সৎকায়দৃষ্টিপ্রভবানশেষান্
ক্লেশাংশ্চ দোষাংশ্চ ধিয়া বিপশ্যন্।
আত্মানম্ অস্যাবিষয়ং চ বুদ্ধা
যোগী করোত্যাত্মনিষেধমেব॥"

অনুবাদ—আত্মবিশ্বাস হইতে অশেষ ক্লেশ ও দোষ উৎপন্ন হয়, ইহা প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করিয়া এবং আত্মাই ইহাদের কারণ জানিয়া যোগী আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। বিখ্যাত বৌদ্ধ দর্শনাচার্য্য শান্তরক্ষিত বলেন, "অহংভাব দূর হইলে মুক্তিলাভ হয়। এই বিষয়ে নাস্তিকগণও এক মত। আত্মভাব থাকিলে অহংকার যায় না।"

ইহাই বৌদ্ধধর্মের নৈরাত্ম্যবাদ। এই নৈরাত্ম্যবাদ এই প্রকার পুদ্গলনৈরাত্ম্য ও ধর্ম্মনৈরাত্ম্য। আত্মা শব্দের ধাতুগত অর্থ স্বভাব এবং পুদ্গলে অর্থ—জীব, সত্ত্ব, পুরুষ বা আত্মা। পুদ্গলনৈরাত্ম্য অর্থে পুরুষের আত্মা না এবং আত্মা বস্তুসৎ নহে, উহা মরীচিকাবৎ কল্পনা মাত্র। ধর্ম=দ্রব্য বা পদার্থ আমাদের চতুর্দিকে যে সকল পদার্থ যথা—গাছ প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হ তাহাদের আত্মা নাই, ইহাই ধর্ম-নৈরাত্ম্য শব্দের প্রকৃত অর্থ। পদার্থের আ নাই, কারণ উহা কার্য্যকারণজাত অর্থাৎ প্রতীত্যসমুৎপাদের উপর নির্ভ করে। মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ পুদ্গলনৈরাত্ম্যকে পুদ্গলশূন্যতা বলেন।

নাগার্জ্জুন অনাত্মবাদের চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "র দগ্ধ হইলে যেমন রথের অংশগুলিও সঙ্গে সঙ্গে ভস্মীভূত হয়, তেমনি আত্মভা ত্যাগ করিলে 'আত্মীয়' বা 'মম' ভাবও সেই সঙ্গে বিলুপ্ত হয়।" তিনি মূ মাধ্যমিক কারিকার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

"আত্মন্যসতি চাত্মীয়ং কুত এব ভবিষ্যতি।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ শমাদাত্মাত্মীয়ত্বয়োঃ।
মমেতি অহং ইতি ক্ষীণে বহিরধ্যাত্মম্ এব চ।
নিরুধ্যতে উপাদানং তৎক্ষয়াৎ জন্মনঃ ক্ষয়ঃ॥
কর্মক্লেশক্ষয়াৎ মোক্ষঃ।"

অর্থাৎ 'আত্মা' না থাকিলে 'আত্মীয়' কোথা হইতে হইবে? 'আত্মা' 'আত্মীয়' ভাব শান্ত হইলে 'আমি' ও 'আমার' এই ভাব দূর হয়। বাহি ও অন্তরে 'আমি' ও 'আমার' ভাব দূর হইলে কাম, অসৎ দৃষ্টি, শীল, ব্র পরামর্শ এবং আত্মভাবাদি উপাদান নিরুদ্ধ হয়। উপাদান ক্ষয় হই জন্মক্ষয় এবং কর্ম্ম ও ক্লেশ ক্ষয় হইলে মুক্তি হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই একই উপদেশ দিয়াছে তিনি বলিয়াছিলেন যে, 'আমি' ও 'আমার' ভাব গত হইলেই মানুষ শাি অধিকারী হয়। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৭১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥"

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক স্পৃহাশূন্য হইয়া বিচরণ ন সেই 'আমি' ও 'আমার' ভাববর্জ্জিত ব্যক্তিই শান্তির অধিকারী হন।'

ভগবান্ বুদ্ধদেব যে অভিনব ধর্ম্ম বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সত্যই ।দ্ভুত। জগতের কোন ধর্ম্মগুরুই এইরূপ অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন ।তে পারেন নাই। তাই স্তোত্রকার বুদ্ধদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—

নান্যঃ শাস্তা জগতি ভবতো নাস্তি নৈরাত্ম্যবাদী।

নান্যস্তস্মাদুপশমবিধেস্তন্মতাদস্তি মার্গঃ॥

অর্থাৎ হে বুদ্ধদেব, জগতে কোন ধর্ম্মগুরু আপনার মত নৈরাত্ম্যবাদী নহেন। ১এব আপনার ধর্ম্মমত ব্যতীত অন্য মুক্তিমার্গ নাই।

এখন প্রশ্ন হইল, আত্মা না থাকিলে সুখদুঃখের ভোক্তা, শান্তি বা মুক্তির ধকারী কে হয়? 'মিলিন্দপন্হ' নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পালি গ্রন্থে রাজা লন্দ ভিক্ষু নাগসেনকে প্রশ্ন করিতেছেন, "মহাশয়, যদি আত্মা নাই ব সঙ্ঘের শ্রমণগণকে কে আহার ও বস্ত্রাদি দান করে? কে রুগ্ন ুকদিগের ঔষধ-পথ্য দান ও সেবাশুশ্রূষা করে? বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ ।ত্রিরত্নের শরণ কে গ্রহণ করে? কে ধ্যান করে এবং কেই বা নির্বাণ ভ করে?"

ইহার উত্তরে অনাত্মবাদিগণ দুইটী প্রধান যুক্তি প্রদান করেন। প্রথমটী য্য কারণ ভাব প্রতিনিয়ম', দ্বিতীয়টী 'ধর্ম্মসন্ততি'। প্রথম যুক্তির প্রকৃত র্থ এই যে, কার্য্য ও কারণের মধ্যে যে ভাব বা সম্বন্ধ আছে তাহা প্রতিনিয়ত (regulated), ইহার দ্বারাই আত্মা ব্যতীত সৃষ্টিস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। দ্ধ ধর্ম্মের প্রতীত্যসমুৎপাদ নামক যে মতবাদ আছে, প্রথম যুক্তিটী উহার ার প্রতিষ্ঠিত। 'প্রতীত্যসমুৎপাদ'কে 'ইদং প্রত্যয়তা' বা 'ধর্ম্মসংকেত'ও া হয়। প্রতীত্যসমুৎপাদের মতে কোন বস্তুর সৃষ্টি কারণ ও পারিপার্শ্বিক স্থার উপর নির্ভর করে। একটী ভাল বীজ বপন করিলে যদি রৌদ্র, জল ও মাটি অনুকূল থাকে, নিশ্চয়ই বীজ হইতে অঙ্কুর, পাতা, শাখা, ফুল ফল হইবে। উহাতে আত্মার মধ্যস্থতার কোন আবশ্যকতা নাই। কারণ,

বীজ মনে করে না যে, আমি অঙ্কুর সৃষ্টি করি এবং অঙ্কুরও মনে করে না আমি বীজ হইতে উদ্ভূত। পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এইরূপ কিছু ভাবে না।

এই ভাবের স্বপক্ষে শান্তিদেবের 'বোধিচর্য্যাবতারে' নিম্নলিখিত শ্লোক আছে।—

"ন চ প্রত্যয়-সামগ্র্যা জনয়ামীতি চেতনা।
ন চাপি জনিতস্থাপি জনিতোস্মীতি চেতনা॥"

অর্থাৎ সামগ্রী বা পারিপার্শ্বিক বস্তুর 'আমি সৃষ্টি করি' এই চেতনা ন এবং জনিত বস্তুর বা অঙ্কুরেরও চেতনা নাই যে, 'আমি জনিত'।

আবার অঙ্কুর স্বয়ংকৃত, পরকৃত, উভয়কৃত, ঈশ্বরকৃত বা প্রকৃতিকৃত ন কিংবা উহা কাল পরিণাম, এক কারণাধীন বা একেবারে অহেতুক ন প্রতীত্যসমুৎপাদ উচ্ছেদ, শাশ্বত ও সংক্রান্তি কোন বাদেরই পরিপোষক ন এইরূপে পঞ্চ স্কন্ধের সংহতি হইতে দেহান্তর সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির নিমিত্ত শর আত্মার উপস্থিতির কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভাষ্যকার বুদ্ধ তাঁহার বিখ্যাত 'বিশুদ্ধিমাগ্‌গ' নামক পালি গ্রন্থে অনাত্মবাদের সার সঙ্ক করিয়া নিম্নোক্ত পালি শ্লোকে এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।—

"দুখ্‌খ এব হি ন চ কোচি দুখ্‌খিতো
কারকো ন, কিরিয়া ন বিজ্‌জতি।
অত্‌থি নিব্বুতি, ন নিব্বুতো পুমা
মাগ্‌গম্ অত্‌থি, গমকো ন বিজ্‌জতি॥"

অনুবাদ—দুঃখই আছে, কিন্তু কেহ দুঃখিত ব্যক্তি নাই। কারক নাই; কি কার্য্য বিদ্যমান। নির্বাণ আছে, কিন্তু নির্বাণপ্রাপ্ত পুরুষ নাই। মার্গ আ কিন্তু মার্গের যাত্রী কেহ নাই।

অনাত্মবাদের দ্বিতীয় যুক্তি সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, উহা উপাদা অবিচ্ছিন্নতা (Continuity of Elements) মাত্র। ইহা ক্ষণিকবা পর্য্যবসিত হইয়াছে। পরের বস্তুটী পূর্ববস্তু অপেক্ষা ভিন্নও নহে, আবার এ নহে, "ন অন্যঃ ন চানন্যঃ।" 'মিলিন্দপনহ' গ্রন্থে রাজা মিলিন্দা ভিক্ষু নাগসেন

(পালিতে পন্‌হ) করিলেন, "যাহার জন্ম হয়, সে এক থাকে বা ভিন্ন হয় ?"
সেন বলিলেন, 'একও নহে, ভিন্নও নহে।'

প্রশ্ন—'উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিন।'

উত্তর—'মহারাজ, যখন আপনি শিশু ছিলেন, তাহা আর এই বয়োবৃদ্ধ
স্থা কি এক ?'

প্রশ্ন—'শিশু অবস্থা এক, আর বৃদ্ধাবস্থা অন্য।'

উত্তর—'যদি আপনি শিশু নন, তবে শিশু ও বৃদ্ধের মাতা পিতা কি ভিন্ন ?
বালক বিদ্যালয়ে যায় এবং যখন সে শিক্ষা সমাপ্ত করে, এই উভয়ের মাতা
ভিন্ন ? অপরাধী যুবক এবং শাস্তিপ্রাপ্ত যুবক কি ভিন্ন ?

প্রশ্ন—'নিশ্চয়ই নহে। তবে আপনি কি বলেন ?

নাগসেন বলিলেন, "আমি বলিব যে, আমি তখন শিশু ছিলাম, এখন বৃদ্ধ
যাছি। এই সকল বিভিন্ন অবস্থা একই শরীরের।" রাজা মিলিন্দা
াহরণ প্রার্থনা করিলে নাগসেন বলিলেন. 'মহারাজ, যদি কেহ একটী
ীপ জ্বালে তবে কি তাহা সমস্ত রাত্রি জ্বলিবে ?'

'হাঁ, জ্বলিতে পারে।'

'রাত্রির প্রথম প্রহর, দ্বিতীয় প্রহর ও অন্যান্য প্রহরের প্রদীপের শিখা
এক ?'

'না', ভিন্ন। তবে শিখা বিভিন্ন প্রহরে বিভিন্ন হইলেও প্রদীপ এক।'

তখন ভিক্ষু নাগসেন বলিলেন, 'ঠিক এইরূপেই মহারাজ, ধর্মসন্ততি দ্বারাই
কটীর জন্ম, অপরটীর মৃত্যু হয়। ইহাতে মনে হয়, যেন জন্ম-মৃত্যুর সম্বন্ধ
ছে।" রাজা মিলিন্দা পুনর্জন্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে নাগসেন বলিলেন, দেহ
মনেরই জন্ম ও মৃত্যু হয় মাত্র। ভিক্ষু তাঁহাকে একটী বিবাহিতা বালিকার
াহরণ দ্বারা বিষয়টী বুঝাইলেন। একটী বালিকাকে একজন বিবাহ করিয়া
লয়া যায়, পরে আর একজন বিবাহ করে। এই দুই ব্যক্তি ঝগড়া করিয়া
াদালতে উপস্থিত হইলে প্রথম ব্যক্তিই বালিকাকে স্ত্রীরূপে পাইল। কারণ,
ালিকার জন্ট অবস্থা ভিন্ন 'হইলে প্রথমাবস্থা হইতেই দ্বিতীয় অবস্থার উদ্ভব

হইয়াছে। নাগসেন বলিলেন, "মহারাজ, সেইরূপ দেহ-মনের সংহতি জ
এক এবং মৃত্যুতে অপর হইলেও প্রথম হইতেই দ্বিতীয় উৎপত্তি হয়।',

এই দুই যুক্তি দ্বারাই প্রধানতঃ অনাত্মবাদ স্থাপিত ও সুরক্ষিত হইয়াছে।

পাঁচ

বৌদ্ধ নির্বাণ ও ব্রহ্মনির্বাণ*

মহাস্থবির ধর্মরত্ন কর্তৃক অনূদিত "মহাপরিনিব্বাণ সুত্তং"খানি অতি সুন হইয়াছে। ইহাতে মূল পালি ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত। অনুবাদ পা টীকানুযায়ী হইলেও উহাতে প্রাঞ্জলতা অপেক্ষা আক্ষরিকতাই অধিক একশত পৃষ্ঠাব্যাপী পরিশিষ্টে কঠিন শব্দাবলী ও জটিল অংশসমূহের নাম-স্থ আছে। এই ভাবে সমগ্র পালি ত্রিপিটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হই বঙ্গভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি হইবে। ইতিমধ্যে ত্রিপিটকের হিন্দী অনুবাদ অনেক দূ অগ্রসর হইয়াছে।

'মহাপরিনিব্বাণসুত্তং'খানি সুত্তপিটকের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ এব 'দীঘনিকায়'স্থ মহাবগ্গের অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে ভগবান্ বুদ্ধের অন্তিম জীবনে শেষ দেড় বছরের ঘটনা এবং পরিনির্বাণের পর তাঁহার দেহসৎকার দেহাবশেষের সুব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ইহা সুত্ত-পিটকের উপাধি এবং বি. এ. অনার্স পরীক্ষার পাঠ্য। সর্বপ্রথম ইহার মূল লণ্ডন রয়া এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে অধ্যাপক চাইল্ডার্স দ্বারা প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক রাইজ ডেভিড্স এই সূত্রের ইংরাজী অনুবাদ সেক্রেড বুক্স অফ দি ইষ্ট সিরিজে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ টার্নার উক্ত মূল গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসা বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশ করেন। চীন ভাষায় মহাপরি

*'উদ্বোধন' মাসিকের ১৩৪৯ আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত ও স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক লিখিত।

র্ব্বাণসুত্তে'র অনুবাদ আট বার প্রকাশিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে র্ব চীন বংশের রাজত্বকালে ইহা চীন ভাষায় প্রথম অনূদিত হইয়াছিল। সিংহলে ও ব্রহ্মদেশে এই সূত্রের অনেক সংস্করণ বিদ্যমান। কলিকাতা নববিধান ব্রাহ্ম মাজ হইতেও এই সূত্রের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ বহু পূর্বে বাহির হইয়াছে।

এই সুত্ত গ্রন্থ ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে রাজা অজাতশত্রুর তি বুদ্ধের সপ্তবিধ রাজধর্মের উপদেশ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভিক্ষুদের প্রতি বুদ্ধের নুশাসন, বুদ্ধের নয় গুণ সংঘের নয় গুণ ও ধর্মের ছয়গুণ প্রভৃতি বর্ণনা, চতুর্থ ধ্যায়ে সুদীর্ঘ কাল সংসারাবর্তে পতনের হেতু এবং সংসার দুঃখ উপশমের পায় প্রভৃতি বর্ণনা, পঞ্চম অধ্যায়ে তথাগতের মহাপরিনির্বাণ শয্যায় শয়ন, ানন্দের রোদন এবং বুদ্ধ কর্তৃক সান্ত্বনা প্রদান, স্ত্রীজাতির প্রতি ভিক্ষুদের ্যবহার-বিধি প্রভৃতির বর্ণনা, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভিক্ষুদের পরস্পর সম্বোধন-বিধি, দ্ধের অন্তিম উপদেশ ও মহাপরিনির্বাণ প্রভৃতি বিষয়ের বিবৃতি এবং তীয় অধ্যায়ে অষ্ট প্রকার অরূপবিমোক্ষ বা ধ্যানের বর্ণনা আছে। কিরূপে সর্ব কার রূপ-সংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া অনন্ত আকাশের ধ্যান করিতে হয়, কিরূপে াকাশানন্ত্যায়তন অতিক্রমপূর্বক অনন্ত বিজ্ঞান ধ্যান করিতে হয় এবং কিরূপে বজ্ঞানানন্ত্যায়তন এবং উক্তরূপে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ সকল প্রকার ভাব জগৎ তিক্রম করিয়া নির্বাণলাভ হয় তাহা তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

এই বৌদ্ধ নির্বাণ কি তাহা মহাস্থবির গ্রন্থ পরিচয়ে বলিয়াছেন। তিনি লেন, "ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ব্রহ্মনির্বাণ বা ব্রহ্ম বিলীন হওয়া বুদ্ধের অরূপবিমোক্ষ র্বাণ হইতে স্বতন্ত্র কিছু।" সত্য কি তাহাই? আবার তিনি পরিশিষ্টে রিনির্বাণের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সর্বাধিক দুঃখের পরিনিবৃত্তিই রিনির্বাণ। পালিতে নির্বাণের বর্ণনা এই প্রকার আছে।—

পদমচ্চ তমচ্চন্তম সঙ্খতমনুত্তরং।
নিব্বানমিতি ভাসন্তি বানমুত্তা মহেসযা॥

অর্থাৎ তৃষ্ণা-মুক্ত বুদ্ধাদি মহর্ষিগণ অচ্যুত, অত্যন্ত অকার্যকারণ সঞ্জাত নুত্তর শান্তিপাদকে নির্বাণ নামে অভিহিত করেন।

ভগবান্ বুদ্ধ নির্ব্বাণের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।—

বিঞ্ঞাণস্‌স নিরোধেন তণ্‌হাক্খয বিমুত্তিনো।
পজ্জোতস্‌সেব নিব্বানং বিমোক্খো হোতি চেতসো॥

অর্থাৎ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-স্কন্ধ নির্বাণের মত তৃষ্ণা-বিমুক্ত জীবন্মুক্ত যোগী চরম বিজ্ঞান নিরোধের সহিত চিত্তের বিমোক্ষ হয়। নির্বাণে স্বকীয় অনা সংসার-প্রবাহের অবসান হয় এবং পঞ্চ স্কন্ধের চিরবিনাশ এবং জন্মমৃত্যু চির-নিরোধ ঘটে। অন্যত্র আবার বুদ্ধ বলেন, "নিব্বানং পরমং সুখং" অর্থ নির্বাণ পরম সুখময় অবস্থা বা পদ।

মহাস্থবির উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টের ১৭৯ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, "নির্বাণ দি দেশের অন্তর্গত নহে বলিয়া একান্ত শূন্য নহে। যদি নির্বাণ একান্ত শূন্য হই তাহা হইলে দুঃখময় সংসারের নিঃসরণ কখনও সম্ভব হইত না। নির্বাণ সর্বশূন্য নহে। জ্ঞানিগণ বলেন, "অত্থি নিববুতি...." অর্থাৎ নির্বাণ চিরদিনই আছে, চি ও থাকিবে। এই প্রকার শূন্যতারূপে নির্বাণ নিত্য, চিরবিরাজমান। বৌ নির্বাণ যেরূপ শাশ্বত ও শান্তিময় পদ ব্রহ্মনির্বাণও তদ্রূপ সনাতন সুখময় পদ

তাহা হইলে বৌদ্ধ নির্বাণ ও ব্রহ্মনির্বাণের পার্থক্য কোথায়?

ব্রহ্মনির্বাণ শব্দটি 'গীতা'তে ছয় বার পরিদৃষ্ট হয়—দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তশ্লোকে পঞ্চম অধ্যায়ের ২৪, ২৫ ও ২৬ শ্লোকে, ষষ্ঠ অধ্যয়ের ১৫শ শ্লোকে ব্রহ্মনির্বাণের অপর নাম ব্রাহ্মী স্থিতি। নিস্পৃহ, কামনাশূন্য, নির্মম নিরহঙ্কার চিরশান্তিময় অবস্থাকেই গীতায় ব্রাহ্মী স্থিতি বলা হইয়াছে। বৌদ্ধ নির্বাণ কি উক্ত ব্রহ্মনির্বাণ হইতে অন্য প্রকার? বৌদ্ধ ধর্মের "গীতা" 'ধর্মপদ' নামক প্রসিদ্ধ পালি গ্রন্থে নির্বাণের বর্ণনা ছয়টি স্থানে আছে।— যথা ২৩, ৩২, ৭৫, ১২৬, ১৩৪, ২০৪ এবং ২২৬ শ্লোকে। 'ধর্মপদ' মতে নির্বাণ 'অমৃতপদ' ও 'পরম সুখের আলয়' এবং নির্বাণ-প্রাপ্ত হইলে চিত্তে সকল প্রকার আস্রব বা মল দূরীভূত হয়। মহাস্থবির হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া তিনি বৌদ্ধ নির্বাণকে ব্রহ্মনির্বাণ বলিতে ভীত হন; নচেৎ বেদান্ত হইতে বৌদ্ধ ধর্মকে পৃথক্ রাখা যাইবে না। কিন্তু মহাযানী বৌদ্ধগণ এই ভীতিমুক্ত

হাযান-ভাস্কর নাগার্জুন তাঁহার 'মাধ্যমিক কারিকা' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের সুদীর্ঘ অন্তিম অধ্যায়টিতে নির্বাণের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে নির্বাণের বর্ণনা এই প্রকার—

অপ্রতীতম্ অসম্প্রাপ্তম্ অনুছিন্নম্ অশাশ্বতম্
অনিরুদ্ধম্ অনুৎপন্নম্ এব নির্বাণমুচ্যতে ॥

অর্থাৎ চরম বিজ্ঞান নিরোধের পর চিরসন্ততির যে অবস্থা হয় তাহা প্রতীতির অতীত। উহা কোন প্রকারে লভ্য নহে, কোন শাশ্বত পদার্থের উচ্ছেদ নহে, কোন ভঙ্গুর অবস্থার শাশ্বত ভাব প্রাপ্তিও নহে। ইহার নাশ নাই, যেহেতু ইহার উৎপত্তি নাই। এই সকল লক্ষণযুক্ত অবস্থাকে নির্বাণ বলে। ব্রহ্মনির্বাণ বা বৈদান্তিক মোক্ষও শাস্ত্রানুসারে আপ্য, সংস্কার্য্য, বিকার্য্য বিনাশ্য নহে। অর্থাৎ ব্রহ্মনির্বাণের প্রাপ্তি, সংস্কার, বিকার বা বিনাশ নাই। নির্বাণ শব্দটি বৌদ্ধগণ 'গীতা' প্রমুখ বেদান্ত শাস্ত্র হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন, পণ্ডিতগণের এই প্রকার অনুমান অমূলক নহে। সুতরাং বৌদ্ধ নির্বাণ ও ব্রহ্মনির্বাণ একই বিমুক্ত অবস্থার বিভিন্ন নামমাত্র।

'উদান' নামক পালি গ্রন্থ নিব্বাণের নিম্নোক্ত বর্ণনা দিযাছেন :—

যত্থ আপো চ পঠবী তেজো বায়ো ন গাধতি।
ন তত্থ সুকা জোতন্তি আদিচ্চো ন প্পকাশতি ॥
ন তত্থ চন্দিমা ভাতি তমো তত্থ ন বিজ্জতি।
যদা চ অত্তনা বেদী মুনি মোনেন ব্রাহ্মণো ॥
অথ রূপা অরূপা চ সুকদুক্খা প্পমুচ্চতি ॥

—বাহিযসুত্ত, বোধিবগ্গ, উদান।

অর্থাৎ অমৃতপদ নির্বাণে জল, পৃথিবী, তেজ ও বায়ুর অস্তিত্ব নাই। তথায় তারকাসকল জ্যোতিঃ দান করে না বা সূর্য্যও প্রকাশিত হয় না। তথায় চন্দ্রও কিরণ দেয় না ও অন্ধকারের প্রবেশ নিষিদ্ধ। রূপ ও অরূপ, সুখ ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ ধ্যানযোগে গভীর নীরবতার মধ্যে এই অবস্থা লাভ করেন।

মূল বেদান্ত শাস্ত্র উপনিষদে ব্রহ্মনির্বাণের যে বর্ণনা আছে তাহাও নি
উদ্ধৃত হইল।—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

অর্থাৎ ব্রহ্মপদে সূর্য, চন্দ্র বা তারকা উদিত হয় না। তথায় বিদ্যুতে
প্রকাশ নাই, অগ্নির তো দূরের কথা। তাঁহার অস্তিত্বে সকলের অস্তি
তাঁহার জ্যোতিতে সকলেই জ্যোতির্ময়।

বেদান্ত মতে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মভূত হন। সেইজন্য বেদান্তে ব্রহ্মপদ
ব্রহ্মনির্বাণের বর্ণনা একই প্রকার। বৌদ্ধ নিব্বাণের পালি বর্ণনা এবং ব
নির্বাণের সংস্কৃত বর্ণনা পড়িলে সত্যই মনে হয়, উভয় বর্ণনা একই অমৃত
বর্ণনা।

উপরি-উক্ত 'উদান' নামক পালি গ্রন্থের পাটলিগামীয় বর্গের নিব্বাণ সু
এই।—"অত্থি ভিক্খবে তদায়তনং, যত্থ নেব পঠবী ন আপো ন তেজো ন ব
ন আকাশানাঞ্চায়তনং ন বিঞ্ঞানাঞ্চায়তনং ন আকিঞ্চনাঞ্চায়তনং নায়ং লো
ন পরলোকো ন উভো ন চন্দিম সুরিয়া, তত্রাপহং ভিক্খবে নেব আগ
বদামি ন গতিং ন ঠিতিং ন উপ্পত্তিং অপ্পতিট্ঠং অনারম্ভণমেব তং এসেব
দুক্খস্সান্তি।"

"অত্থি ভিক্খবে অজাতং অভূতং অকতং অসঙ্খতং, নোচেতং ভিক্খ
অভবিস্স অজাতং অভূতং, অসঙ্খতং নায়িদং জাতস্স ভূতস্স, কত
সঙ্খতস্স নিস্সরণং পঞ্ঞায়তি।"

অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ, এমন এক অমৃতপদ আছে যেখানে পৃথিবী, জল, বায়ু
অগ্নির প্রবেশ নাই। তাহা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা শরীর ও মনের অগোচর
তথায় সূর্য বা চন্দ্রের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয় না। তাহা পরলোকও নহে
ইহলোকও নহে। তথায় আগতি বা গতি নাই। তাহার উৎপত্তি, স্থিতি

তষ্ঠা নাই। উক্ত অমৃতপদ কোন বস্তু হইতে অনুস্যূত ও কোন কিছুতে স্থিত নহে। কিন্তু তাহাতে সকল প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক অবসান ঘটে। ভিক্ষুগণ, এমন এক অমৃতপদ আছে, যাহা অজাত, অভূত অকৃত ও অসংস্কৃত। অজাত, অভূত, অকৃত ও অসংস্কৃত অমৃতপদ না থাকিত তাহা হইলে জাত, ভূত, কৃত ও সংস্কৃত পদরূপ সংসার হইতে নিবৃত্তি সম্ভব হইত না। জাত, অভূত, অকৃত ও অসংস্কৃত অমৃতপদ আছে বলিয়াই জাত, ভূত, কৃত সংস্কৃত সংসার হইতে নিবৃত্তি সম্ভব।"

পালি গ্রন্থোক্ত বৌদ্ধ নিব্বানের বর্ণনা এবং সংস্কৃত শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্ম-নির্ব্বাণের না তুলনা করিলে সুস্পষ্ট ও সন্দেহহীন এই প্রতীতি জন্মে যে, বৌদ্ধ নির্ব্বাণ ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ অভিন্ন অমৃতপদ, একই বাক্যমনাতীত তুরীয় অবস্থা। বৌদ্ধ র্বাণ ও হিন্দু সমাধি একই মোক্ষাবস্থা বা মুক্তিপদ।

ছয়

শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের পূতাস্থি*

সম্রাট অশোক খ্রীষ্টপূর্ব ২৭২-৭৩ অব্দে মগধ রাজ্যের সিংহাসন অধিকার রেন। তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ভারতের ভিতরে ও বাহিরে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইন এবং মোগল সম্রাট আকবরের সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে। তাঁহার সময় পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুসম্মেলন হয় এবং তাহাতে প্রায় এক হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু যোগ দেন। তিনি কাশ্মীর, গান্ধার, মহীশূর, রাজস্থান, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, হিমালয়, সিংহল, বর্ম্মা, চোলা ও পাণ্ড্য প্রভৃতি দেশে প্রচারক প্রেরণ করেন।

---

* ১লা মাঘ, শুক্রবার, ১৩৫৫ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত এবং ভিক্ষু অনোমদর্শী শ্রীরমেন দাসশর্ম্মা লিখিত প্রবন্ধদ্বয় হইতে সংকলিত।

কথিত আছে, তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে চুরাশি হাজার বৌদ্ধ ম
ও স্তূপ নির্মাণ করান। সেইগুলিতে তথাগতের দেহাবশেষ নানা স্থান হই
সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ সেই সময় তথাগতের দুই প্রধান শি
শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের দেহাবশেষ রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হই
সাঁচিতে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগে
প্রধান কর্মচারী জেনারেল কানিংহাম প্রাচীন বুদ্ধ স্তূপগুলি খনন করিয়া শারি
ও মৌদ্গল্যায়নের অস্থি-মঞ্জুষা আবিষ্কার করেন। যে স্তূপে উল্লিখিত দেহাব
আবিষ্কৃত হয় তাহা তৃতীয় সংখ্যক স্তূপ নামে প্রত্নতাত্ত্বিকের নিকট পরিচি
স্তূপের অভ্যন্তরে উত্তর-দক্ষিণে লম্বমান সমকোণী চতুর্ভুজাকার আধারের উ
ব্রাহ্মী লিপিতে শারিপুতস্ এবং উত্তর দিকস্থ আধারের উপর মহামোগ্গাল
কথা দুইটি ক্ষোদিত ছিল। এই প্রস্তরাধারের অভ্যন্তরে এক একটি শ্বেত
মসৃণ এক প্রকার খনিজ পদার্থ শোভিত দুইটি অস্থি মঞ্জুষা রক্ষিত ছি
মঞ্জুষার ঢাকনি দুইটিতে প্রাচীন সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যের সুন্দর নিদর্শন পাওয়া
এবং দুইটি ঢাকনির ভিতরে পুনরায় ব্রাহ্মী অক্ষরে শ ও ম লিখিত আ
শ ও ম যথাক্রমে শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের নামের আদ্যক্ষর।

এই পবিত্র অস্থি-মঞ্জুষা দুইটি ভারত হইতে লণ্ডনে প্রেরিত হয়, এবং ত
ভিক্টোরিয়া এ্যাণ্ড আলবার্ট মিউজিয়ামে প্রায় তেষট্টি বৎসর রক্ষিত ছি
১৯৩৯ খ্রীঃ ভারতীয় মহাবোধি সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ভারতবর্ষ, ত
বৌদ্ধ জগতের পক্ষ হইতে এই পবিত্র অস্থি লণ্ডন হইতে স্বদেশে আনি
জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করেন। এই বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ন্যায্য দা
গৃহীত হয় এবং তদনুসারে লণ্ডন হইতে এই পূতাস্থি ভারতে প্রেরিত হ
প্রথমে স্থির হইয়াছিল, রাজধানী দিল্লীতেই একটি নূতন বৌদ্ধ বিহারে
সংরক্ষিত হইবে। কিন্তু সাঁচি ভূপাল রাজ্যের অন্তর্গত এবং সাঁচিতেই
অস্থি দুই সহস্রাধিক বৎসর রক্ষিত ছিল। সেইজন্য ভূপালের নবাব সাঁচি
উক্ত অস্থি পুনরায় সংরক্ষণের দাবী জানান এবং সাঁচিতেই নূতন বৌদ্ধ বি
ও আশ্রম স্থাপনার্থ আর্থিক সাহায্যেরও অঙ্গীকার করেন। তাঁহার দাবী স্বী

লে সাঁচিতেই অস্থি-মঞ্জুষা সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু হঠাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ রম্ভ হওয়ায় লণ্ডন হইতে অস্থি আনয়নের পরিকল্পনা প্রায় সাত আট বৎসর গিত থাকে। ১৯৪৭ খ্রীঃ সিংহলস্থ মহাবোধি সোসাইটির সম্পাদক ভারতীয় াবোধি সোসাইটির প্রতিনিধিরূপে লণ্ডনে প্রেরিত হন। ভারত সরকারের হইতে তদানীন্তন ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স উক্ত অব্দের ২০শে ব্রুয়ারী লণ্ডনে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানান্তে মহাবোধি সোসাইটির সম্পাদককে পবিত্র দেহাস্থি সমর্পণ করেন। সেই বৎসর ১৪ই মার্চ উক্ত দেহাস্থি হলে আনীত হয়। সিংহলী বৌদ্ধগণ তথাগতের প্রধান শিষ্যদ্বয়ের প্রতি র্ঘ্য নিবেদনার্থ অস্থি-মঞ্জুষা কিছু কাল সিংহলে রাখিবার দাবী জানান। এই ী ভারত সরকার কর্তৃক সানন্দে গৃহীত হয়। সিংহলের তৎকালীন প্রধান এই পবিত্র দেহাস্থি জাহাজ হইতে সমুদ্রের তীরে আনয়ন করেন। ঃপর শোভাযাত্রা করিয়া এই অস্থি মঞ্জুষা কলম্বো মিউজিয়ামে আনীত হয়। শোভাযাত্রা প্রায় দেড় মাইল দীর্ঘ ছিল এবং তাহাতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ বৌদ্ধ নারী অনুগমন করেন। অস্থি-মঞ্জুষা সুবর্ণ আধারে রক্ষিত ও ভক্তিভরে ইত হয়। এরূপ অপূর্ব আড়ম্বরপূর্ণ সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা সিংহলের ইতিহাসে স্মরণীয় থাকিবে।

সিংহলবাসী বৌদ্ধগণের অনুরোধে এই অস্থি ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস ন্ত সিংহলেই রক্ষিত ছিল। ভারতে আনিবার পথে ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধগণের রোধে উহা রেঙ্গুনে প্রেরিত হয় এবং তথায়ও ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী ও সিডেন্ট প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পৌরোহিত্যে এক বিরাট বৌদ্ধসভা হয়। ৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী শুক্রবার ভারতের প্রধান মন্ত্রী বিভিন্ন দেশাগত দ্ধ পণ্ডিতগণের মিলন উৎসবে কলিকাতায় স্বহস্তে এই অস্থি সিংহলবাসীর ট হইতে গ্রহণ করেন এবং স্থানীয় মহাবোধি সোসাইটির প্রেসিডেন্টের স্ত সমর্পণ করেন। উৎসবান্তে এই দেহাস্থি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সাঁচির নবনির্মিত ারে স্থায়ীভাবে রক্ষিত হইয়াছে।

গ্রন্থ-পঞ্জী

১। বৌদ্ধধর্ম—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। বুদ্ধের জীবনী ও বাণী—শ্রীশরৎ কুমার রায়।

৩। Gospel of Buddha—Paul Carus

৪। The Light of Asia—Edwin Arnold

৫। The Story of the Buddha—Edith Holland

৬। The Life of the Buddha—L. Adams Beck

৭। Gautama the Buddha—S. Radhakrishnan

৮। শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা

৯। বুদ্ধ-বাণী—ভিক্ষু শীলভদ্র

১০। বৌদ্ধধর্ম—সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

১১। The Creed of Buddha—Edmond Holmes

১২। The Buddha—H. Oldenberg

১৩। Buddhism in Translation—H. C. Warren

১৪। উদান (বঙ্গানুবাদ)

১৫। ধর্মপদ (হিন্দি অনুবাদ)

১৬। মহাপরিনিব্বাণসুত্ত (বঙ্গানুবাদ)

১৭। American Lectures—T. W. Rhys Davids

১৮। The Parables of Buddha—Paul Carus

১৯। Imitation of Buddha

২০। Central Conception of Nirvan—Scherbatsky

২১। A Manual of Buddhism by R. S. Hardy

২২। Outlines of Mahayana by D. T. Suzuki

২৩। Questions of king Milinda (translated from Pa
T. W. Rhys Davids.

২৪। জাতক (ছয় খণ্ড) শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত।

২৫। Buddhist Anthology by Dr. Karl Eugen Neumann. Leyden, 1861.

২৬। Spirit of Buddhism by H. S. Gour

২৭। Foundations of Buddhism by Natalie Rokotoff.

২৮। বৌদ্ধধর্ম—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২৯। Buddha and the Gospel of Buddhism by Dr. Ananda Coomarswami.

৩০। Buddhism and Christianity—Dr. J. E. Carpenter

৩১। Buddhism by Mrs. Rhys Davids.

৩২। The Sakya or Buddhist Origins by Mrs. Rhys Davids

৩৩। Buddhist Essays by Dr. Paul Dahlke

৩৪। The Dialogues of Buddha by T. W. Rhys Davids.

৩৫। গৌতম বুদ্ধের জীবন ও উপদেশ—রামদাস সেন

সমাপ্ত

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত

কয়েকটি পুস্তক সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রের অভিমত

১। **নবযুগের মহাপুরুষ** (১ম ভাগ) মূল্য ৬৲ টাকা।

উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে "মাসিক বসুমতী" ১৩৫৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন। "নাস্তিকতার দুর্যোগে ধর্মজীবনের যখন নাভিশ্বাস ওঠে, তখন ঈশ্বরপ্রেরিত কোন না কোন কর্ণধার আবির্ভূত হন জ্যোতির্ময় ধ্রুবতারার মত দিশারী হয়ে। 'সম্ভবামি যুগে যুগে'। শ্রীচৈতন্যদেব হতে সেই একই মহাসত্যের পুনরাবৃত্তির রূপায়ণ, তাহাই পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণে। 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' করুণা ধারায় তাঁরা ভগ্নজানু সমাজের শুষ্ক স্নায়ু সঞ্জীবিত করবার জন্য নর-জীবনের দেহধারীর দুঃখ বরণ করেন। যে 'Heavenly harmony' হতে আরম্ভ হয়েছে 'Frame of Universe' হয়েছে সৃষ্টির সুরু, যোগীপুরুষেরা জীবাত্মার সঙ্গে ভেদাভেদশূন্য সেই বিশ্বলীলার ঐক্যসূত্র অনুসন্ধান করেছেন এই যোগসাধনায়। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা আরও জাগতিক, আরও মানবিক মাধ্যমে; সেই অর্থে মহৎও। শ্রীরামকৃষ্ণের এই সাধনার ষোল জন উত্তরাধিকারী সন্ন্যাসী শিষ্য এবং স্বামিজীর ছয় জন শিষ্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণের আরো আট জন গৃহী শিষ্যের জীবনী অবলম্বনে রচিত আলোচ্য বইটি চরিত-সাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়ে। বিচিত্র শক্তির, বিভিন্ন স্বার্থে ও বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন সমন্বয়বাদী মহাশক্তি। তাঁর শিষ্যদের জীবনেও সেই সাধনা মূর্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সারগর্ভ জীবনী-সূত্রের ব্যাখ্যাস্বরূপ তাঁর শিষ্যেরা। ঠাকুরের জীবনের অনেক ঘটনা যদি সাধারণ মানুষের কাছে অসম্ভব প্রতীয়মান হয় বা দুর্বোধ্য ঠেকে, তবে তাঁর শিষ্যবর্গের জীবনী অবগত হলে বিভ্রান্তি দূরীভূত হবে। ঠাকুর ছিলেন বহুমুখী জীবন্ত প্রতিভা। সেই প্রতিভাই বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন শিষ্যের জীবনে পল্লবিত ও ফলভারে অবনত। এই ধরণের উক্তি

মনীষী রোমা রোলাঁর কণ্ঠ হতেও নিঃসৃত হয়েছিল—'সৌরকরের প্রাখর্য্য বুঝিতে হইলে যেমন সৌরকরতপ্ত বালুকারাশি স্পর্শ করিতে হয়, ঠাকুরের শিষ্যবর্গের জীবনী অধ্যয়ন করে তাঁরই দিব্য জীবনের তেজের অনুভূতি 'লাভ হয় যেন।'

এই কয়জন মহাপুরুষের চরিত্র আলোচনা করে দেখা যায়, এদের াবনের কোন ঘটনায়, কোন আচরণে যেন শ্রীরামকৃষ্ণেরই চরিত্রগত সংহতি, ্তা, অনমনীয় গতিবেগ প্রতিফলিত।

মানুষের অন্তরে জীবন-কথার প্রভাব প্রবল। উপদেশ অপেক্ষা তাই দাহরণের মূল্য হয়তো অনেক বেশী। তাই আজকের সমাজেও দৃষ্টান্ত-রূপ এই গ্রন্থটির প্রচার কার্য্যকরী হবে এবং যুক্তিযুক্ত ভাবেই তা বাঞ্ছনীয়। যমন 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও 'চৈতন্য ভাগবত' দ্বারা চৈতন্যদেবের জীবনী সারা াংলায় প্রচারিত হয়েছে তেমন আধুনিক যুগের শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহার শিষ্যবর্গ ম্বন্ধীয় পুণ্য কথা অনধীত থাকিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। সর্বোপরি চ্ছাস-বর্জিত বিচারমূলক ভাবাদর্শে লিখিত বলে স্বামী জগদীশ্বরানন্দের নবযুগের মহাপুরুষ' একটী উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। কত প্রতিকূল ান কাল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে কি ভাবে প্রতিটি চরিত্র বিকাশ াভ করেছে তারই ক্রমিক ইতিহাস পাঠ করলে মানসিক আধ্যাত্মিক অনেক উপকরণ আমরা সংগ্রহ করতে পারবো। এ ছাড়াও সমস্ত রচনা মনোহর াষে, বৈচিত্রপূর্ণ বিবরণে পূর্ণ করে এক একজনের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলা য়েছে, যা আকৃষ্ট মনের সহজ ভক্তি ও শ্রদ্ধা দাবী করে। বইটীর বহিরবয়বে ুন্দর চিত্র দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের। দুঃখের বিষয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের হী শিষ্যদের অন্যতম 'বসুমতী'র প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হাশয়ের নামের কোন উল্লেখ নাই দেখে আমরা কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত না হয়ে ার পারলাম না।

২। **The Story of a Dedicated Life**—(১৩১ পৃষ্ঠা) মূল্য ৩১ টাকা। "প্রবুদ্ধ ভারত" নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজি মাসিকের ১৯৫০ অক্টোবর সংখ্যায় লিখিয়াছেন—

The general public know much about Sri Ramakrishna and his great disciple Swami Vivekananda. But not much is known about the other direct disciples of Sri Ramakrishna, each one of whom received and expressed predominantly in his life a certain facet of the Master's great spiritual personality. Though less known these disciples of the Master were spiritual giants and pioneers of silent constructive work. It is their great influence that has transformed and ennobled the life of hundreds of persons far and wide. Their contributions to the building up of the Ramakrishna Math and Mission organisation need hardly be emphasized.

Swami Ramakrishnanda, one of these great direct disciples of Sri Ramakrishna, whose biography forms the subject matter of the book under review, may be said to be the father of the Ramakrishna Movement in south India. Swami Ramakrishnanda's magnetic spiritual personality was the nucleus round which many persons and things gathered and were shaped into brilliant form. In the early years after the passing away of the Master when the young band of disciples had formed themselves into a monastic fraternity and many of whom wandered forth as paribrajakas or stayed in distant places of pilgrimage performing austerities, Sashi Maharaj (the name by which Swami Ramakrishnananda was familiarly known, resolutely stuck on to the humble monastery often as its sole inmate engaging himself steadily and devotedly

in the ecstatic worship of the Master's sacred relics. He was, as it were, the mother of the monastery working after the well being of his brother disciples. Later on as the Head of the Ramakrishna Math, Madras, which he founded in 1897 at the instance of Swami Vivekananda in order to spread the message of Sri Ramakrishna in south India, his life was a perfect example of devout self-surrender at the feet of the Master and dedicated service to others whom he looked upon as the Master's children. The book aptly entitled 'The story of a dedicated life' fills a great need by giving the general readers for the first time, a full and authentic account of the inspiring life of Swami Ramakrishnananda whom Swami Vivekananda called the "main pillar of our Math."

৩। **দেশবিদেশের মহামানব**—২৬৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲ টাকা। উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ মাসিক 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৫৫ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় নিম্নোক্ত পরিচয় প্রকাশিত হয়।

"গ্রন্থখানি রাজর্ষি আখনাটন, দাদুদয়াল, গৌড়পাদ, সক্রেটিশ, শংকরাচার্য্য, কনফুসিয়াস, তুলশীদাস, লাল্লেশ্বরী, কমলাকান্ত, রামমোহন, প্লেটো, মোক্ষমুলার, মাইষ্টার একহার্ট, জ্ঞানেশ্বর, এমার্সন, ক্রীষ্টিন, কাইসারলিং, নরসিং মেহতা, উইলিয়াম জোন্স প্রভৃতি ছাব্বিশ জন মহাপুরুষ ও মনীষীর জীবনী ও বাণীর সুন্দর সংগ্রহ। এই সকল জীবনীর অধিকাংশই পূর্বে উদ্বোধন, প্রবর্তক, মাসিক বসুমতী, দেশ প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেকগুলি জীবনী দুষ্প্রাপ্য এবং বাংলা ভাষায় ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। জীবনী ও বাণীগুলির উপাদান সংগ্রহে গ্রন্থকারের শ্রমশীলতা, যত্ন ও উদ্যম সত্যই প্রশংসনীয় মহাজ্ঞানী ও মহাজনগণের অমূল্য জীবনকথা ও বাণী অফুরন্ত প্রেরণার আকর—দুঃখ-দ্বন্দ্ব-নৈরাশ্য সঙ্কুল সংসারে অব্যর্থ আলোক বর্তিকাস্বরূপ। তাঁহারা যে পথে গমন করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় ও চিরবরেণ্য হইয়াছেন আমরাও সেই

পথ অনুসরণ করিলে নিজেদের জীবনকে সুন্দর মহৎ ও কল্যাণপ্রদ করিতে পারি। তাঁহাদের জীবনী পাঠ, অনুধ্যান ও অনুবর্তনের ইহাই সার্থকতা। এদেশের মহাজন ও মনীষীগণের জীবনী ও বাণীর সহিত পরিচিত হওয়া যেমন সকলেরই বিশেষতঃ, যুবসম্প্রদায়ের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য, তেমনি বিদেশীয় মহামানবগণের বিষয় জানাও তুল্যরূপে প্রযোজনীয়। তুলনামুলক পাঠ ও আলোচনা দ্বারা মন সংকীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সার্বভৌম সমুদার দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করে এবং আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা, সৌভ্রাত্র্য, প্রেম ও সহযোগিতা স্থাপনের পথ সুগম হয়। এই সকল দিক বিবেচনা করিলে গ্রন্থখানির উপযোগিতা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন। তরল সাহিত্য ও কুরুচিপূর্ণ গল্প ও উপন্যাস প্রকাশনাধিক্যের যুগে এরূপ একখানা সুন্দর গ্রন্থ যুবসম্প্রদায়ের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে। গ্রন্থখানির ভাষা স্বচ্ছন্দ ও সাবলীলা; বিষয় বস্তু প্রকাশভঙ্গীও সুন্দর। দুরধিগম্য তত্ত্বগুলি সহজবোধ্য করিবার সযত্ন প্রয়াস করা হইয়াছে। আশা করি, প্রত্যেক সাধারণ এবং স্কুল-কলেজের পাঠাগারে গ্রন্থখানি স্থান পাইবে। স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনের সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এরূপ একখানা গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট হইলে আমরা সুখী হইব। পুস্তকখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

৪। **সাধিকামালা**—(১৯৬ পৃষ্ঠা) মূল্য ২৲ টাকা। উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ মাসিক 'বিশ্ববাণী' পত্রিকার ১৩৫৬ ফাল্গুন সংখ্যায় নিম্নোক্ত পরিচয় প্রকাশিত হয়।—

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কয়েকজন প্রধান সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্যদের ও অপর সম্প্রদায়ের ও অন্যান্য দেশের ধর্মগুরু, দার্শনিক ও ভক্ত সাধকদের জীবন-কথা, চিন্তাধারা সাধন ও উপদেশ সম্বলিত কয়েকটী সুপাঠ্য পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমানে সাধিকামালা নাম দিয়া তিনি প্রাচীন ও আধুনিক যুগের নানা দেশীয়া কয়েকজন বিশিষ্টা সাধিকা ও তপস্বিনীর সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী সমন্বিত এই গ্রন্থটী প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল পুণ্য জীবন-কাহিনীর মধ্যে সান্তা ক্লারা, নিউম্যান, সেণ্ট টেরেসা, তাপসী

রাবেয়া, সেণ্ট ক্যাথারাইন, সংঘমিত্রা, মীরাবাইয়ের জীবনীও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডলীর বিশিষ্টা সিদ্ধ সাধিকাদের মধ্যে শ্রীমা সারদা দেবী, গৌরীপুরী দেবী, যোগীন মা, গোলাপ মা, দেবী অঘোরমণি (গোপালের মা) এবং ভগিনী নিবেদিতা, এমা কাল্‌ভে প্রভৃতি ভক্তনারীদের জীবন-কথাও এই গ্রন্থের বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংক্ষিপ্ত সুন্দর ভাবে বর্ণিত হওয়ায় বইখানি পড়িতে ভালই লাগে। বইখানি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রচার করা উচিত। বিশেষতঃ বাঙ্গালী গৃহস্থের ধর্মানুরক্তা মহিলাদের ও কন্যাদের মধ্যে এই সুলিখিত বইখানির প্রচার তাহাদের ধর্ম-জীবন লাভ এবং নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করিবে।

৫। **Girish Ghose and his Dramas** (১৮৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩্ টাকা)

এই পুস্তক সম্বন্ধে দক্ষিণ ভারতের উডিপি হইতে প্রকাশিত Human Affairs নামক ইংরাজি মাসিক ১৯৪৯ খ্রীঃ জুন সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন, "Readers of "Human Affairs" have had a taste of the religious plays of Girish Ghose in Bengali given by the author four years ago. The world in general have known him as one of the unique disciples of Sri Ramakrishna Paramahansa who wrought a spiritual conversion in a worldling of the earth earthy. But the convert too was in his own way of an uncommon type; a rare genius. He was a keen observer of life sensitive to all its phases and in such deep sympathy with human nature that he could delineate them in such strikingly apt language that it became vibrant literature, represent the various feelings and workings of the human mind by his marvellous acting on the stage unrivalled in his life and since remembered with respect as a tradition above all, so human and understanding that his genius refined, sublimated and spiritualised every element and expression in the gamut of life. His dramatic writings

and his own acting of the principal characters in them threw the Paramhamsa into spiritual ecstasy, so real and living were they of the Truth behind. The range of Girish was as wide as life. So the material for his dramatic stage came from all sources,—mythology, legend epic, lives of saints, sinners and prophets ; history, contemporary society and everywhere in which human life palpitated and the spirit struggled towards the realisation of its true being. The inspiration of Sri Ramakrishna vitalised his own understanding of life so powerfully that his efforts got imbued with a rare quality of originality and vitality that affected the readers and the audience alike in a peculiarly exalted way. Naturally to the Indian and Hindu sections the appeal of his dramas and songs was a great moving experience.

The first centenary in 1944 of this great Bengali writer and father of the modern Bengali stage was celebrated by nearly 240 public institutions. Thanks to Sir Ashutosh Mukherjee, his works are prescribed for B. A. and M. A. classes in the Calcutta University ; owing to his son and succesor in office a Girish Ghosh Lecturership is also founded, deserved memorials and tributes to a unique literary and dramatic genius who interpreted it by his own peerless acting. He wrote 87 dramas ; novels, poems and essays more than 100 ; and songs about 1000, during an eventful life of 68 years. In his dramas he created about 700 characters (450 men and 250 women) representing various rasas, every one of which is a distinct figure, one never the duplicate of another. He himself acted 62 kinds of parts each one perfect in itself. The Swami Jagadiswarananda has done great service in acquainting the non-Bengalis with the life and works of such a writer, their intrinsic merit and the unique character of the man himself. Originally contributed as articles to various journals they have been collected into the present book.

৬। **দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ**—১৯০ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই টাকা।

(ক) উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে "প্রবর্তক" মাসিকে ১৩৫৯ সালের চৈত্র মাসে এই পরিচয় প্রকাশিত হয়।—

প্রবীণ গ্রন্থকার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের অন্যতম অনুরাগী সাধক। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এবং যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যবৃন্দের জীবন-কাহিনী তিনি বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম একত্রে রচনা করিয়াছেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ এই তিনজন শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যের বিস্তৃত জীবনীও তৎকর্তৃক লিখিত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি সম্পূর্ণ অভিনব পরিবেশে চিত্রিত করিয়াছেন। সাধারণতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের যে জীবনালেখ্য দেখা যায় তাহা এই দেবমানবের অন্তিম পাঁচ ছয় বৎসরের ইতিবৃত্ত মাত্র। ১৮৫৫ হইতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে অবস্থান করেন। চিহ্নিত শিষ্যগণের আগমনের পূর্বে প্রধানতঃ কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠাত্রী রাণী রাসমণি এবং তাঁহার জামাতা ও কালীবাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক মথুরানাথের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ বৎসরাধিক কাল অতিবাহিত করেন। সেইজন্য এই পুস্তকের প্রথমে রাণী রাসমণির জীবন-কাহিনী, তৎপরে কালীবাড়ীর বিশদ ইতিবৃত্ত ও তদন্তে মথুরানাথ বিশ্বাসের সেবা ও ভক্তি এবং সর্বশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও সিদ্ধির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত।

দক্ষিণেশ্বর তীর্থযাত্রীর নিকট এই বইখানি গাইড-বুক বা প্রদর্শিকা-পুস্তক রূপে কার্য্যকরী হইবে। পঞ্চবটী, বেলতলা, কালীমন্দির, বিষ্ণু মন্দির, শিবমন্দির, চাঁদনী ঘাট প্রভৃতি স্থলে শ্রীরামকৃষ্ণের যে পুণ্য স্মৃতি জড়িত আছে সেগুলি সংক্ষেপে প্রাঞ্জল ভাষায় ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। এই বইখানি পড়িলে তীর্থযাত্রীর নিকট দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী নূতন আলোকে প্রতিভাত হইবে। আরো আনন্দের বিষয় এই যে, ইহাতে বহু নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। কালীবাড়ীর পুরাণ মেথর রসিকও শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিল। একথা আমরা সর্বপ্রথম এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই; অন্য পুস্তকে এ

পর্য্যন্ত পাই নাই। পরিশিষ্টে ভক্ত-কবি শ্রীপ্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক রচি দশটী শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত সংযোজিত। এই সঙ্গীতগুলির ভাব ও ভাষা অপূর্ব প্রচ্ছদ-পটে পঞ্চবটীমূলে সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য মূর্তি অঙ্কিত। রা রাসমণি ও মথুরানাথের দুইটী ছবি থাকিলে পুস্তকটীর সৌষ্ঠব আরো বৃদ্ধি পাইত। অবাঙ্গালী তীর্থযাত্রীর জন্য এইরূপ হিন্দি ও ইংরাজি পুস্তকের বিশে প্রয়োজন আছে। দক্ষিণেশ্বর-পরিচায়িকারূপে পুস্তকটীর বহুল প্রচার হইবে আমরা সুখী হইব।

(খ) উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে কলিকাতার প্রসিদ্ধ দৈনিক 'জনসেবক' ২০শে বৈশাখ ১৩৬০ (৩রা মে, ১৯৫৩) রবিবার লিখিয়াছেন—

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন, "যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদে প্রায় ত্রিশ বৎসর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে অবস্থান করেন। তাঁহার সাধনা ও সিদ্ধির প্রভাবেই মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী ভবতারিণী দেবী জাগ্রতা এবং দক্ষিণেশ্ব আন্তর্জাতিক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত। অধুনা দেশবিদেশের শত শত তীর্থযাত্রী তথায় আগমন করেন এবং তাঁহার পূত স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি সম্বন্ধে জানিতে চাহেন। তাঁহাদের জন্যই এই পুস্তক রচিত। ইহাকে 'গাইড বুক' বা প্রদর্শিকা পুস্তিকারূপে উক্ত তীর্থের যাত্রীগণ ব্যবহার করিতে পারেন।" গ্রন্থকার এই কথা বলিলেও অন্যান্য কারণে বইখানির মূল্য কম নয়। রা রাসমণির জীবনী, কালীবাড়ী সংক্রান্ত বহু জ্ঞাতব্য তথ্য, শ্রীরামকৃষ্ণের স মথুরানাথের সম্বন্ধ, এবং ঠাকুরের সাধন-বৃত্তান্ত ও দিব্য লীলা প্রবীণ ও প সন্ন্যাসী লেখক যে ভাবে পরিবেশন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। পরিশি ভক্ত-কবি শ্রীপ্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দশটী শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত সংকলন কর স্বামীজী সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। "দক্ষিণেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ" পাঠ কর সকলেই উপকৃত হইবেন। এই বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।"